আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

খণ্ড ২ • সংখ্যা ১ • ডিসেম্বর ২০২২

আবুল বারকাত
কোভিড-১৯ থেকে শোভন সমাজ

আবুল বারকাত
কালোটাকা ও অর্থপাচার: বাংলাদেশে দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত, আসমার ওসমান
বাংলাদেশের ভূমি আইন বাস্তবায়নের সমস্যা নিরূপণে রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ: একটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

আবুল বারকাত
বঙ্গবন্ধু-দর্শন: তত্ত্ব, প্রয়োগ ও সম্ভাবনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পাটশিল্প শ্রমিকদের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার পর্যালোচনা

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠনে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা

মনজু আরা বেগম
প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নারীর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: উত্তরণের উপায়

হান্নানা বেগম
কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব: বাংলাদেশে জেন্ডার mgZv

মোঃ মোরশেদ হোসেন
রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড- ১৯ মহামারি

মোঃ মোস্তফা কামাল
বাংলাদেশ ভাবনা: ভাবনায় অর্থনীতি

মিহির কুমার রায়
মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯: করোনা কালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বাজেট কতটুকু সহায়ক হবে?

মিহির কুমার রায়
করোনা (কোভিড-১৯)-এ শিল্প সংস্কৃতির অর্থনীতি : প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র ও যাত্রা শিল্প

মিহির কুমার রায়
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গবেষণা: কেরালা মডেল ও বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন
বাংলাদেশে শিশু অধিকার: বাস্তবতা এবং আমাদের করণীয়

মোঃ মোরশেদ হোসেন
রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশ

হান্নানা বেগম
আন্তর্জাতিক নারী দিবস: জাতিসংঘের সিডও সনদ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

খণ্ড ২ সংখ্যা ১

ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক

ড. আবুল বারকাত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: ৮৮০-২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

খণ্ড ২ সংখ্যা ১ ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত

সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটি

অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা

অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

অধ্যাপক ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	সদস্য
অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান	সদস্য
অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম	সদস্য
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী	সদস্য
অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন	সদস্য
অধ্যাপক ড. শামিমুল ইসলাম	সদস্য

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একটি বার্ষিক প্রকাশনা

[বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমকাল পর্যালোচনা ও লেখাসমূহে উপস্থাপিত তথ্য-তত্ত্ব ও মতামত লেখকদের একান্তই নিজস্ব। এক্ষেত্রে সম্পাদক ও প্রকাশক কোনো দায় বহন করেন না।]

কৃতজ্ঞতা
বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রকাশে আর্থিক সহায়তার প্রদানের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

মূল্য: টাকা ৩০০ (দেশে), মার্কিন ডলার ২০ (বিদেশে)।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমির সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন:
প্রযত্নে: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন : ৮৮০-২২২২২৫৯৯৬, ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.bea-bd.org

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: ৮৮০-২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

সম্পাদকীয়

সমকালীন মানবজীবনে বিগত দশকের শেষ তিন-চার বছরের অর্থাৎ ২০১৯ পরবর্তী সময়ের মতো কঠোর, শাসরুদ্ধকর ও দ্রুত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পট পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট খুব কমই এসেছে। এই সময়ে মানুষের চিরচেনা অনেক রূপ ও বাস্তবতা অদৃশ্য হয়ে গেছে শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে—কোভিড-১৯ ভাইরাসের অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আর একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং এই ভাইরাস অভিঘাত-যুদ্ধ-মন্দা চলাকালেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের পাশাপাশি নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা, প্রযুক্তির অধিকতর উৎকর্ষতা এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজির পরিবর্তন একই সরল রেখায় নিরলস গতিতে ছুটে চলেছে। সব মিলিয়ে একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শোষণ-শাসনের পাকাপোক্ত রূপ ও সাম্রাজ্যবাদের কদর্য চেহারা, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা—দুইয়ে মিলে বিশ্ববাসীর সামনে বর্তমান হয় নতুন এক বাস্তবতা। জটিল ও কঠিন এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তির পথ অন্বেষণ এবং দিকনির্দেশনা পেতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হলো গবেষণা আলেখ্য—'বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি' খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২।

অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় একদল চিন্তক ও গবেষকের শক্তিশালী লেখনিসমৃদ্ধ এই সংখ্যায় বেশকিছু উচ্চমানের নিবন্ধ ও পর্যালোচনায় মানবসমাজের উন্নয়ন তত্ত্ব, শিক্ষা, নীতি ও অনুশীলন কৌশল বিধৃত হয়েছে, যা সমকাল বিচারে কালোত্তীর্ণ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ—এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বই আজ মহাবিপর্যস্ত। মানব ইতিহাসে এর আগে কখনো একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দা, যুদ্ধ ও মহামারি ও শক্তিশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। সভ্যতার চরম এই সংকটে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনও কঠিন এক বাস্তবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যা এই সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় ফুটে উঠেছে। এসব লেখনি আমাদের চারপাশের ঘটে যাওয়া সময়ের জীবন্ত এক সাক্ষী, যা শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত: কোভিড-১৯ থেকে শোভন সমাজ, বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষ—কৃষক-শ্রমিক-প্রবীণ-নারী-শিশুর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড-১৯ মহামারি, কোভিড-১৯ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালে বাজেট, কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা ও শিল্প-সংস্কৃতির অর্থনীতি। একই সঙ্গে রয়েছে বৈশ্বিক স্তরে পুঁজিবাদী যুক্তির চূড়ান্ত প্রকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল—কালোটাকা ও অর্থপাচার, বাংলাদেশে দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ভূমি আইন বাস্তবায়নের সমস্যা, বঙ্গবন্ধুর দর্শনতত্ত্ব ও তার প্রয়োগ-সম্ভাবনা, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা প্রভৃতি। বহুমাত্রিক বিপর্যয়ের সামগ্রিক ও গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আশাবাদী উপলব্ধির প্রতিফলনসমৃদ্ধ এসব লেখনি প্রকৃত অর্থেই একটি বিশেষ কাল ও সময়ের বিস্তৃত আলেখ্য, যা নিশ্চিতভাবেই পাঠকদের চিন্তায় খোড়াক জোগাবে, নীতিনির্ধারকদের কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে—সর্বোপরি আমাদের বিবেক চেতনায়নে তাড়িত করবে।

বাংলা ভাষার এই জার্নালে গ্রন্থিত প্রবন্ধ ও পর্যালোচনাসমূহ যথারীতি পর্যালোচিত এবং সম্পাদকীয় পর্ষদের অনুমতিসাপেক্ষে প্রকাশ করা হলো। নির্মোহ তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও পর্যালোচনাসমূহের জন্য লেখকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সমিতির সম্মানিত সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি এবং শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি, পাঠকেরা 'বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি'র চলতি সংখ্যায় প্রকাশিত লেখনিসমূহ উপভোগ করবেন এবং আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন শোভন বাংলাদেশ ও বিশ্ব বিনির্মাণের বহমান লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আবুল বারকাত
সম্পাদক, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

১.	কোভিড-১৯ থেকে শোভন সমাজ *আবুল বারকাত*	১
২.	কালোটাকা ও অর্থপাচার: বাংলাদেশে দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি *আবুল বারকাত*	৪৯
৩.	বাংলাদেশের ভূমি আইন বাস্তবায়নের সমস্যা নিরূপণে রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ: একটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান *আবুল বারকাত, আসমার ওসমান*	৬৫
৪.	বঙ্গবন্ধু-দর্শন: তত্ত্ব, প্রয়োগ ও সম্ভাবনা *আবুল বারকাত*	৯১
৫.	বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা *মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*	১২১
৬.	পাটশিল্প শ্রমিকদের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার পর্যালোচনা *মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*	১৪৩
৭.	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠনে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা *বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ*	১৬৯
৮.	প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নারীর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: উত্তরণের উপায় *মনজু আরা বেগম*	১৭৯
৯.	কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব: বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা *হান্নানা বেগম*	১৯১
১০.	রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড- ১৯ মহামারি *মোঃ মোরশেদ হোসেন*	২০৩
১১.	বাংলাদেশ ভাবনা: ভাবনায় অর্থনীতি *মোঃ মোস্তফা কামাল*	২০৭

১২. মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯: করোনা কালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বাজেট কতটুকু সহায়ক হবে? ২১৫
মিহির কুমার রায়

১৩. করোনা (কোভিড-১৯)-এ শিল্প সংস্কৃতির অর্থনীতি : প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র ও যাত্রা শিল্প ২২৭
মিহির কুমার রায়

১৪. কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গবেষণা: কেরালা মডেল ও বাংলাদেশের শিক্ষণীয় ২৩৫
মিহির কুমার রায়

১৫. বাংলাদেশে শিশু অধিকার: বাস্তবতা এবং আমাদের করণীয় ২৪১
মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন

১৬. রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশ ২৫১
মোঃ মোরশেদ হোসেন

১৭. আন্তর্জাতিক নারী দিবস: জাতিসংঘের সিডও সনদ ও বাংলাদেশ ২৮৫
হান্নানা বেগম

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১-৪৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কোভিড-১৯ থেকে শোভন সমাজ

আবুল বারকাত*

১. প্রাক্-কথন

গত ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি তুলনামূলক বৃহদায়তন গ্রন্থে আমি 'শোভন সমাজ-শোভন সমাজব্যবস্থা-শোভন জীবনব্যবস্থা'র একটি ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটির শিরোনাম ***'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে'***। ওই গ্রন্থেই এই তত্ত্বকাঠামো দাঁড় করানোর পরপরই কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক মহামন্দা বিশ্লেষণে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অপারগতা ব্যাখ্যাপূর্বক 'নতুন একীভূত বহুশাস্ত্রভিত্তিক অর্থনীতিশাস্ত্রের' পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছি। আর এই 'নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের' নিরিখেই আমরা বাংলাদেশের (অন্য বহু দেশের সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাসহ) কোভিড-১৯-পূর্ব আর্থসামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা থেকে শুরু করে সামষ্টিক অর্থনীতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও রেন্টসিকিং অর্থনীতি ব্যবস্থার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি, বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন করেছি। একই সময় একই সাথে সংঘটিত কোভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যয়ের অভিঘাত ও অর্থনৈতিক মহামন্দাকে বড় পর্দায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শোভন সমাজ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় করণীয় ভাবনা উত্থাপন করেছি।

আজকের এই উপস্থাপনায় আমি উল্লিখিত বিষয়াদি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণপূর্বক শেষপর্যন্ত "কোভিড-১৯-এর মহামন্দা-মহারোগ" থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং একই সাথে শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুটি ধারণাত্বক মডেল (মডেল ১: তত্ত্ব ও মডেল ২: প্রয়োগ) উত্থাপন করব। আর তার আগে মডেলের ভিত্তি-যুক্তির শক্তি বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একই সময়ে সংঘটিত অর্থনৈতিক মন্দা ও কোভিড-১৯-এর সম্মিলনে সৃষ্ট রোগ কোভিড-১৯ মন্দারোগ-এর ডায়াগনোসিস ও রোগ নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি নিয়ে কিছু বলব। মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার ও শোভন সমাজের পথে সামনে এগুনোর লক্ষ্যে

---

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি); সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com; ১০ পৌষ ১৪২৮/২৫ ডিসেম্বর ২০২১, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একবিংশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০২১-এর বিশেষ প্লেনারি অধিবেশনে উপস্থাপিত প্লেনারি বক্তৃতা।

প্রস্তাবিত মডেলে আমরা দেখাব যে অর্থনীতির 'প্রবাহ' (flow) ও সম্পদ-সম্পত্তি (assets, stocks) বিবেচনায় নিয়ে একই সাথে চতুর্মুখী হস্তক্ষেপ (intervention) করতে হবে: (১) ব্যয় সংকোচন-কৃচ্ছ (ব্যক্তি, ব্যবসা, সরকার), (২) ঋণ পুনর্গঠন, (৩) ধনী-সম্পদশালীদের (আসলে রেন্ট সিকার-লুটেরা-দুর্বৃত্তদের) সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে পুনর্বণ্টন, এবং (৪) প্রয়োজনে টাকা ছাপানো। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এ প্রক্রিয়ায় আমরা বলব যে, প্রকৃতির বিধানের প্রতি অনুগত থেকে একদিকে কোভিড-১৯-এর মহামন্দা রোগ থেকে মুক্তি আর অন্যদিকে পাশাপাশি বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে আমাদের মডেলভিত্তিক কর্মকাণ্ডটি জটিল এবং তা ঠিকমতো গোছাতে না পারলে সমাজদেহে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঠিকমতো ভারসাম্য স্থাপন করতে পারলে 'শোভন সমাজ' বিনির্মাণে সাফল্য নিশ্চিত।

কোভিড-১৯ মহামারির লকডাউন-উদ্ভূত বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক মহামন্দা—বিশ্বব্যাপী এ দুই মহাবিপর্যয় ঘটেছে একই সময়ে একসাথে। মানব ইতিহাসে এমনটি কখনো তেমন দেখা যায়নি। এ মহাদুর্যোগে উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে বহু কিছু, পাল্টে যাচ্ছে প্রচলিত সব সম্পর্ক; ওলট-পালট হচ্ছে বিশ্বায়নব্যবস্থা, গ্লোবালাইজেশন ডি-গ্লোবালাইজড হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে বৈশ্বিক সব সমীকরণ; পাল্টে যাচ্ছে সমাজ কাঠামো; পাল্টে যাচ্ছে শ্রেণিকাঠামো; ওলট-পালট হচ্ছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়; ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে গতানুগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ধারা; পাল্টে যাচ্ছে কলকারখানার উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালন পদ্ধতি; পাল্টে যাচ্ছে অফিস-আদালত শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রচলিত পদ্ধতি; ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে সাংস্কৃতিক জীবন আর বিনোদন পদ্ধতি; ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে পারিবারিক শ্রম-বিভাজন পদ্ধতি; পাল্টে গেছে মানুষের জীবনব্যবস্থা; এমনকি পাল্টে গেছে মানুষের দৈনন্দিন রুটিন—এককথায় স্থানীয়পর্যায় থেকে শুরু করে বৈশ্বিকপর্যায় পর্যন্ত বড় ধরনের রূপান্তর ঘটেছে-ঘটছে। হয়তো বা এসব রূপান্তরের অনেকগুলোই বা অনেক অংশই তুলনামূলক স্থায়ী রূপ নেবে। এসবই প্রধানত কোভিড-১৯-এর কারণে, আর সাথে আছে অর্থনৈতিক মন্দা। এ ধরনের অবস্থা মোকাবিলা করে আবার নতুন করে সুস্থ-সুস্থির জীবন-সমাজ-অর্থনীতি-বিনির্মাণের পথ-পদ্ধতি উদ্ভাবন-অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী। অনিবার্য পরিবর্তনের এসব বোধ-বিবেচনা থেকে আমরাও চেষ্টা করেছি বুঝতে যে কোভিড-১৯-সৃষ্ট এতসব পরিবর্তনের মধ্যে আমরা আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে উদ্ধার-পুনরুদ্ধার-পুনর্নির্মাণ—বিনির্মাণে কীভাবে এগুবো। করণীয়টা কী হবে, কী হওয়া বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বশ্রেয়। এ লক্ষ্যে তুলনামূলক নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ সম্ভাব্য গভীর বিশ্লেষণ করে আমরা বৈষম্যহীন ও আলোকিত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" প্রস্তাব করেছি (দেখুন, বারকাত ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে)। আমাদের প্রস্তাবিত মডেলটি যথেষ্ট মাত্রায় সার্বজনীন, যা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ও সমাজে প্রয়োগযোগ্য। যে মডেলের অনেক অংশই এমনকি ভেতরে নড়বড়ে-ভঙ্গুর এবং চরম বৈষম্যপূর্ণ উন্নত দেশ-ধনী দেশসমূহেও প্রয়োগ সম্ভব। আর সে লক্ষ্যেই আজকের প্লেনারি প্রবন্ধে চারটি পরস্পরসম্পর্কিত বড় মাপের বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করব:

১. কোভিড-১৯: ক্ষতির স্বরূপ ও মাত্রা,

২. অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কোভিড-১৯: একই সময় একই সঙ্গে দুই মহারোগ,

৩. কোভিড-১৯ ও মহামন্দায় মহারোগ: রোগের স্বরূপ ও নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি, এবং

৪. কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল।

২. কোভিড-১৯: ক্ষতির স্বরূপ ও মাত্রা

কোভিড-১৯-এর কারণে আমাদের দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা উভয়ই যথেষ্ট অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসব অনিশ্চিত অবস্থাসহ বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটন, নির্মোহভাবে সে সত্য প্রকাশ এবং কাঙ্ক্ষিত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা বহুবার উপস্থাপন করেছি। আমি বরাবরই বলে আসছি—এমনকি বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যখন দেশে পুরো মাত্রায় স্বৈরশাসন-সেনাশাসন বহাল ছিল—সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতির লক্ষ্যে নীতিকৌশল-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সু-শাসকগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের মনের গভীরে বিশ্বাস (আত্মবিশ্বাস) থাকতে হবে যে,

(১) এ দেশে সাংবিধানিকভাবেই জনগণ এবং একমাত্র জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক, জনগণের অভিপ্রায়ের বিপক্ষে কোনো কিছু করা যাবে না—করলে যতটুকু তা করা হবে, ততটুকুই বেআইনি এবং অসাংবিধানিক;

(২) বৈষম্যহীন সমাজ ও অর্থনীতি এবং অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানসকাঠামো বিনির্মাণ অর্থাৎ শোভন সমাজ-শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি চেতনা; এবং

(৩) মানবসত্তার মর্যাদাবিরোধী সবকিছুই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আর প্রকৃতিবিরুদ্ধ সবকিছুই সচেতনভাবে বর্জনীয়।

এসব কথা নিজেদের মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি শুধু এ কারণেই নয় যে আজ সমগ্র দেশ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে—করোনা ভাইরাস রোগ-১৯ (কোভিড-১৯)-এর অভিঘাতে মহাবিধ্বস্ত-মহাবিপর্যস্ত এবং কেউই জানে না কবে হবে মহা-মহামারি থেকে মুক্তি (আসলে সমগ্র বিশ্বই বিপর্যস্ত-পর্যুদস্ত)।

এ কথা বলার কোনো সুযোগই নেই যে "মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা" বাস্তবায়নের কথা হবে পরে, আর তার আগে 'কোভিড-১৯' থেকে রেহাই পেতে হবে। আমি ঠিক উল্টোটা মনে করি। কারণ, এ মহাবিপর্যয়কালেই সে প্রয়োজন এবং সুযোগ পুরো মাত্রায় বিদ্যমান—যখন আমরা চাইলে শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগুতে সক্ষম। আর যদি আমরা সেটা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে ইতিহাসই বলে দেবে যে আমরা ভুল করেছিলাম। মার্ক টোয়েনের ভাষায় "History doesn't repeat itself, but it does rhyme"|

কোভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত মহাক্ষতি-মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তির লক্ষ্যে চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য সরকারপ্রদত্ত জাতীয় বাজেটের কিছুকাল আগে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিগত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় জাতীয় 'বিকল্প বাজেট' (২০২০-২১ অর্থবছর) জাতির সামনে উপস্থাপন করেছি (দেখুন, বারকাত ও জামালউদ্দিন, ২০২০)। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটে আমরা নীতিগত যেসব অবস্থানের কথা বলেছি তা শুধু কোভিডকালীন সময়ের জন্যই নয় তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

কোভিড-১৯-এর লকডাউনের প্রথম দুই মাসের মধ্যেই দেশে সবকিছু ওলট-পালট হয়েছে—এসব আমরা গবেষণা করে দেখিয়েছি। গত বছরের ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে তারিখের মধ্যে লকডাউনে গৃহবন্দী ও ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানায় স্থবিরতার কারণে যেসব ক্ষয়ক্ষতি-বিপর্যয় ঘটেছে তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আরও একবার স্মরণ রাখা জরুরি যে,

(১) কোভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যয় আমাদের দেশের শ্রেণিকাঠামোকেই পাল্টে দিয়েছে। হয়েছে দ্রুত অধোগতি, নিম্নগামী। ১৭ কোটি মানুষের দেশে লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে

৩১ মে ২০২০) বিশাল এক "নবদরিদ্র" গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে—লকডাউনের আগে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, যা লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনের মাথায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। ব্যাপকসংখ্যক মানুষ খুবই দ্রুত সময়ে, মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে শ্রেণি মইয়ের (class ladder) তলার দিকে নামতে বাধ্য হয়েছেন-হচ্ছেন। এ এক অশনিসংকেত-প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাসমাত্র।

(২) কোভিড-১৯ মহামারি এবং তৎ-উদ্ভূত লকডাউনের ফলে বিদ্যমান আয় বৈষম্য, ধনসম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য প্রকটতর হয়ে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এ অবস্থা থেকে ঘুরে না দাঁড়াতে পারলে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য। অবশ্য এহেন বিপর্যয় নতুন শোভন সমাজে উত্তরণের শর্তও হতে পারে।

(৩) কোভিড-১৯ মহামারি রোধের প্রয়াস যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশে সুসমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত দক্ষ ফলপ্রদ "জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা সিস্টেম" (Public Health Security System/People's Health Security System) বলে তেমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

(৪) কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও মৃত্যু কমিয়ে আনতে আমরা কার্যকর-ফলপ্রদ তেমন কিছু করতে পারিনি; লকডাউন তেমন কাজ করেনি; শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা থেকে শুরু করে মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে যথেষ্ট গাফিলতি ছিল-আছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে সময়ক্ষেপণ হয়েছে তাতে মনে হয় যে সম্ভবত উপরের মহল ভেবেছেন যে "হার্ড ইম্যুনিটি" হয়ে যাবে এবং তাতে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ ধারণা ভ্রান্ত। আর সঠিক হলে বহু মানুষের সংক্রমিত হওয়ার ও মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক।

(৫) কোভিড-১৯ মহামারিতে সংক্রমিত এবং মৃত্যুবরণকারী মানুষের প্রকৃত সংখ্যা কম নয়। তবে তার চেয়ে শত-শতগুণ বেশি হবে মানুষের মধ্যে আতঙ্কবোধ, বিষাদবোধ, বিপন্নতাবোধসহ বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত শকস্ ও ট্রমা, যা মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। আর সেটা প্রকৃত মানব বিপর্যয়ের দীর্ঘমেয়াদি কারণও হতে পারে। হতে পারে তা বংশপরম্পরা।

(৬) "কোভিড-১৯ গরিব মানুষকে কম আক্রান্ত করে—কারণ ওদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইম্যুনিটি) বেশি"—ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। করোনা ভাইরাস রোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান-আমেরিকান, ল্যাতিন-হিস্পানিকরা এবং এশীয়-বংশোদ্ভূত মানুষেরা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় জনসংখ্যা অনুপাতে অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছেন, অনেক বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের দেশে এসব তথ্য এখনও নেই, যা দিয়ে গবেষণা করে প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব। তবে গোরস্থানভিত্তিক ও শ্মশান-মহাশ্মশানভিত্তিক তথ্য বলে যে কোভিড-১৯-এর সময়কালে অর্থাৎ ২০২০-এর মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়েছে (সরকারি পরিসংখ্যানে যা প্রতিফলিত নয়)।

(৭) কর্মনিয়োজনের নিরিখে লকডাউনের পরের বাংলাদেশ অর্থনীতি হলো ৪১ শতাংশের অর্থনীতি। কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের কারণে (প্রথম ৬৬ দিনে অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত) অর্থনীতির প্রায় সব খাত-উপখাত কার্যত অচল হয়ে পড়ায় ব্যাপক জনগোষ্ঠী কাজ হারিয়েছে: লকডাউনের আগে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮ হাজার মানুষের মধ্যে লকডাউনের মধ্যে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৭১ জন মানুষ কাজ হারিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন সেবাখাতের কর্মীরা এবং অনানুষ্ঠানিক খাত। "হারিয়ে যাওয়া কাজ" (lost employment) ফিরে

পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে নিতে হবে শক্তিশালী ভূমিকা। অন্যথায় ব্যাপক কর্মসংস্থানহীনতা ও স্বল্প আয় (অথবা স্বল্প ব্যয়) একদিকে অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেবে আর অন্যদিকে তা ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা সৃষ্টির কারণ হবে।

(৮) কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের (৬৬ দিনের; ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) অর্থনীতি হলো ৩৫ শতাংশের অর্থনীতি—এ সময়ে জিডিপি-ক্ষতি (lost GDP) হয়েছে একই সময়ে প্রত্যাশিত জিডিপির (৪৫৮,০২৬ কোটি টাকা) ৬৫.২ শতাংশ। জিডিপি-ক্ষতি হয়েছে সব খাতে। জিডিপি-ক্ষতির প্রায় ৫৬.৯ শতাংশ হয়েছে সেবাখাতে আর ৩৪.২ শতাংশ শিল্পখাতে। সেবা ও শিল্পখাত পুনরুজ্জীবনের বিকল্প নেই। কিন্তু কাজটি সহজ নয়।

(৯) তুলনামূলক সবচেয়ে কম জিডিপি-ক্ষতি হয়েছে কৃষিখাতে (মোট জিডিপি-ক্ষতির ৯ শতাংশ)। কৃষির “কোভিড-১৯ ইম্যুনিটি লেভেল” অত্যুচ্চ। প্রকৃতিনির্ভর কৃষিখাতে (এমনকি আম্ফানের মতো সাইক্লোন হয়ে যাওয়ার পরেও) জিডিপি-ক্ষতির তুলনামূলক নিম্নমাত্রা নির্দেশ করে যে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান নিরাপত্তা, মানব নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ বিশ্ববাজারে খাদ্য নিয়ে প্রবেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যৌক্তিক। যে কারণে জাতীয় বাজেটে কৃষিতে জিডিপির কমপক্ষে ৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান হবে একই সাথে যুক্তিসংগত এবং কৌশলিক। আর একই সাথে গ্রামাঞ্চলে/পল্লীতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য (আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্য) কমানোর জন্য কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের কোনোই বিকল্প নেই; কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে (লকডাউনের মধ্যেই বাংলাদেশের কৃষক প্রায় ২ কোটি টন বোরো ধান উৎপাদন করেছেন এবং একই সাথে ধানের মূল্য বিচারে কৃষককে ঠকানো হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ)।

(১০) লকডাউনে বহুমাত্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা-বাণিজ্য। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অণু-ব্যবসা (ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্য বিক্রেতা, চা-পান স্টল), খুদে দোকান-মুদি, মনোহারী ও সমজাতীয়, অণু-ক্ষুদ্র হোটেল-রেঁস্তোরা এবং ক্ষুদ্র মাঝারি পাইকারি ব্যবসায়ী। দেশে এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৬ লক্ষের ওপরে। লকডাউনে এদের মধ্যে ৬৫ লক্ষের অধিক ‘সম্পূর্ণ নিঃস্ব’ হয়ে গেছে, যারা ‘নবদরিদ্র’ গ্রুপে যেতে বাধ্য হয়েছে; অন্যরাও ধসে গেছে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সচলতার ওপর ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভরশীল (দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশ)। এসব মানুষের জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধার করতেই হবে—করতে হবে পুনরুজ্জীবিত। অন্যথায় দায়িত্বহীনতা ও দায়বোধহীনতার কারণে কোনো একসময়ে ইতিহাস আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বে। এ লক্ষ্যে অণু-ব্যবসায়ীদের জন্য আপাতত ও দ্রুত ভিত্তিতে এককালীন অনুদান ও অন্যদের জন্য স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ প্রস্তাব করেছি। তবে এসব কথা যাদের শোনার তারা শোনেননি।

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও লকডাউনে যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা থেকে অর্থনীতি ও সমাজ পুনরুদ্ধারে যা করণীয় তা সরকারের এক বাজেটের বিষয় নয়। ক্ষতির রূপ, মাত্রা ও গভীরতা এত যে, মাত্র একটি বাজেটে এমন কোনো আলাদিনের চেরাগ থাকা সম্ভব নয়, যা দিয়ে বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে প্রকৃতির বিধি-বিধান অনুধাবন করে দীর্ঘমেয়াদি জনকল্যাণ-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লক্ষ্য-অভীষ্ট নির্দিষ্ট করে তা দৃঢ়চিত্তে বাস্তবায়ন। এর কোনোই বিকল্প নেই; বিকল্প থাকতে পারে না। তবে যেহেতু চলতি অর্থবছর (২০২০-২১) সমাজ ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল সময়,

সেহেতু সরকারের নীতিনির্ধারকদের প্রথমেই হিসেব-নিকেশ করে জানা প্রয়োজন ক্ষয়ক্ষতি কোথায়-কোন খাত-ক্ষেত্রে—মানবগোষ্ঠীর কোন অংশে (কারণ বিমূর্ত 'মানুষ' বলে আর কিছু নেই—মানুষকে বৈষম্যমূলক শ্রেণি-পেশায় বিভাজিত করা হয়েছে, ছোট-বড় করা হয়েছে) কী মাত্রায়, কীভাবে, কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এবং ক্ষতিপূরণ সম্ভাবনাগুলো কী—এসব তথ্য ও যুক্তিসংগত অনুমানের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। স্বাভাবিক সময়ের জন্য ইতিমধ্যে প্রণীত পরিকল্পনা দলিল, উন্নয়নের নীতি-কৌশলগত মোটামুটি দায়সারা, যোগসূত্রহীন ও অবিজ্ঞানসম্মত দলিলাদি; প্রথাগত আর্থিক নীতি (সরকারের আয় ও ব্যয়); নির্দিষ্ট স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রণীত মুদ্রানীতি (মুদ্রা সরবরাহ, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি, টাকা ছাপানো); শ্রমজীবী মানুষবিরোধী কর্মনিয়োজন নীতি, বেকারত্ব নিরসন নীতি; কৃষক-অবান্ধব কৃষি নীতি; দেশের শিল্পায়ন নিশ্চিত করে না এমন শিল্প নীতি; প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ সরকারি ক্রয়-বিক্রয় নীতি; সরকারের নির্বাহী বিভাগের "দায়িত্ব এড়িয়ে চলার" নিয়মকানুন—সবই পুনর্মূল্যায়ন করে "প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ-উদ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় নতুন দলিলাদি প্রণয়ন জরুরি। প্রচলিত ধনিক গোষ্ঠী ও আমলানির্ভর (যাদের হওয়ার কথা জনগণের সেবক) রাজনৈতিক-সামাজিক পদ্ধতিতে এবং ক্ষুদ্রস্বার্থসংশ্লিষ্ট জ্ঞানভিত্তিতে অতিদ্রুত এইসব দলিলাদি প্রণয়ন সম্ভব হবে না।[১] বিষয়টি সামাজিক ও অর্থনীতি প্রগতি নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক আদর্শের— এ কথা আত্মস্থ করে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিচার-বোধসঞ্জাত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। তবে আশুকর্মকাণ্ড যা না করলে সমাজ ও অর্থনীতির সম্ভাব্য ধস ও ধ্বংসাবস্থা ঠেকানো যাবে না, তা জরুরি ভিত্তিতে করতেই হবে। ভুল-ভ্রান্তি হলে হবে; কারণ, এ ধরনের মহাবিপর্যয় মোকাবিলার কোনো প্রাক্-অভিজ্ঞতা, প্রাক্-জ্ঞানভিত্তি, প্রাক্-ধারণা আমাদের নেই। একই সাথে নেই কোনো রেডিমেড ফর্মুলা। সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল বাস্তবায়নে কোনো ধরনের গাফিলতির সুযোগ দেওয়া যাবে না, বরদাস্ত করা যাবে না কোনো ধরনের কালক্ষেপণ, কোনো ধরনের

---

১ পরিকল্পনা দলিলসহ আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দলিল সম্পর্কে 'জ্ঞানভিত্তির' প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি এ জন্য যে এসব দলিলের জ্ঞানভিত্তি (Knowledge base) যথেষ্ট দুর্বল। এসব দলিল-দস্তাবেজ যতটা না মুক্তচিন্তার ফসল তার চেয়ে ঢের বেশি মুক্তবাজার রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত। আর সে কারণেই অযাচিত মাত্রায় ভঙ্গুর-দুর্বল মডেলনির্ভর, ইনস্ট্রুমেন্টাল অর্থশাস্ত্রনির্ভর; যেখানে অনুমাননির্ভরতার অনুমানগুলোও যথেষ্ট ভ্রান্ত (অনৈতিক) ও নড়বড়ে—টোকা দিলে টেকে না। পরিকল্পনা দলিল বা অন্যান্য সমজাতীয় 'উন্নয়ন' দলিল নিয়ে এসব কথা বলার অনেক কারণ আছে। যেমন উৎপাদন পরিকল্পনায় আমরা মূল্য সংযোজন পরিমাপ করি, পরিমাপ করি মুনাফা সর্বোচ্চকরণের; কিন্তু কখনো মজুরি সর্বোচ্চকরণের কথা বিবেচনা করি না। আমরা কৃষির পরিকল্পনা করি কৃষকের জীবন অভিজ্ঞতা ও কৃষি নিয়ে তার অমূল্য পর্যবেক্ষণ তার কাছে না শুনে না বুঝে; যারা কৃষি পরিকল্পনায় উচ্চপদস্থ তাদের খুব কমসংখ্যকই জানেন "কত ধানে কত চাল"। আমরা শিল্পায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিল্পকলকারখানার সমস্যাগুলো শুনি বড়জোর মালিক এবং/অথবা উচ্চপদস্থ প্রকৌশলী মহোদয়ের কাছে; কিন্তু প্রকৃত উৎপাদক শ্রমিকের অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণ-ধারণার কথাগুলো হিসাবের বাইরের বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করি—উৎপাদন পরিকল্পনার কোনো মডেলেই এসব সুনির্দিষ্ট ও পাওয়ারফুল মানদণ্ড ধ্রুবক-ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে না। আমাদের পরিকল্পনা দলিলের বড় বড় মডেলে—সমীকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা থাকে, কিন্তু কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার চলক থাকে না। একই কথা শিল্প ও সেবাখাতসহ অর্থনীতির সব খাত-উপখাতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা অর্থনীতি নিয়ে মডেলভিত্তিক পরিকল্পনা করি, কিন্তু তাতে মূল চালিকাশক্তি মানুষের কী হবে—সে কথা অন্তর্ভুক্ত থাকে না। আসল কথা হলো—(১) বই-পুস্তকের কথ াবার্তা প্রয়োজনীয় কিন্তু শুধু তা দিয়ে মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়, (২) মানুষের জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ-উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা দলিল হতে হবে বহুশাস্ত্রীয় জ্ঞানের মুক্তচিন্তাভিত্তিক সমাহার, (৩) মানুষের জীবনসমৃদ্ধির পরিকল্পনা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। মনে রাখা ভালো হবে যে জ্ঞানজগতের নমস্য মহাদার্শনিক থেলস্, ফেরেসাইডেস, জেনোফেনস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এপিকুরাস, সিসেরো, কনফুসিয়াস, আল্ কিনডি—এদের সবাই জ্ঞান অর্জন করেছেন প্রকৃতি থেকে, মানুষের সাথে মিশে, মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে, প্রকৃতি ও মানুষকে সুগভীর পর্যবেক্ষণ করে; এবং এদের কেউই জ্ঞান নিয়ে আত্মতুষ্ট মানুষ ছিলেন না; এদের সবাই চেষ্টা করেছেন বহু প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তচিন্তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে।

ক্ষুদ্রস্বার্থীয়-কোটারীকরণ, দলীয়করণ করা যাবে না, কোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও যান্ত্রিকতা সহ্য করা ভুল হবে। এ পুনরুদ্ধার কাজের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে জনগণের পক্ষে সরকারপ্রধানকে, যিনি প্রয়োজনে সুযুক্তি দিয়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো পাল্টে দিতে পারেন (তবে অগণতান্ত্রিকভাবে নয়)। এ জন্য প্রয়োজনে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের বিধি মোতাবেক জরুরি অবস্থাকালীন পদক্ষেপ বা অনুরূপ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন, যে পদক্ষেপ শেষ বিচারে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাধান্য নির্দেশ "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"-এর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৩. অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কোভিড-১৯: একই সময় একই সঙ্গে দুই মহারোগ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে লকডাউন করতে হয়েছে (বিশ্বব্যাপী); আর লকডাউনের কারণে বন্ধ হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-কলকারখানা-পরিবহন-যোগাযোগ-অফিস-আদালত সবকিছুই। মানুষ কর্মহীন হয়েছেন, বেকারত্ব বেড়েছে, দ্রব্য-সেবা উৎপাদন বন্ধপ্রায় (অবশ্য এসবের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়ন ডলারের ঊর্ধ্বে আয় বেড়েছে কিছু খাতের মালিকের, বিশেষত যারা অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে ছিলেন ও আছেন)। এর ফলে পৃথিবীর সব দেশেই (এমনকি যেসব দেশে তেমন লকডাউন হয়নি) সাধারণভাবে যা ঘটেছে তা হলো লেনদেন বন্ধ।

আমরা জানি যে অর্থনীতিতে একজনের ব্যয় অন্যজনের আয়। প্রত্যেক দিন এ ধরনের লক্ষ-কোটি ব্যয়-আয় লেন-দেনই অর্থনীতির প্রাণ। আর যখন একজন ব্যয় করার সক্ষমতা রাখেন না, তখন অন্যজনেরও আয় বন্ধ। আর এটা চলতে থাকলে এবং ব্যাপকভাবে প্রসারিত হলে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি হলে অর্থনীতি তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। এ অবস্থায় যারা ব্যাংক থেকে বড় ঋণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-মিল-কারখানা চালিয়ে যেতে চান, তারাও সেটা পারবেন না। কারণ লেনদেন বন্ধ। আবার কোভিড-১৯ এমন বিষয় যে শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য-যোগাযোগ-পরিবহন কোভিড-১৯-এর কারণেই বন্ধ করতে হয়েছে। এখনও আগের মতো সচল হয়নি। কোনো কোনো দেশ ধাপে ধাপে এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে যাকে বলে "ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল" (Phased-in exit strategy from lockdown)।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমন যে ঋণগ্রস্তরা যখন ঋণ ফেরত দেওয়ার অবস্থায় থাকছে না, তখন তাদের দেনা বাড়ছে, যা ঋণদাতার (অর্থাৎ মূলত ব্যাংক অথবা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে। কারণ ঋণদাতার জন্য যে ঋণপ্রদান একসময়ে (স্বাভাবিক সময়ে) 'সম্পদ' (asset) হিসেবে গণ্য হতো তা এখন 'বোঝা' (liability) হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ঋণদাতা এখন আর ঋণ প্রদানে রাজি হবে না; আর ঋণগ্রহীতাও এমনিতেই অনেক দেনাগ্রস্ত, দেনা বাড়িয়ে তার লাভ নেই (এটা স্বাভাবিক অবস্থার কথা, কারণ এরই মধ্যে কিছু ঋণগ্রহীতা পাওয়া যেতে পারে যাদের ঋণ বাড়াতে অসুবিধা নেই)। সুতরাং এ পন্থায় ব্যাংক চাইবে কিছুটা নমনীয় হয়েও যদি প্রদানকৃত ঋণের কিছুটা ফেরত পাওয়া যায় (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ব্যাংক রাজি হবে সুদের হার কমানোসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিতে), আর ঋণগ্রহীতা (যদি সুস্থ মস্তিষ্কের হন) চাইবেন সহজ শর্তে বেচে-কিনে সুদাসলসহ ঋণ ফেরত দিয়ে মুক্ত হতে। কিন্তু ঋণগ্রহীতাও সেটা পারবেন না, কারণ, তার 'সম্পদের মূল্য' (asset value) অথবা 'মজুদের মূল্য' (stock value) কমে গেছে, আর ক্রেতাও তেমন নেই। সুতরাং সবাই মিলে সম্মিলিত এক বিপদের মধ্যে পড়বেন। এ বিপদের নাম বাণিজ্য চক্রের (business cycle) বিপদ। বাণিজ্য চক্রের এ বিপদ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বা বাজার অর্থনীতির সহজাত বিষয়।

বাজার অর্থনীতি অবশ্যম্ভাবীভাবেই অর্থনৈতিক উত্থান-পতন চক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকবে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পুনরুৎপাদনে এ বাণিজ্যচক্র (business cycle) থেকে পরিত্রাণের কোনোই পথ নেই। এই চক্রে মারাত্মক **মহারোগ** হলো **সংকট** (crisis)। পুঁজিবাদী মুক্তবাজার আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এই মারাত্মক মহারোগ-সংকট (crisis) অনিবার্য বিষয়, কারণ তা ওই ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা থেকে চিরস্থায়ীভাবে মুক্তির কোনো ধরনের ভ্যাকসিন বা ওষুধ নেই; ওই ব্যবস্থা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওই মহারোগ মুক্তির ভাবনাও হবে দিবাস্বপ্ন—কাল্পনিক। ওই মহারোগ সংকটের শুরু থেকে পরবর্তী সংকটের শুরু পর্যন্ত সময় ধরে চলবে বাণিজ্যচক্র, সেটা ওই মহারোগের মধ্যেই রুগির স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতি অবস্থামাত্র। রুগির উন্নতি-অবনতি বাণিজ্যচক্র ৪টি স্তর অতিক্রম করে থাকে: অবনতি (depression), সংকট (crisis), পুনরুত্থান (recovery), ও চরম উন্নতি (prosperity), বাণিজ্য চক্রটি কাজ করে এভাবে: অবনতি→সংকট পুনরুদ্ধার→চরম উন্নতি (prosperity)→অবনতি→সংকট→পুনরুত্থান→চরম উন্নতি→ইত্যাদি। এ চক্রের দুটি শীর্ষবিন্দু হলো উপরের দিকে উন্নতির চরম বিন্দু (boom) আর নিচের দিকে সংকটের চরম বিন্দু (slump)। তবে অবনতি ও সংকট দিয়েই এ চক্রের শুরু হয়।

পুঁজিবাদী বাণিজ্যচক্রে ঘটনাটি যেভাবে ঘটে এবং কোভিড-১৯-এও ঘটেছে (সারা বিশ্বসহ আমাদের দেশে) তা হলো: অবনতির (depression) প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে। অবিক্রীত পণ্যের বোঝা বাড়তে থাকে। প্রথমে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রি কমে যায় (কারণ মানুষের হাতে টাকা থাকে না অর্থাৎ ব্যয় কমে), আর শীঘ্রই জীবনযাত্রার অন্যান্য মৌলিক দ্রব্যগুলোর বিক্রিও কমে যায়। ফলে পণ্যের মজুদ বাড়ে। আর মজুদ বাড়লে উৎপাদন কমিয়ে ফেলতে হয়। পণ্য ঋণের সংকট (commodity credit) প্রকাশিত হয় পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের দেউলিয়া হওয়ার মধ্য দিয়ে। এরা আর টাকা শোধ করতে পারে না, নতুন অর্ডার দেয় না, উৎপাদক ও উদ্যোক্তারা উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বাজারে টাকার অভাব সৃষ্টি হয়, সুদের হার বেড়ে যায়; শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম কমে যায় (আমাদের শেয়ারবাজার মোট জিডিপির ১০-১২ শতাংশ), শেয়ার থেকে আয় অর্থাৎ ডিভিডেন্ড কমে যায় (তবে মরণোম্মুখ পুঁজিবাদ তা ভেন্টিলেশনে রেখে কৃত্রিমভাবে বাঁচাতে চেষ্টা করে)। শুরু হয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গে দেউলিয়াপনার ঢেউ—এ হলো পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য "মহারোগ-সংকট"-এর আগমন বার্তা। এ সময় মুক্তবাজারভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদন রেখা নিম্নতম বিন্দুতে নেমে আসার দৌড় শুরু হয়, (মহারোগ) সংকটের (crisis) শেষ সীমা এগিয়ে আসে; উৎপাদন থমকে যায়, নেমে আসে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও নিশ্চলতা (stagnation)—মুক্তবাজারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা-সৃষ্ট তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই মহারোগ সংকট ও স্থবিরতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে **প্রকৃতি-উদ্ভূত আরেকটি মহারোগ "কোভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন"**। এ হলো একই সময়ে একই শরীরে দুই মারাত্মক মহারোগের সর্বশেষ অবস্থা। এই দুই মহারোগের প্রথমটি আজ হোক কাল হোক হবেই, রোগটির নাম "বাণিজ্যচক্রে সংকটকাল", যা নিরাময়ের কোনোই ভ্যাকসিন/ওষুধ নেই; আবার অন্য মহারোগটি চিরস্থায়ী নয়, যার নাম "কোভিড-১৯" যা নিরাময় হবে সংশ্লিষ্ট ভ্যাকসিন-ঔষুধপত্তর আবিষ্কার এবং তা যথাদ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছানোর মধ্যে দিয়ে।

তবে মানবসমাজের কল্যাণভাবনার জন্য জেনে রাখা ভালো হবে যে যতদিন শোষণভিত্তিক-বৈষম্য সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টিকারী মনুষ্যবিচ্ছিন্নকরণ-উদ্দিষ্ট আর্থসামাজিক সিস্টেম পুঁজিবাদ ও তার মুক্তবাজার অর্থনীতি থাকবে, ততদিন সময়ান্তরে "মনুষ্যসৃষ্ট সংকট" (crisis) নামক **মহারোগটি** হবেই; আর যতদিন প্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হবে এবং অবিচার অব্যাহত থাকবে, ততদিন প্রকৃতির কোনো না কোনো ভাইরাস—হতে পারে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর, হতে পারে কোভিড-১৯-এর চেয়েও মারাত্মক "প্রকৃতিসৃষ্ট মহারোগ" আমাদের আক্রমণ করতেই থাকবে।

সাধারণভাবে বিপৎমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হতে পারে যদি ওই দুই মহারোগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটে, আবার মহাবিপদ হবে যদি ওই দুই মহারোগ একই সঙ্গে একই সময়ে ঘটে (যা এখন হচ্ছে)। আর এসবের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করবে (১) মূল্যস্ফীতি অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি (inflation), (২) মূল্যসংকোচন বা মূল্যহ্রাস (deflation), (৩) ডিজইনফ্লেশন (disinflation)—যখন মূল্যস্ফীতি ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকবে—মূল্য সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত কমতে থাকবে—যেমন এ মুহূর্তে জ্বালানি তেলের মূল্য, (৪) ইন-ডিফ্লেশন (in-deflation)—যখন একই সাথে মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচন ঘটতে থাকবে—যেমন একই সময়ে চালের দাম বেশি, কিন্তু ধানের দাম কম অথবা খাবারের দাম বাড়ছে কিন্তু ফ্ল্যাটের দাম কমছে, (৫) স্ট্যাগফ্লেশন (stagflation)—যখন অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও উৎপাদনে উচ্চ নিশ্চলতা বা স্থবিরতা একই সময়ে ঘটে। যখন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয় ধীর-মন্থর-শ্লথ, কিন্তু মূল্যস্ফীতি হয় অত্যুচ্চ—যেমনটি ঘটেছিল ১৯৭০-এর দশকে। এসব জটিলতা এখন কাজ করছে। তবে সামনে নতুন নতুন জটিলতা সৃষ্টি আদৌ অসম্ভব নয়।

মহামারি-রোগ হিসেবে কোভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন যা করার করেছে; রেশ থাকবে বহুদিন। একসময় কোভিড-১৯-এর কর্মকাণ্ড শেষ হবে, লকডাউন উঠে যাবে—মানুষ পূর্বতন অবস্থায় ফেরার চেষ্টা করবে। কোভিড-১৯ চিরস্থায়ী হবে না। কারণ, প্রকৃতির প্রতি এত অন্যায়-অত্যাচারের পরেও প্রকৃতি ক্ষমা করে; প্রকৃতি খুবই দয়ালু—কারণ, আমরা মানি আর না মানি প্রকৃতি তো জানে যে মনুষ্যসমাজ তারই (প্রকৃতিরই) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; প্রকৃতি প্রকৃতিবলেই বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতা বিশ্বাস করে না। আর প্রকৃতিই তো মানুষের মধ্যে সেই শক্তির জোগান দেয়, যা দিয়ে মানুষ ভাবনা-চিন্তা করে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে—যে শক্তি দিয়েই মানুষ আবিষ্কার করে ফেলবে কোভিড-১৯ মোকাবিলার ভ্যাকসিন-ঔষুধপত্তর-যন্ত্রপাতি।

অবশ্য এসবের পরেও লোভ-লালসা-মুনাফার তাড়না মানুষকে আবারো প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু লোভ-লালসাভিত্তিক এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণ প্রতিযোগিতাভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির সংকট নামক মহারোগ-এর কী হবে? যা হবে তা হলো—ব্যবস্থা ওটাই থাকলে অর্থনৈতিক সংকট নামক মহারোগটিও বাণিজ্যচক্রের রীতি অনুযায়ী যাওয়া-আসা করবে। অর্থনীতি নিশ্চল হবে, স্থবির হবে, মহাদুর্যোগ হবে (যাকে বলে সংকটময় ক্রান্তিকাল)। এখানে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলে রাখা জরুরি। কারণ, আমরা খুঁজছি—শোভন সমাজে উত্তরণের সমাধান।

৪. কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও বাজার অর্থনীতি

মহাবিপর্যয়কর দুর্যোগকালীন সংকটকালে উৎপাদন ও পণ্যমূল্যের হ্রাস সাময়িকভাবে উৎপাদন ও ভোগের অসমানুপাত দূর করে। সংকটকালে দামগুলো থাকে খুবই কম, পণ্যের বাড়তি মজুদ শেষ হয়ে যায়, যা কোভিড-১৯-এর লকডাউনে খুব বেশি হয়েছে। কিন্তু দাম কমলে তো মুনাফাখোরদের খুবই অসুবিধা। মুনাফাখোরেরা এ সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করে। তাদের এসব চেষ্টার সাথে নীতিনৈতিকতার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তারা কম দামে মুনাফা রক্ষা, এমনকি মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে ফেলে—কোভিডেও সেটাই হয়েছে। তারা শোষণের হার বাড়াতে থাকে। এই প্রচেষ্টায় তারা সম্ভব-অসম্ভব সব পথ-পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে: পুরোনো যন্ত্রপাতি বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে দক্ষতর যন্ত্র ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন, নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই করে স্বল্প মজুরিতে জেলখানার কয়েদিদের এনে কাজ করানো (যা যুক্তরাষ্ট্রে পরিচ্ছন্নকর্মীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে), উৎপাদন ও সেবামূলক খাত-ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করে রোবট বা সমজাতীয় যন্ত্রপাতি অনুসন্ধান ও ব্যবহার ইত্যাদি। আর এসব করতে

পুঁজিপতিরা ব্যাপক মাত্রায় স্থির পুঁজির (constant capital) নব-বিনিয়োগ শুরু করে। এতে নব-উদ্ভাবিত উৎপাদনী যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সংকট থেকে উত্তরণ ঘটে। বৃহৎ কলকারখানা, বৃহৎ সেবাখাত, যন্ত্রপাতি বানানোর কারখানা (যাকে বলে heavy industry বা ভারী শিল্প)—এসবে স্থির পুঁজির সমাহার বাড়ে—যার অর্থ এসব খাত-ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমে যায়। আর কমে যাওয়া শ্রমিক-কর্মচারী বাহিনী কাজ খোঁজে অন্যখানে। একদিকে ঘটে পুঁজিপতির সমৃদ্ধি, আর ঠিক একই সাথে পাশাপাশি একই সময়ে কাজ থাকুক আর না থাকুক অধোগতি ঘটে শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণির।

এতক্ষণ যা বললাম তাতে পুরো প্রক্রিয়ায় যা ঘটে তা হলো—একদিকে পুঁজির মূল্যহনন (যাকে বলে slaughtering the value of capital), আর অন্যদিকে মোট জাতীয় আয়ে শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণির তুলনামূলক হিস্যা হ্রাস। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে—আবারও পুঁজির ভবিষ্যতে মূল্য আদায় সম্ভাবনা কমে যায় (যেমন শেয়ার বা বন্ড-এর মূল্য হ্রাস), পাওনার অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, স্থির পুঁজির উপাদানগুলো মূল্য হারায়, অনেক দাম একসঙ্গে কমে যায়, টাকার বিনিময়যোগ্যতা লোপ পায়, লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে টাকার গতি রোধ হয়, লেনদেনের সুশৃঙ্খল ধারাটিই ভেঙে পড়ে, পাওনাদি সময়মতো মেলে না, পুরো ঋণব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে, সৃষ্টি হয় বেকার মজুর বাহিনী, কমে যায় মূলধনী দ্রব্যের দাম—আবারও সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক সিস্টেম-উদ্ভূত মহারোগ সংকট। ওই সিস্টেম যতদিন থাকবে, ততদিন ঘুরে-ফিরে এসবই চলবে। চলবে নিরন্তর এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই।

তাহলে দাঁড়ালটা কী? মুনাফাভিত্তিক-লোভলালসাভিত্তিক-বৈষম্য উৎপাদনভিত্তিক-বিচ্ছিন্নতা উৎপাদনভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় উন্নয়ন হবে। তবে তা হবে বাণিজ্যচক্রের (business cycle) মধ্যস্থতায়, যেখানে 'সংকট' (crisis) নামক মহারোগটি বাণিজ্যচক্রেরই একটি স্তর। এখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্বের শর্ত হিসেবে কয়েকটি বিষয় কার্যকারণের শিকলে (causal chain) বাধা থাকবেই: মূলধন-সঞ্চয় (প্রচণ্ড ওঠানামা করবে) থেকে কর্মসংস্থানের পরিমাণ→কর্মসংস্থানের পরিমাণ থেকে মজুরির স্তর→মজুরির স্তর থেকে মুনাফার স্তর। এ প্রক্রিয়ায় মুনাফার হার স্বাভাবিক মানের নিচে নেমে গেলে মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ প্রথমে কমে যাবে তারপরে আরো অবনতি হতে হতে তা একসময় সংকটে পরিণত হবে; আবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হলে মূলধন সঞ্চয়ের গতিবেগ বেড়ে যাবে। সম্পূর্ণ চক্রটি এমন যে এক সংকটকাল থেকে অন্য সংকটকালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর টেকনোলজির স্তর উন্মোচন করবে (যা সবাই দেখছেন), ফলে উৎপাদন আরো বেশি সামাজিক রূপ নেবে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যচক্রের (business cycle) এক অতিসাধারণ সংকট থেকে পরের অতিসাধারণ সংকটের মধ্যবর্তী সময়টা সাধারণত ৮-১০ বছর (এটা হবে স্বল্পমেয়াদি ঋণচক্রের ফল), আর এক মহাসংকট-মহামন্দা (Great depression) থেকে পরবর্তী মহাসংকট-মহামন্দার সময়কাল ৭০-৯০ বছর (যা দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রের ফল; আর সাধারণ সংকট হবে আনুমানিক প্রতি ৫০ বছর পরপর)। কিন্তু দুই সংকটকালের অন্তরকাল ততই ছোট হয়ে আসবে, সংকটের গভীরতা ও ব্যাপ্তি যত বাড়বে, আর গভীরতা ও ব্যাপ্তি ততই বাড়বে যতই উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সামাজিকীকরণ বাড়বে। দুই সংকটকালের মধ্যবর্তী সময়টা যতই ছোট হয়ে আসবে উন্নতি ও সমৃদ্ধিকাল ততই দুর্বলতর ও ক্ষীণতর হয়ে আসবে; এমনকি অত্যুচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারবে না (অবশ্য এখানে সংজ্ঞাগত বিষয় সুরাহা করতে হবে)।

উপরের বিষয়গুলো বুঝতে সহায়ক বিধায় এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস থেকে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে: (১) ১৯২০ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে তিনটি অর্থনৈতিক সংকট দেখা গেছে—১৯২০-২১, ১৯২৯-৩৩, ১৯৩৯-৪৫। অর্থাৎ সংকটের চক্রকাল ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে; (২) ক্রমশ

ছোট হয়ে আসা চক্রকালে উন্নতিকাল-সমৃদ্ধিকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে তেমন নাড়া দেয়নি। যেমন ১৯২০-২৯ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্য (ব্রিটেন) কোনোমতে ১৯২০ স্তরে পৌঁছেছিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের উন্নতি ছিল ব্রিটেনের তুলনায় বেশি; (৩) ১৯২৯-৩৭ সালের মধ্যে বৈশ্বিক শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ১২ শতাংশ, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছিল মাত্র ৪.৬ শতাংশ আর ফ্রান্সে কমেছিল ১২.৫ শতাংশ, ইতালিতে ছিল আগের কাছাকাছি পর্যায়ে।

পুঁজিবাদী সিস্টেমের সংকট আর মহামন্দার ইতিহাস আমাদের জন্য অতিব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা হাজির করে। শিক্ষাটা হলো: সংকট-মহামন্দা কৃষির ওপর প্রচণ্ড আঘাত করে। ভূমি খাজনা ও ভূমি মালিকানাকেন্দ্রিক বিরোধ কৃষিখাতে সংকট দীর্ঘতর করে এবং তা হয়ে ওঠে গভীর যন্ত্রণাদায়ক। এ সংকট একদিকে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে প্রকৃত কৃষককে বঞ্চিত করে—প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষি সর্বস্বান্ত হন, আর অন্যদিকে এ সুযোগে মুনাফালোভী পুঁজির মালিকেরা কৃষিতে স্থির পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ করে ফেলেন। এর ফলে পরবর্তীতে উৎপাদন বাড়ে (অতি-উৎপাদনজনিত কৃষি সংকটও বাড়ে)। কিন্তু প্রাকৃতিক সবুজ-কৃষি উত্তরোত্তর অধিক হারে রসায়ননির্ভর হয়ে কৃষিসংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয় (যা 'ভাইরাস' উদ্ভবে প্রণোদনা সৃষ্টি করে)। অতীতের প্রকৃতিনির্ভর জৈবকৃষিতে যখন ১ কেজি খাদ্য উৎপাদনে ১ কেজির সমপরিমাণ সূর্যশক্তি (জীবাশ্ম শক্তি যেমন—অনবায়নযোগ্য জ্বালানি) প্রয়োজন হতো, তখন অজৈবনির্ভর কৃষিতে ওই ১ কেজি খাদ্য উৎপাদনে এখন প্রয়োজন হয় ১০ কেজি সমপরিমাণ সূর্যশক্তি। প্রকৃতি ধ্বংসের এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে? আমাদের মনে রাখা দরকার (অথবা ভুলে গেলে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মহাক্ষতির কারণ হব) যে জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ সীমিত এবং তা নবায়নযোগ্য নয়; মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে যত জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদ (গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি) আছে তা গত ২০ কোটি বছরের সূর্যের আলোর পুঞ্জীভূত মজুদমাত্র। একে বিনষ্ট করার অর্থ সভ্যতাকে বিলুপ্ত করা। সভ্যতা হনন করা। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিপ্রণেতাসহ সবাইকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

কোভিড-১৯-এর লকডাউনে বাজারের লেনদেন স্থবির হয়ে যাওয়ার পরে মুক্তবাজারের কর্মকাণ্ড এমনই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, যেখানে 'ঝুঁকি' রূপান্তরিত হচ্ছে 'অনিশ্চয়তায়' (risk turns into uncertainty)। এসব গেল একদিকের কথা। অন্য আরেক দিকের কথা বলা উচিত। তা হলো: স্বল্পমেয়াদি ঋণচক্রে (short term debt cycle)—এসব সমস্যা খুব একটা দৃশ্যমান হয় না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রে (long term debt cycle)—এসবের ফল যেটা দাঁড়ায় তা হলো—আনুমানিক ৯০ বছর পরপর মহামন্দা (great depression) জাতীয় কিছু একটা ঘটবেই। সর্বশেষ বৈশ্বিক মহামন্দা (বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রসমূহে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, স্পেনসহ ইউরোপের বহু দেশে) হয়েছিল ১৯২৯-৩০ সালে। সে হিসেবে ১৯৩০-এর দশকের শুরুর দিকের ওই মহামন্দার ৯০ বছর পরে ২০২০ সালে (অবশ্য আগেই বলেছি ১৯২০-৩০ এর দশকের মহামন্দা ছিল তিন স্তরবিশিষ্ট), যে মহামন্দা হবে তা তো "দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রের" কারণেই হবে। স্বাভাবিক যা হওয়ার কথা তা হয়েছে ২০২০ সালেই, সাথে যুক্ত হলো বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯; যা নিঃসন্দেহে মহামন্দার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে জটিলতর করবে (যা একটু আগেই সবিস্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি) এবং যেখান থেকে স্বাভাবিক ও অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও উৎপাদনে উচ্চ নিশ্চলতা বা স্থবিরতা একই সময়ে ঘটে; যখন একই সময়ে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয় ধীর-মন্থর-শ্লথ, কিন্তু মূল্যস্ফীতি হয় অত্যুচ্চ—যেমনটি ঘটেছিল ১৯৭০-এর দশকে।

যা বললাম এসব থেকে স্বল্প সময়ে উত্তরণের পথ নাও থাকতে পারে। আমরাও এখন এ ধরনের একটি সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আর এ সমস্যা গুণিতক হারে বাড়বে যদি ঋণ বাজারে গ্রহীতা ইতিমধ্যে তার মনোপলি সৃষ্টি করে থাকেন। বাংলাদেশে আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই-ই হয়েছে। আমরা কোভিড-১৯-এর অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে উদ্ধার-পুনরুদ্ধার করতে চাই বিধায় বিষয়টি খোলাসা করা দরকার।

বাংলাদেশে ঋণের বোঝা কোনো অর্থেই কম নয়। বিষয়টি একই সময়কালের জন্য অন্য কোনো দেশের সাথে তুলনা করা সঠিক নয়—তাতে ভ্রান্ত বার্তা দেওয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের মোট বোঝা ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা [(৩০ জুন ২০২০ অনুযায়ী) সারণি ১ থেকে হিসেবকৃত)], যা জিডিপির ৫৩.২৩ শতাংশের সমান (অর্থাৎ ঋণ: জিডিপি অনুপাত স্বল্প নয়)। দেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি হলে মাথাপিছু ঋণের বোঝার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৯,৫৩৯ টাকা; অথচ দেশের সম্ভবত ৯৮ শতাংশ মানুষ এসব ঋণ নেননি, কিন্তু যেভাবেই হোক শেষপর্যন্ত এ ঋণ ফেরত দিতে হবে তাদেরই। কারণ সরকার আসলে কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না, সরকার উৎপাদনও করে না (সরকারি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতে উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্যের মালিক "জনগণ"—সংবিধান অনুচ্ছেদ ৭)। মোট ঋণের মধ্যে সরকারের বোঝা ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা (যা মোট ঋণের বোঝার ২৫.২৮ শতাংশ, আর জিডিপির ১৩.৪৩ শতাংশ)। আর ব্যক্তিমালিকদের কাছে অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টরে মোট ব্যাংক ঋণ ও অগ্রিম মওকুফসহ আছে আনুমানিক ১০ লক্ষ ১০ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা (যা মোট ব্যাংক প্রদেয় ঋণ ও অগ্রিমের ৯৭.৩ শতাংশ, আর জিডিপির ৩৯.৭৬ শতাংশ), আর এর মধ্যে শ্রেণিকৃতসহ মওকুফ হয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (যা তাদের গৃহীত মোট ঋণ ও অগ্রিমের ১২.৮৬ শতাংশ)। এসব ঋণের অধিকাংশই বড় ঋণগ্রহীতা এমনিতেই ফেরত দিতে খুব একটা আগ্রহী হন না, আর এখন কোভিড-১৯ আর লকডাউনের সুযোগে আগ্রহী তো হবেনই না উল্টো মওকুফ চাইবেন, চাইবেন বিনাসুদে আরো বেশি—পারলে ঋণ নয় অনুদান-ফিতরা। এসবও আসল কথা নয়। আসল কথা ও তার বিশ্লেষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত দলিলপত্রে থাকে না। আসল কথার মধ্যে কয়েকটি জরুরি কথা হলো এ রকম:

(১) ***বড় ঋণগ্রহীতারা ঋণবাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করেন—তারা যদি ঋণ ফেরত না দেন?*** বড় ঋণগ্রহীতা যারা সমাজে খুবই সম্মানিত (!) মানুষ তারা ঋণবাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করেন। যেমন—সর্বোচ্চ ঋণগ্রহীতা মাত্র ২০ জনের কাছে আছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৬০ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম (খেলাপি বা শ্রেণিকৃত ও মওকুফসহ)। অর্থাৎ মোট ব্যাংক ঋণের ১৬.৪৫ শতাংশের ওপর কর্তৃত্ব করেন মাত্র ২০ জন ব্যক্তি (পরিবার)। এদের মধ্যে আবার মাত্র একজন ব্যক্তির কাছেই আছে ৬৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ-অগ্রিম (বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিকৃত ও মওকুফসহ)। এ পরিমাণ অর্থ আমাদের চলতি বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের মোট বরাদ্দের তুলনায় ২.৬ গুণ বেশি অথবা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ১৫ গুণ বেশি অথবা প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ২.৬ গুণ বেশি। কী করবেন যদি কোভিড-উত্তর সামনের মহামন্দাবস্থায় (আসলে অর্থনৈতিক মন্দা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে) বড়-মাঝারি ঋণগ্রহীতারা ঋণ ফেরত না দেন? বড় ঋণগ্রহীতারা তো আরো বেশি চাইবেন—ঋণ নয় অনুদান, ক্ষেত্রবিশেষে অনুদান নয় পারলে তার চেয়েও বেশি কিছু। অবস্থাদৃষ্টে নিশ্চিত যে সেটাই হবে।

সারণি ১: বাংলাদেশে ঋণের বোঝা—৩০ জুন ২০২০ (তারিখে)

ঋণের উৎস	মোট ঋণ		জিডিপির শতাংশ (২০১৯-এর চলতি মূল্যে জিডিপি, ২৫,৪২,৪৮০ কোটি টাকা*)
	কোটি টাকায়	মোট ব্যাংক ঋণের শতকরা অংশ	
অভ্যন্তরীণ			
ব্যাংকপ্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম (loans and advances)	৯৮০,২১৮	৯৪.৭৪	৩৮.৫৫
তার মধ্যে শ্রেণিকৃত ঋণ (classified)	১১২,৪২০	১০.৮৭	৪.৪২
ঋণ মওকুফ (written off, খাতা থেকে বাদ)	৫৪,৪৬০	৫.২৬	২.১৪
মোট অভ্যন্তরীণ	১০,৩৪,৬৭৮	১০০	৪০.৭৪
সরকারের ঋণ			
বৈদেশিক	৩১৭,৪৮৮	-	১২.৪৯
অভ্যন্তরীণ	২৩,৭৯৮	২.৩	০.৯৪
সরকারের মোট ঋণ	৩৪১,২৮৬	-	১৩.৪৩

উৎস: Bangladesh Bank Annual Report 2019 (Budget Book 2020 a)-এর ভিত্তিতে গ্রন্থকার কর্তৃক হিসেবকৃত

যেহেতু আমরা বড় পর্দায় রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে চাই, সেহেতু বড় ঋণের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্বকারীরা আসলে কী করে আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বা এসবে কী ভূমিকা পালন করে—এ বিষয়ে জেনে রাখা সংগত হবে যে—আমাদের সম্মানিত নীতিনির্ধারকেরা যে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাকে আদর্শস্থানীয় মনে করেন এবং অনুসরণ করেন সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসব নিয়ে আসলে কী কী হয় (এখন কী হচ্ছে)? আমাদের যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক—বাংলাদেশ ব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনই কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ'। আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল রিজার্ভের মূল কাজ হলো : (১) মূল্য স্থীতিশীল রাখা (অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ও মূল্যসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা), (২) মুদ্রা সরবরাহ দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) বাণিজ্যচক্রের ওঠানামা সংযত ও সমন্বয় করা। আসলে যে উদ্দেশ্যে ফেডারেল রিজার্ভ সৃষ্টি করা হয়েছে তা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনরুৎপাদনে সহায়তা করা। অর্থাৎ ফেডারেল রিজার্ভ কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, তা পুঁজিবাদী সিস্টেমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সব রেকর্ডপত্তর তাই-ই বলে। এই শতকের প্রথম ২০ বছরে (২০০০-২০২০) মার্কিন যুক্তরাষ্টে তিনটি অর্থনৈতিক সংকট হয়েছে—২০০০ সালে ডটকম সংকট, ২০০৮ সালে সাব-প্রাইম মর্টগেজ সংকট, আর এখন ২০২০ সালে অর্থনৈতিক মহাসংকটের পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংকট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবগুলো সংকট নিরসনেই ব্যর্থ হয়েছে এবং সেটাই হওয়ার কথা। যেমন সংকট নিরসনে ব্যাংকের ঋণের সুদহার শূন্য করা হয়েছে (প্রয়োজনে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ করা হবে) অর্থাৎ ডলার—সস্তা করা হয়েছে (সুদের হারই অর্থের মূল্য)। এসবের ফলে অ্যাসেট বা স্টক মূল্য কমে যাচ্ছে-যাবে। ফেডারেল রিজার্ভের সস্তা ডলার নিচ্ছে মেগা-কর্পোরেশন এবং মেগা-ব্যাংকরা। মেগা-কর্পোরেশন যারা ফেডারেল রিজার্ভের সহযোগিতায় সস্তা ডলার ঋণ নিচ্ছে, এরা কোনো দিনই ঋণের অর্থ ফেরত দেয় না—ঋণ হিসেবে সস্তা ডলার ওদেরই দেওয়া হয় (একই কথা মেগাব্যাংকগুলোর জন্যও প্রযোজ্য, যারা প্রকৃতপক্ষে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি ও সরকারের জয়েন্ট স্টক কোম্পানি)। ওরা ঋণ নেয়, ফেরত দেয় না, আবারও নেয়, আবারও ফেরত দেয়

না। এদের বলা হয় "জোম্‌বি কর্পোরেশন" অর্থাৎ অবিবেচক "কর্পোরেশন" অথবা "ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন"। এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে সুদের হার বাড়াতে হয়, তখন 'জোম্‌বি'দের বিশাল লাভ হয়। কারণ তখন সম্পদ, অ্যাসেট, স্টক, বাড়িঘর, দালানকোঠা, সোনাদানা, কলকারখানা—এসবের দাম বেড়ে যায়, আর তখনই যার সম্পদ আছে তার মহোৎসব; আর যার নেই তার 'পোড়া কপালে আগুন'। অর্থাৎ দারিদ্র্যও বাড়বে, বৈষম্যও বাড়বে। এ প্রক্রিয়া আবারও চলবে, আবারও থামবে। তবে এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে দেউলিয়াত্ব শৃঙ্গে পৌঁছে মন্দা মহামন্দায় (great depression) উত্তরিত হবে। আর যখন বেকারত্ব অতীতের সব রেকর্ড ছাড়ায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটাই এখনকার অবস্থা), যখন প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় অথবা স্থবির হয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত ৪০ বছর প্রকৃত মজুরি হয় কমছে না-হয় স্থির অবস্থায় আছে), যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক (অর্থাৎ ওদের ফেডারেল রিজার্ভ) মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহ দেখায় না— তখন পুরো অর্থনীতি সিস্টেম ধসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এতে ফেডারেল রিজার্ভের কিছুই করার নেই, কারণ সে বড় সিস্টেমের দাসমাত্র। আমাদের রেন্টসিকার-দুর্বৃত্ত-লুটেরানিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে এসব সমভাবে প্রযোজ্য।

(২) ***একচেটিয়া বড় ঋণগ্রহীতারা তেমন কোনো বন্ধক দেন না।*** বড় ঋণগ্রহীতারা যে এত বিপুল ঋণ নিয়েছেন তার বিপরীতে কোলেটারাল বা বন্ধক কী দিয়েছেন? আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব নিয়ে মুখ খুলবে না, অথবা মুখ খুললেও সত্য কথা বলবে না, আর মিথ্যা বললেও কেউ ধরতে পারবে না, আর কেউ ধরতে পারলেও তাকে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করা হবে, তারপরে 'ভুল' স্বীকারের জন্য হবে চাপাচাপি, তারপরে অনেক ধরনের হেনস্থা হতে হবে, আর তার পরে—আল্লাহ জানে! সুতরাং সত্য জানেন এমন কেউই মুখ খুলবেন না—এ কথা রাঘববোয়লেরা জানেন। কেউ কেউ ওদের (বড়দের) প্রতি একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলেন—ওরা তো ১ টাকা ঋণের বিপরীতে বন্ধকি সম্পত্তি হিসেবে অন্তত ১০-১২ পয়সা দিয়েছেন (ঋণের নিম্নতম ইকুইয়িটি অনুপাত কোথায় গেল?)। কিন্ত সত্য কথা ভিন্ন: ১ টাকা ব্যাংক ঋণের বিপরীতে তাদের ১০-১২ পয়সারও বন্ধকি সম্পত্তি নেই, কারণ ওদের বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়িত। সেভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে ১ টাকার ঋণের বিপরীতে ওদের বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য বড়জোর ৫ পয়সা। শুধু তা-ই নয় অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধকি সম্পত্তির দলিলটিই জাল দলিল, অথবা সম্পত্তিতে বহু ধরনের ভেজাল—সম্পত্তি নিষ্কণ্টক নয় (অথচ ঋণ দেওয়ার সময় ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত দিয়ে বোর্ডে উপস্থাপন করতে হয়) এখানেই দায়দায়িত্বহীন অস্বচ্ছ ব্যাংক ঋণের গল্পের শেষ নয়। বেশির ভাগ বড় ঋণগ্রহীতা আবার বন্ধকি সম্পত্তির ধার ধারেন না, তারা ব্যাংক ঋণ নেন 'কর্পোরেট গ্যারান্টি' দিয়ে। 'কর্পোরেট গ্যারান্টি' (?) একটা মূল্যহীন কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে এ ধরনের একটা মূল্যহীন কাগজ? নীতিনৈতিকতাবিবর্জিত "বড় ঋণের" এই গল্পের এখানেই শেষ নয়। আসলে এ গল্পের শেষও নেই (তবে শুরু আছে)—রেন্টসিকিং 'লুটেরা'-অধ্যুষিত সমাজ-অর্থনীতিতে এ গল্প চলতেই থাকবে (যার কার্যকারণ আমরা তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি)। চরমতম অন্যায় করলেও এদের কিছুই হয় না, এদের নিয়ন্ত্রক সংস্থারাও হয় দুর্বল অথবা এদের কথায় ওঠাবসা করে। অথচ এসবের বিপরীতে এ দেশেরই গ্রামের কৃষক খুব স্বল্প পরিমাণ কৃষি ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে অক্ষম হলে সার্টিফিকেট মামলায় তাকে মাজায় দড়ি বেঁধে দিনে-দুপুরে জনসম্মুখে থানা, হাজত, জেলে নেওয়া হয়। আমরা

এসব প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এ জন্য যে কোভিড-১৯ আক্রান্ত সমাজ ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে রাষ্ট্রের যখন খুবই প্রয়োজন হবে, তখন ওই ১০ লক্ষ ১০ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার ঋণ ফেরতের কী হবে? সরাসরি বলি—ওরা কিছুই ফেরত দেবেন না, দিতে পারেন না। কারণ, সিস্টেমটাই এমন যে এমনিতেই ফেরত দিতে হয় না, আর এখন তো ফেরত না দেওয়ার জন্য দোষী পাওয়া গেছে—ভাইরাস, কোভিড-১৯ (ওরা এসবের জন্যেই অপেক্ষা করেন; আর এমন কিছু পাওয়া না গেলে—কাল্পনিক শত্রু সৃষ্টি করেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যও করিয়ে ছাড়েন)। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এ রকম যে সামনে মহাদুর্দিন—ঘোর অন্ধকার। কী করবে রাষ্ট্র ও সরকার? রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরারা রাষ্ট্র নামক গাড়ির চালকের আসনে থাকলে রাষ্ট্র-সরকার কিছুই করতে পারবে না। উল্টো তারা প্রকল্প ঋণ ও অগ্রিমের নামে জনগণের শ্রমসৃষ্ট আরো অর্থ আত্মসাৎ করবে। এসবই শেষপর্যন্ত কিছু মানুষের হাতে ধন-সম্পদের পুঞ্জীভবন ও ঘনীভবন ত্বরান্বিত করবে, আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী উত্তরোত্তর দরিদ্রতর হবে, অর্থাৎ শেষপর্যন্ত বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়বে।

(৩) ***কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি জনগণের আমানত এমনি-এমনিই কিছু সুপার ধনীর হাতে তুলে দেয়?*** গত শতকের শেষের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী উন্নত বিশ্বে চিরায়ত পুঁজিবাদ থেকে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (Financialized capital, যা আসলে উৎপাদনশীল পুঁজি নয়; যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী নয়; যার কাজকারবার মূলত শেয়ার কেনাবেচার মধ্যেই সীমাবদ্ধ) বিচ্ছেদ ঘটেছে। যাকে বলা যায় decoupling of money market and financialized market। অর্থাৎ আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি মালিক ব্যাংক থেকে বিপুল অর্থ নিয়ে উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে শেয়ারবাজারে খেলা করেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত বছরের প্রথম তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোজোনের দেশগুলোতে উৎপাদনে বিনিয়োগকৃত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু একই সময়ে অবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তাহলে ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলার গেল কোথায়? যেখানে গেল তাতে বুঝতে হবে যে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদ চিরাচরিত পুঁজিবাদ থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছে। আবার একই সাথে এটাও নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে যে যখন অর্থনীতি নিম্নগামী (অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধ, কারখানা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই চলছে), ঠিক তখনই আবার শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম বাড়ছে (মেইন স্ট্রিটে নয় ওয়ালস্ট্রিটের দিকে খেয়াল করুন)। কিন্তু বাণিজ্যচক্রের নিয়মানুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদে এসব বুদ্‌বুদ (bubble) ফেটে পড়তে (burst) বাধ্য। আর তখন ওদেরই উদ্ধার বা bail out-এর নামে জনগণের ট্যাক্সের অর্থ এবং জনগণের আমানতকৃত অর্থ নির্দ্বিধায় ওদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যখন বড় বড় কর্পোরেশন যাকে বলে মেগাফার্ম-মেগাব্যাংকের সাথে যৌথ-উদ্যোগে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে যাচ্ছে (যাকে কেনেথ গলব্রেথ 'নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়ালে স্টেট' নামে অভিহিত করেছেন), তখন অর্থের প্রবাহগতি যে ক্রম অনুসরণ করতে বাধ্য, তা হলো এ রকম: অর্থ প্রবাহিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকে, আর সেখান থেকে কর্পোরেশন; পরে একসময় 'কর্পোরেশন' মন্দাগ্রস্ত হচ্ছে—দেওলিয়া হচ্ছে, যখন আবারও কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের উদ্ধার—bail out করছে। কার টাকাপয়সায়? একমাত্র জনগণের টাকাপয়সায়। আমাদের দেশেও কোনো ধরনের ব্যত্যয় ছাড়া ঠিক তাই-ই হচ্ছে। আর উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে টাকা যে পরিমাণ সস্তা হয়েছে (সুদের হারই টাকার মূল্য, যেখানে ওইসব দেশে সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি অথবা তারও নিচে—যে টাকা নিয়ন্ত্রণ করে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির মালিকেরা—রেন্টসিকার-লুটেরারা),

> উৎপাদনী বিনিয়োগ যেভাবে শ্লথ হয়ে অর্থনীতি নিয়মিত মন্দা-মহামন্দায় পড়েছে, শ্রমিকশ্রেণি-মেহনতি কর্মী যেভাবে কর্মচ্যুত হচ্ছে একই সাথে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় সামাজিকীকরণের চাহিদা বাড়ছে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যে পরিমাণ সক্ষমতা অর্জন করেছে, তাতে করে ওইসব দেশে নতুন শোভন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দুটি জিনিসের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ (termination অর্থে) প্রয়োজন: (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য সব কমার্শিয়াল ব্যাংক, (২) মজুরিশ্রম (কারণ শ্রমিকেরা যদি তাদের কর্মরত কলকারখানা, কৃষিজমি, জল-জঙ্গল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন তাহলে প্রচলিত অর্থের মজুরি শ্রমিকের প্রয়োজন থাকে না)। আপাতদৃষ্টিতে কাল্পনিক মনে হলেও শোভন জীবনব্যবস্থা বা শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আরো ভালো বিকল্প কী আছে?

এ অবস্থায় আমাদের দেশে জনগণকে আস্থায় রেখে রাষ্ট্রকে সংবিধান মোতাবেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে; সরকারকে নির্মোহভাবে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে; জনগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে জনগণকে সাথে রাখতে হবে। এ অন্ধকার থেকে আলোর পথে যেতে হলে ১০ কোটি ৭০ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত (৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র ও ৩ কোটি ৯১ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত) মানুষের দিকে তাকাতে হবে—যথাদ্রুত সম্ভব তাদের দারিদ্র্যাবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে, মানুষকে কাজ দিতে হবে—শোভন কাজ ও ন্যায্য মজুরি/পারিশ্রমিক, অণু-ক্ষুদ্র-ব্যবসা বাণিজ্য সচল করার শক্তি জোগাতে হবে, অনানুষ্ঠানিক খাতের দরিদ্র-শ্রমজীবী মানুষদের কাজ দিতে হবে (এরা দেশের শ্রমবাজারের ৮০-৮৫ শতাংশ), ঐতিহাসিকভাবেই অগ্রাধিকারহীন কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে এগুতে হবে, মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে মানবকল্যাণকামী গবেষণা ও উন্নয়নে (R & D), জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে, মানবকল্যাণকর এবং কখনোই-কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতিবিধ্বংসী নয়, এমন বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচির' আওতায় প্রায় ১০ কোটি দরিদ্র (নবদরিদ্রসহ) মানুষের অন্ন-পুষ্টি জোগাতে হবে, শিল্প ও সেবা খাত উজ্জীবিত করতে হবে—এসবই নির্মোহতা ও বিশ্বস্ততার সাথে করতে হবে, করতে হবে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাবোধ প্রয়োগে সংবিধানে প্রতিশ্রুত "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"র ভিত্তিতে। প্রশ্নটা যখন মরা-বাঁচার, তখন এসব অসম্ভব কোনো প্রস্তাবনা নয়; অবান্তর তো নয়ই। উল্টো এসবই শোভন সমাজ বিনির্মাণের পূর্বশর্ত।

৫. কোভিড-১৯ ও মহামন্দার মহারোগ: রোগের স্বরূপ ও নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি

আমরা এখন একই সাথে একই সময়ে দুটি মহাবিপর্যয়-দুটি মহারোগে আক্রান্ত, যাকে আমরা মোটামুটি নিরাময়-অযোগ্য 'শরীরে অনেক অঙ্গের বিকলতা' (multiple organ disorder) অথবা 'শরীরে অনেক জটিল রোগের সমাহার'-এর (multiple organ complications) সাথে তুলনা করতে পারি। এ দুই মহারোগের একটি অর্থনৈতিক-সামাজিক, আর অন্যটি প্রাকৃতিক–ভাইরাস-উদ্ভূত–কোভিড-১৯-উদ্ভূত। **অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রথম মহারোগটির নাম *মন্দা-মহামন্দা রোগ***। আর এ মহারোগটির উৎপত্তির কারণ হলো শোষণভিত্তিক-লোভলালসাভিত্তিক–যেকোনো কিছুর বিনিময়ে মুনাফা সর্বোচ্চকরণভিত্তিক-বৈষম্য বৃদ্ধিভিত্তিক—নিরন্তর বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা–পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি। যে অর্থনীতিতে মন্দা-মহামন্দা (crisis, great depression) অনিবার্য, যা ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত "বাণিজ্যচক্রের" (business cycle) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (যা আগে আলোচনা করেছি)। এ রোগ থেকে মুক্তি হবে সাময়িক; তবে চক্রটি যেহেতু ওই ব্যবস্থারই অঙ্গ, সেহেতু চক্র চলতেই থাকবে—এক মন্দা-মহামন্দা থেকে উত্তরণ ঘটবে, অর্থনীতি উপরের দিকে যাবে, কিন্তু একটা সময়ে আবারও মন্দা-মহামন্দা অনিবার্য।

দীর্ঘমেয়াদি ঋণচক্রের (long term debt cycle) হিসেবপত্তর বলে প্রতি ৪৭ বছর পরপর মন্দা রোগ অনিবার্য, আর রোগটি যদি ৪৭ বছরের বেশ পরে ঘটে তাহলে ধরে নিতে হবে যে রোগের জীবাণু অর্থনীতির দেহে ঘণীভূত হচ্ছে, যা পরে মন্দা রোগ থেকে মহামন্দা রোগ হিসেবে আবির্ভূত হতে বাধ্য। এই মন্দা-মহামন্দা রোগ নিরাময়ের কোনো ভ্যাকসিন বা ঔষুধপত্তর নেই। যতদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে, যা ওই রোগের মূল কারণ—ততদিন 'মন্দা-মহামন্দা' নামক রোগটি যাওয়া-আসা করবে। আর অর্থনীতিশাস্ত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাজ হবে মন্দা-মহামন্দা রোগের কার্যকারণ নিরন্তর সন্ধান-অনুসন্ধান করা এবং রোগের প্রকোপ কমানোর জন্য অবস্থা বুঝে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া (সুপারিশ প্রণয়ন করা)। আমাদের শাস্ত্রের এর বাইরে কিছু করার ক্ষমতাও নেই, যুক্তিসংগত কোনো কারণও নেই। তবে একটা কথা স্মরণ রাখলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্মোহ হবে—তা হলো এই মহারোগ যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে (অর্থাৎ পুঁজিবাদে) জন্ম লাভ করে সে ব্যবস্থাটিই কিন্তু নিজেকে ওই মহারোগ থেকে বাঁচানোর জন্য উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনপ্রক্রিয়া উন্নততর (!) করার স্বার্থে উদ্ভাবনমূলক কাজে (innovation promotive) "সৃজনশীল ঝড়ো বিধ্বংসী" প্রণোদনা দেয় (যাকে অর্থনীতিবিদ শুমপিটার বলেছেন "gale of creative destruction")। **দ্বিতীয় মহারোগের নাম *কোভিড-১৯ মহারোগ*।**

কোভিড-১৯ প্রকৃতি-উদ্ভূত মহারোগ। কোভিড-১৯ মহারোগটি শুধু মহামারি আকারে ইতিমধ্যে বিশ্বের ২৩১টি রাষ্ট্র ও অঞ্চলে প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণই হয়নি (প্রক্ষেপণ বলছে এ ভাইরাস আরো অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে (আর সামনে আসছে 'ওমিক্রন' ঢেউ), যা কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য-যোগাযোগ-পরিবহন-অফিস-আদালত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে অর্থনৈতিক মহামন্দাকে গভীরতর ও দীর্ঘতর করে বৈশ্বিক সমাজ ও অর্থনীতিকে বিকল করে ছেড়েছে। কোভিড-১৯ যত দীর্ঘ সময় চলবে, ততই বিকলতর হতে থাকবে প্রথম মহারোগ—-মহামন্দার মহাবিপর্যয়। দ্বিতীয় এ মহারোগ—কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করা যায়নি। তবে নিরাময়যোগ্য ভ্যাকসিন আবিষ্কারসহ ঔষুধপত্তর আবিষ্কার হলে তার প্রয়োগে এ রোগ থেকে হয়তো বা নিস্তার পাওয়া যাবে, আর তা না-হলে হয়তো বা মানুষের শরীরে 'হার্ড ইম্যুনিটি' হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে—আর ততক্ষণে আরো কয়েক লক্ষ (হতে পারে কোটি) মানুষ মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভূত মহারোগ—**মহামন্দা রোগ** আর প্রকৃতিপ্রাপ্ত **মহারোগ কোভিড-১৯**—এই দুইয়ের মহামিলনে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সমাজে যে অভূতপূর্ব মহাদুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উদ্ধারের পথ কী? আমাদের জন্য প্রশ্নটা হলো এ রকম: প্রকৃত অর্থনীতিতে (অর্থাৎ রিয়েল ইকোনমি) যে মহাপতন হয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান তা থেকে উদ্ধার-পুনরুদ্ধারের পথরেখা কেমন হতে পারে? আর আমাদের করণীয়টাই বা কেমন হওয়াটা সম্ভাব্য সর্বশ্রেয় হবে?

বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট গবেষক, নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকসহ সম্ভবত সবাই সবার জায়গা থেকে বিষয়টি নিয়ে এখন নির্ঘুম দিন যাপন করছেন। চলছে সক্রিয় ভাবনা-চিন্তা। এমনকি এ নিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশের সামাজিক-গবেষণা ভাবনাজগৎ ও ল্যাবরেটরিতে চলছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ মুহূর্তে দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাসশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান, অর্থনীতিশাস্ত্র থেকে শুরু করে সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো শাখাই এ নিয়ে নিশ্চুপ নয়, সবাই সমস্যার স্বরূপ ও গভীরতার কার্যকারণ এবং সমাধানের পথরেখা নিয়ে সক্রিয়ভাবেই ভাবছে।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও মন্দা (প্রথম মহারোগ) এবং একই সময়ে একই সাথে পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় (দ্বিতীয় মহারোগ)-এর কার্যকারণ (causal relations),

প্রতিফল-অভিঘাত (consequences-impact) নিয়ে আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ দুই মহারোগ-উদ্ভূত মহাবিপর্যয়কর অবস্থা থেকে উত্তরণসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" নামকরণ দিয়ে একটা সম্ভাব্য সমাধান-পথরেখা বিনির্মাণ করেছি (যা পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

ওপরের কথাগুলো বললাম এ জন্য যে যৌক্তিক কাঠামো বিনির্মাণে আমাদের এখন কোভিড-১৯ মন্দা রোগের ডায়াগনোসিস করে রোগ নিরাময় পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে হবে। আমাদের দেশে কোভিড-১৯-উদ্ভূত বিপন্নতা ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার বিষয়টি দুই দিক থেকে দেখতে হবে:

প্রথম: সমস্যা চিহ্নিতকরণের সমস্যা। অর্থাৎ বহুমাত্রিক যে সমস্যা হয়েছে তার কার্যকারণ কী, কী তার স্বরূপ, কী তার প্রকৃতি, মর্মবস্তুই বা কী? অর্থাৎ রোগের ***ডায়াগনোসিস****।*

দ্বিতীয়: রোগ নিরাময়ের ***ব্যবস্থাপত্র*** *বা* ***প্রেসক্রিপশন*** *দেওয়া, যাতে রোগ সেরে যায়, রুগি সুস্থ হয়ে যান এবং রোগ যেন আবারো মাথাচাড়া না দেয়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিটি (রুগি) যেন তার পরিবার-পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্ত সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন।*

প্রসঙ্গ ডায়াগনোসিস

"কোভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় ও একই সময়ে অর্থনৈতিক-স্থবিরতা-মন্দা-মহামন্দা"—এ মহারোগ নির্ণয় বা ডায়াগনোসিস-এর একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ যে 'অ্যালোপ্যাথি' অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ-প্রচলিত-মূলধারার অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বকথা (এখন যাকে বলে নব্য-উদারবাদী তত্ত্বকথা)—আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি—রোগ নির্ণয় ও নিরাময়-এর অন্যান্য শাস্ত্র যেমন বহু বছর ধরে চলে আসা হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, টোটকা ঔষুধপত্তর, গ্রামদেশের চিকিৎসা পদ্ধতি, এমনকি 'পানিপড়া'—এসবও যথেষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা। সঠিক 'ডায়াগনোসিস'-এর ওপরই রোগ নিরাময়ের প্রায় পুরোটাই নির্ভর করে; আর সঠিক ডায়াগনোসিসই অসুস্থ মানুষের রোগ নিরাময়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে সহায়ক (অবশ্য মুক্তবাজার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সেটা কার্যকর নয়; মানুষের 'স্বাস্থ্য' এখন বিশাল-বিস্তর ব্যবসা; অতি অনৈতিক ব্যবসা, যে ব্যবসার সাথে জড়াজড়ি করে আছে চিকিৎসক, ওষুধ কোম্পানি এবং বীমা কোম্পানিরা; সম্ভবত পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই এখন ওদের অনুগত)। আমরা এসব কথা বলতে চাই এ জন্যই যে মূলধারার-প্রথাসিদ্ধ-অ্যালোপ্যাথিক অর্থনীতির অনেক ব্যর্থতা আছে, যার ভিত্তিতে বিচার করলে রোগের ডায়াগনোসিস ভুল হতে বাধ্য; আর ভুল হলে ওই ভুল-ভ্রান্তি উদ্ভূত প্রেসক্রিপশন রোগ নিরাময় তো করবেই না, উল্টো রুগিকে না মারা পর্যন্ত ছাড়বে না (১৯৫০-৬০-এর দশকে বাংলাদেশে কথায় কথায় এন্টিবায়োটিক—কমবাইটিকস্ ইঞ্জেকশন দিয়ে বহু মানুষকে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট করে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে)। অর্থনীতিতে এ ধরনের সুপ্রমাণিত উদাহরণের কমতি নেই, যা থেকে আমাদের বিবেচনাপ্রসূত সাবধান না হলে আমরাও ভুল-রোগ নির্ণয় বা mis-diagnosis-এর কারণ হবো এবং পরিণাম হবে ভয়াবহ—অধিকতর বিপর্যয়কর। এক্ষেত্রে পরীক্ষিত-ভ্রান্ত এবং অকার্যকর অথচ বাজারে বেশ চলে—এমন কয়েকটি তত্ত্ব অথবা ধারণার কথা উল্লেখ জরুরি; কারণ পুরাতন এসবই আবার নতুন মোড়কে চালু হবে বলে মনে হয়। ভ্রান্ত-অকার্যকর ওইসব তত্ত্বকথাগুলো এ রকম (বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, বারকাত, আবুল ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, পৃ. ১৯৩-১৯৬):

(১) *"অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (উচ্চ হার হলে আরো ভালো) হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিচের দিকে চুঁইয়ে পড়ে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য কমাবে এবং বৈষম্য হ্রাস পাবে (যাকে বলে trickle down theory)"*—এ তত্ত্ব পুরোটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

(২) *"গরিব মানুষ গরিব—কারণ সে অলস, কাজ করে না এবং নির্বুদ্ধিমান; আর ধনীরা ধনী–কারণ তারা কঠোর পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান"*—এসব কথা মহাভুল।

(৩) *"অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার উৎপাদন ত্বরান্বিত করে (সহজ কথায় বাড়ায়), মূল্যস্ফীতি ঘটায় না এবং কম প্রবৃদ্ধি উচ্চ মূল্যস্ফীতি ঘটায় না"*—কোভিড-১৯ এসব তত্ত্বকথা ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছে। সিন্ডিকেটওয়ালারা মূল্য বাড়ানোর সব পথ-পন্থা জানেন—প্রবৃদ্ধির কম-বেশিতে তাদের খুব যায়-আসে না।

(৪) *"মূল্যস্ফীতি (দাম বাড়া) এবং মূল্যসংকোচন (দাম কমা) একই সাথে ঘটে না, একই সাথে চলে না"*—একদমই ভুল।

(৫) *"চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, সরবরাহ বাড়লে দাম কমে"*—এ এক মহাভ্রান্ত তত্ত্ব (যদিও অর্থনীতিশাস্ত্রে সম্ভবত এটাই মূল তত্ত্ব —মূল অ্যালোপ্যাথি)।

(৬) *"অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলে অবশ্যই মূল্যস্ফীতি হবে; কারণ মানুষের হাতে বেশি টাকা এলে মুনাফালোভীরা দাম বাড়িয়ে দেবে মানুষ তেমন টের পাবেন না"*—এ তত্ত্ব ভুল।

(৭) *"টাকা ছাপালে মূল্যস্ফীতি হয় (অর্থাৎ দাম কমে)"*—এ তত্ত্বও ভুল; কারণ ছাপানো টাকা কী কাজে ব্যবহার হয় তার ওপরেই নির্ভর করবে মূল্যসংকোচন হবে না কি মূল্যস্ফীতি হবে (অর্থাৎ দাম কমবে না কি দাম বাড়বে)।

(৮) *"প্রাকৃতিক সম্পদে ডিজ-ইনফ্লেশন হয় না অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য সময়ের সাথে সাথে দ্রুত পতন হয় না"*—এতদিন সেটাই দেখা গেছে। কিন্তু এখন তো জ্বালানি তেলের দাম প্রত্যেক দিনই কমছে।

(৯) *"ঋণ প্রবাহ চালু থাকলে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়"*—এ ধারণাও ভুল।

(১০) *"অর্থনীতির মৌলশক্তির (economic fundamentals) ওপর নির্ভর করে শেয়ারের দাম"*—ভুল তত্ত্ব (বা ধারণা)।

(১১) *"অর্থনীতির মূল ফ্যাক্টর হলো জমি, শ্রম, পুঁজি (land, labour, capital)"*—এ ধারণা-তত্ত্ব যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক, আর তাই ভ্রান্ত।

তাহলে অর্থনৈতিক মহামন্দা (economic crisis) ও কোভিড-১৯ মহামারি-উদ্ভূত একই সময়ে একই সাথে এ দুই রোগের মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার-পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য পথরেখা অনুসন্ধানে আমরা স্পষ্টতই দেখছি যে নতুন মোড়কে পুরাতন তত্ত্বের প্রয়োগ রোগ নির্ণয়ে যথেষ্ট ভ্রান্তির (mis-diagnosis) কারণ হতে পারে। আর ভ্রান্তিমূলক এই ডায়াগনোসিস থেকে রোগ নিরাময়ের যে প্রেসক্রিপশন দেওয়া হবে সেটাও যথেষ্ট ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

কোভিড-১৯-এর ক্ষয়ক্ষতি এবং একই সাথে মহামন্দা থেকে মুক্তির পথরেখা অনুসন্ধানে আমরা ইতিমধ্যে দুই ধাপবিশিষ্ট ভাবনার যৌক্তিকতা বলেছি, যেখানে প্রথম ধাপে থাকবে রোগ নির্ণয়ের মাপকাঠি/ মানদণ্ড

দিয়ে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় (যে ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ১১টি মানদণ্ড সহায়ক না হয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে), আর দ্বিতীয় ধাপে থাকবে নির্ণীত রোগ নিরাময়ের প্রেসক্রিপশন বা পথরেখা।

কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউন এবং একই সাথে অর্থনৈতিক মহামন্দাকে আমরা দেখছি 'প্রকৃত ইকোনমির' (যাকে বলে real economy, যা ম্যাক্রো-মাইক্রো মিস-ম্যাচ সমস্যাকে বিবেচনায় রাখে) সঠিক রোগ-রোগসমূহকে বড় পর্দায়। এবং সে বিচারেই আমরা এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে—দুই মহারোগের সম্মিলন বা মিথস্ক্রিয়ায় কোভিড-১৯ কালে আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে যে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং প্রকোপ বাড়ছে—তার নামকরণ হতে পারে "ইতিহাস অভূতপূর্ব শরীরের বহু অঙ্গে জটিল রোগের সমাহার" (unprecedented in history multiple organ complications)। এ রোগে আমাদের সমাজদেহে প্রধানত যেসব মহারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যা নিরাময় করতে হবে নিরাময়ের ওষুধসহ, তা হলো নিম্নরূপ:

রোগ ১: শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হওয়ার রোগ: লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) সমাজের শ্রেণিকাঠামোটাই পাল্টে গেছে। দরিদ্র-দরিদ্রতর হয়েছে, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ব্যাপকাংশ দরিদ্রের দলে যোগদান করেছে, মধ্যবিত্তদের একাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্তের দলে যোগ দিয়েছে, উচ্চ-মধ্যবিত্তদেরও একাংশ নিচের দিকে নেমেছে। ১৭ কোটি মানুষের দেশে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হয়েছেন, আর মোট ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান নিচের দিকে নেমেছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। শুধু ধনীরা নিচের দিকে নামতে পারেনি। উল্টো, ধনীদের সম্পদ তুলনামূলক বেড়েছে। এ রোগ নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো নিম্নগামী শ্রেণির মানুষকে শ্রেণি মইয়ের উপরে তুলে আনা।

রোগ ২: ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ: এ রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ কোটি। এ রোগ নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো দিনে তিনবার পুষ্টিমানসম্মত খাদ্য গ্রহণ।

রোগ ৩: বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ: সমাজে শ্রেণি বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সবধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বেড়েছে। লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) আয় বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ ০.৪৮২ থেকে বেড়ে ০.৬৩৫-এ এবং পালমা অনুপাত ২.৯২ থেকে বেড়ে ৭.৫৩-এ দাঁড়িয়েছে। পালমা অনুপাত দেখায় যে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের আয় (ধনীদের) সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশের মানুষের আয়ের তুলনায় কতগুণ বেশি। পালমা অনুপাত ৭.৫ বা তার বেশি হলে সে অবস্থাকে আমরা মহাবিপজ্জনক বলি, কিন্তু এসবে অর্থ পাচার-কালোটাকা যোগ করলে পালমা অনুপাত ১৫-২০ বা তার বেশিও হতে পারে। আসলে পালমা অনুপাত ১৫-২০ এর কম হবে না। এবং তা ক্রমবর্ধমান। এ এক মহা-মহাবিপজ্জনক অবস্থা। এহেন মহাবিপজ্জনক অবস্থা শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা আরো বেশি বিপজ্জনক; কারণ সেখানে বিগত ৪০ বছর ধরে দেশের ১ শতাংশ ধনী মানুষ দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশের মালিক বনে গেছেন। মহাবিপজ্জনক এই রোগের একমাত্র ওষুধ হলো যত দ্রুত সম্ভব সবধরনের বৈষম্য কমিয়ে আনা, সেক্ষেত্রে আয় বৈষম্য কমানোর ডোজ অনেক বেশি দিতে হবে এবং তা 'বৈষম বৃদ্ধির রোগ' যতদিন পুরোপুরি না সারছে, ততদিন নিয়মিত চলবে।

আয় বৈষম্য-উদ্ভূত এ রোগটি নিয়ে খুব একটা ডায়াগনোসিস করা হয় না। এই রোগ নির্ণয়ের বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে হয় যথেষ্ট উদাসীন, নয়তো সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন। যেহেতু এ রোগ হলো উৎস

রোগ—অন্য বহু রোগ সৃষ্টির কারণ (যেমন স্বাস্থ্য রোগ, শিক্ষা রোগ, আবাসন রোগ, নিরাপত্তাহীনতা রোগ, সামাজিক হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার রোগ, মন ছোট করে থাকার রোগ, অবসন্নতা রোগ ইত্যাদি); সেহেতু এ রোগের ডায়াগনোসিস নিয়ে হেলাফেলা করা যাবে না, সম্ভাব্য গভীরে যেতে হবে। এ রোগের MRI (magnetic resonance imaging) করে দেখা গেছে—রোগটির বাহ্যিক বিষয়াদি দেখেই এ রোগের বিশেষজ্ঞরা রোগ নিরাময়ের প্রেসক্রিপশন দিয়ে দেন। তারা 'আয় বৈষম্য' রোগটির কারণতাত্ত্বিক (etiology) বিশ্লেষণে যান না। ঢোকেন না তারা রোগের মলিক্যুলার লেভেলে। মলিক্যুলার লেভেলে এ রোগের প্রধান প্রশ্ন—'আয়' কে সৃষ্টি করে? আর 'সৃষ্ট আয়' কে ভোগ করে? কেন ও কীভাবে তা করে? সহজ আয় সৃষ্টি ও তা ছড়িয়ে যাওয়ার ক্রমধারাটি এ রকম: উৎপাদন (production)→ বণ্টন (distribution) → পুনর্বণ্টন (redistribution) → ভোগ (consumption)। অর্থাৎ 'আয়' সৃষ্টির পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয় উৎপাদন দিয়ে। আর গভীরের মূল কথা হলো আয় সৃষ্টি হয় উৎপাদনে এবং শুধু উৎপাদনেই; আর ক্রমধারাতে অন্যান্য পর্যায়ে উৎপাদনসৃষ্ট আয় ছড়িয়ে যায়মাত্র।

উৎপাদিত দ্রব্য-সেবা বণ্টন ও পুনর্বণ্টন হবে, এর পরে হবে ভোগ (consumption)—হতে পারে তা খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় ভোগ (ব্যক্তিগত ভোগ), হতে পারে তা 'উৎপাদনশীল ভোগ' (অর্থাৎ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ)। বণ্টন ও পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার এজেন্টরা উৎপাদক নন; তারা নিজেরা কোনো 'আয়' সৃষ্টি করেন না, তারা 'উৎপাদন'সৃষ্ট আয় ভোগ করেন। যেমন সরকার কোনো আয় করে না, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো আয় করে না, রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ—নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ কোনো আয় করে না, দেশরক্ষা বিভাগ কোনো আয় করে না। 'আয়' অর্থাৎ 'নবসৃষ্ট মূল্য' (newly created value) সৃষ্টি করেন তারা, যারা সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত অর্থাৎ উৎপাদনে বিনিয়োজিত 'শ্রমশক্তি'—বিনিময়ে তারা পান 'মজুরি' (wage)।

'নবসৃষ্ট' মূল্য হিসেবে আয় সৃষ্টি করেন কৃষিকাজের কৃষক, মৎস্য চাষি, হাঁস-মুরগি-গবাদিপশু পালনকারী খামারি, কলকারখানার শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি। কিন্তু নবসৃষ্ট আয়ের অতিনগণ্য অংশ তারা পেয়ে থাকেন—মজুরি হিসেবে (যা নবসৃষ্ট মূল্যের ৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে)। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদ জমির মালিক বলেন ফসল কে ফলাল না ফলাল তাতে আমার কিছুই আসে-যায় না—আমি মালিক, আমার অংশ কই? উৎপাদনকারী 'নবসৃষ্ট মূল'—উৎপাদিত ফসল থেকে জমির মালিকের অংশ পরিশোধ করেন 'ভূমি খাজনা' দিয়ে (land rent)। পুঁজির মালিক পুঁজিপতি বলেন আমার বিনিয়োজিত পুঁজির ভাগ কোথায়? উৎপাদনকারী 'নবসৃষ্ট মূল্য' থেকে পুঁজিপতিকে 'মুনাফা' (profit) দিয়ে দেন (আসলে দেন না, ওরা কেটে নেন; শুধু কেটেই নেন না—'সর্বোচ্চ মুনাফা' পাওয়ার জন্য যা করার সবই করেন, এমনকি লাগলে 'সরকার পাল্টে দেন')। ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ যারা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করেন, তারা বলেন আমার ভাগটা কোথায়? আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে উৎপাদন বাজারজাত করে এত কষ্ট করে ওই দ্রব্য-সেবা তারা আমাদের হাতে পৌঁছে দেন—তাদের হিস্যা তো থাকতেই হবে। ঠিক। তবে তাদের হিস্যাটাও নির্ধারিত হয়ে যায় উৎপাদনে—সঞ্চালনে (circulation) নয়, আবার সঞ্চালনের বাইরে গিয়ে উৎপাদনের নবসৃষ্ট মূল্য দেখাও যায় না। ব্যবসায়ীরা তাদের ভাগটাও পেয়ে যান ওই "নবসৃষ্ট মূল্যের" ভেতর থেকে (সঞ্চালন থেকে নয়, কারণ সঞ্চালনে কোনো "নতুন মূল্য" সৃষ্টি হয় না; শুধু উৎপাদনে সৃষ্ট নবমূল্যের রূপ পরিবর্তিত হয়—যেমন দ্রব্য রূপ থেকে অর্থ রূপ। আর সরকার থেকে শুরু করে অন্যরা এই 'নবসৃষ্ট মূল্যের' (যা শুধু উৎপাদনেই সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টি করেন "উৎপাদনশীল শ্রম বিনিয়োগকারী মানুষ"—যাদের আমরা শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষ বলি; যারাই

সমাজে সবচেয়ে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষ) ওপর ভাগ বসান; যত বেশি ভাগ বসানো সম্ভব এবং তার জন্য হেন অনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই যা তারা করেন না। কোভিড-১৯ মহামারিতে মরল কি বাঁচল, অর্থনৈতিক মহামন্দায় দেশ গোল্লায় গেল কি গেল না—এসবে তাদের কিছু এসে-যায় না। তবে এসে-যায় যদি "নবসৃষ্ট মূল্যে" ভাগ বসানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে অসুবিধা হয়। তাহলে বাহাদুরি দেখান তারা, যারা কোনো অর্থেই সরাসরি উৎপাদক নন—কিন্তু রাজত্ব করেন তারা, রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তারা, সরকার চালান তারা, দেশরক্ষার নামে সমরাস্ত্র বেচা-কেনা করেন তারা, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করেন তারা, যুদ্ধ করেন তারা, বাণিজ্যযুদ্ধ করেন তারা। শুধু একটা কাজ বাদ দিয়ে তারাই সবকিছু করেন। সে কাজটা হলো—"সরাসরি উৎপাদক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা"; এটা না পারাটাই তাদের অস্তিত্বের একমাত্র শর্ত। তবে কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক মহামন্দার যুগে 'আয়' বা 'নবসৃষ্ট মূল্য'সংশ্লিষ্ট এ বিষয়াদির 'কারণতত্ত্ব' (etiology) নিয়ে এসব পরজীবীর নতুন করে ভাবতে হবে। এ এক মহাবিপজ্জনক রোগ, যে রোগের নিগূঢ় কারণ রহস্যটা আমরা এতক্ষণ যেমন বললাম তেমনই।

রোগ ৪: মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক-আতঙ্ক-বিষণ্নতা রোগ: ১৭ কোটি মানুষের বলতে গেলে প্রায় সবাই মানসিক বিপর্যয়ের শিকার—আতঙ্কিত, বিষণ্ন, বিপদাপন্ন, অসহায়। তবে যে মানুষ শ্রেণি মইয়ের যত নিচে, সে মানুষের মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক বিপদবোধ-আতঙ্কবোধ-বিষণ্নতাবোধ-অসহায়ত্ব তুলনামূলক তত বেশি। এ রোগ নিরাময়ের সহজ কোনো একক ওষুধ নেই। তবে প্রথম তিন রোগের ওষুধ ঠিকমতো সেবন করলে এ রোগটি বহুদূর প্রশমিত হবে। আর এ রোগ প্রশমনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক বৈষম্য নিরাময়মূলক ঔষধপত্তর খুব ভালো কাজ করবে।

রোগ ৫: মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ: নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা, প্রবীণ মানুষের অসহায়ত্ব—এসব বেড়েছে। হয়তো বা মহামারিতে এসব বাড়ে। বাড়ে দুর্ভিক্ষ। তবে আমাদের ধারণা কোভিড-১৯ মহামারির সাথে সাথে একই সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এ রোগের তীব্রতা বেড়েছে। এ রোগের ক্ষতিমাত্রাও যারা শ্রেণি মইয়ের যত নিচে তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অন্যদের চেয়ে বেশি। এ রোগের অন্যতম ওষুধ হলো মানুষে-মানুষে সংহতিবোধ বাড়ানো। আর মানুষে-মানুষে সংহতিবোধ বাড়াতে যে ওষুধের বেশি ডোজ যথেষ্ট কার্যকর হবে তা হলো "সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক স্থানীয় উদ্যোগ বৃদ্ধির" মাধ্যমে "কম্যুনিটি সলিডারিটি" স্থায়ীত্বশীল করা (তবে কোনোভাবেই বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নয় এবং খুবই ভালো হবে যদি সরকারি দান-অনুদান গ্রহণ না করা হয়—এসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রবল)।

রোগ ৬: মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ: নৈতিক, মানসিক সামাজিক, অর্থনৈতিক—যেকোনো বিচারেই মানুষের অনিচ্ছা-কর্মহীনতা অথবা অনিচ্ছা-বেকারত্ব এক বড় মাপের দীর্ঘস্থায়ী অতিযন্ত্রণাদায়ক রোগ (chronic painful disease)। এ রোগ বহু কারণেই অতিপীড়াদায়ক দীর্ঘস্থায়ী রোগ। *"যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার অধিকার"* বাংলাদেশের সংবিধানে "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"তে প্রতিশ্রুত অন্যতম নাগরিক অধিকার [সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (খ)]। কর্মহীনতা ও বেকারত্ব সাধারণ কোনো রোগ নয়—এ এক অভিশপ্ত রোগ। আর সামাজিকভাবে তা মানুষকে খাটো করে, করে মর্যাদাহীন। বেকার মানুষ মানেই পরিবারের বোঝা যা প্রতিনিয়ত তার মধ্যে অসহায়ত্ববোধ, বিপন্নতাবোধ ও অবসাদবোধ বাড়ায়। আত্মসম্মানবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষমাত্রেই তার দক্ষতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কাজ চায়। যে সমাজ-অর্থনীতি তরুণ-তরুণী/যুবক-যুবতীদের বেকার রাখে, সে সমাজ সরাসরি মানুষের উৎপাদন-সৃজন সক্ষমতা প্রস্ফুটনবিরুদ্ধ; সে সমাজ বিকশিত

হতে পারে না। যে অর্থনীতি কর্মসক্ষম মানুষকে বেকার থাকতে বাধ্য করে তা মানবিক সমাজও নয়, স্থায়িত্বশীলও নয়। কোভিড-১৯-এর লকডাউনের প্রথম ৬৬ দিনেই (২৬ মার্চ-৩১ মে ২০২০) আমাদের দেশে আনুমানিক ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বেকার হয়েছেন (লকডাউনের আগে সক্রিয় শ্রমশক্তি/ কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৮২ লক্ষ)। এই "হারিয়ে যাওয়া কাজ" (lost employment) হলো জাতীয় সম্পদের বিশাল অপচয়। এই ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বেকার হওয়ার ফলে অপূরণীয় সামাজিক ক্ষতি হয়েছে। স্থবির হয়ে গেছে প্রায় ১০-১১ কোটি মানুষের পারিবারিক আয়-ব্যয়, নারী-পুরুষ-শিশু-প্রবীণ-তরুণ-তরুণীনির্বিশেষে ১০ কোটি মানুষ এখন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত, সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভিক্ষাবস্থা; আর মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কমেছে (প্রত্যাশিত জিডিপির তুলনায়) ৬৫ শতাংশ। এসবের মধ্যেও অর্থশাস্ত্রীকদের অনেকেই এখনও তোতাপাখির মতো তত্ত্ব আওড়াচ্ছেন—দেশে ৫-১০ শতাংশ বেকারত্ব থাকা ভালো (অবশ্য যারা এসব বলছেন তাদের কেউই বেকার নন)। সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা। বেকারত্ব রোগটি এক অতিযন্ত্রণাদায়ক রোগ এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে, কারণ বলা হচ্ছে কোভিড-১৯ আর পাশাপাশি অর্থনীতির মন্দা যাদের বেকার করেছে তাদের বড় অংশই নিকট-ভবিষ্যতে আর কাজ ফেরত পাবেন না। অর্থাৎ সম্ভবত কয়েক কোটি মানুষ বেকার-আধাবেকার-ছদ্মবেকার থাকতে বাধ্য হবেন। এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী কর্মহীনতা, অথবা স্বল্প আয়ে কিছু মানুষের কিছুটা কর্মসংস্থান—এসবই একদিকে অর্থনীতিকে পিছিয়ে দেবে আর, অন্যদিকে তা ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতার কারণ হবে। কর্মহীনতা ও বেকারত্ব-উদ্ভূত এ রোগ নিরাময় করতে হবে, যত দ্রুত ততই সবার জন্য মঙ্গল। কর্মহীনতা-কর্মসংস্থানহীনতা রোগ নিরাময়ের একমাত্র ওষুধ হলো মানুষের জন্য ব্যাপক কর্মসুযোগ সৃষ্টি করতে হবে—যা অবশ্যই সম্ভব। আর একই সাথে প্রয়োগ করতে হবে সেসব ঔষধপত্তর, যা দিয়ে "বৈষম্য হ্রাসমূলক তুলনামূলক উচ্চ প্রবৃদ্ধি" অর্জন সম্ভব হয়।

আমরা এতক্ষণ কোভিড-১৯-এর লকডাউন-উদ্ভূত মহারোগ ও অর্থনৈতিক মন্দাসংশ্লিষ্ট মহারোগের সমস্যা চিহ্নিত করার ডায়াগনোসিস করলাম। কোভিড-১৯ মহারোগ ও অর্থনৈতিক মন্দা-মহারোগের যৌথ ক্রিয়ায় যে মহা-মহারোগ হয়েছে, যাকে আমরা বলেছি প্রায় নিরাময় অযোগ্য multiple organ complications। এখন আমরা এ *মহা-মহারোগের সম্ভাব্য চিকিৎসা* নিয়ে কিছু কথা বলব।

এ ধরনের মহা-মহারোগ হলে মানুষ কী করে? ধরুন কোনো একজন ব্যক্তির একই সাথে ক্যানসার হয়েছে, যা মোটামুটি রোগের শেষপর্যায়ে এবং হয়েছে কিডনির সমস্যা যেটাও এমন পর্যায়ে যে কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় নেই। দুর্ভাগা এই রুগি-ব্যক্তিটি কী করবেন? সবাই এককথায় বলবেন চিকিৎসা করতে হবে। এ হলো একই সাথে দুই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত (তাও রোগের শেষপর্যায়ে) রুগি-মানুষটির জন্য এ প্রেসক্রিপশন বা পরামর্শ দেবেন দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-স্বাক্ষর-নিরক্ষর চিকিৎসক-অচিকিৎসকনির্বিশেষে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ। কিন্তু একই সাথে দুই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিটি যদি গ্রামের দরিদ্র কৃষক অথবা শহরের বস্তিবাসী অথবা স্বল্প-আয়ী মানুষ হন, তাহলে কী হবে পরামর্শ? কী প্রেসক্রিপশন দেবেন? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাক্তার যিনি, তিনিই বা কি প্রেসক্রিপশন দেবেন? আর রুগিটি যদি নিম্ন-মধ্যবিত্ত হন? যদি হন তিনি মধ্য-মধ্যবিত্ত? যদি উচ্চ-মধ্যবিত্ত? যদি ধনী? তবে ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত (সম্ভব, তাও উপরের তলার উচ্চ-মধ্যবিত্ত) হলে দেশে-বিদেশে ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয় হয়তো বা জোগাড় করে কষ্ট করতে পারবেন। রুগি বাঁচবে কি না গ্যারান্টি নেই, তবে হয়তো বা মানসিক শান্তি পেলেও পেতে পারেন। কোভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক মহামন্দার যোগফলে আমাদের সমাজ-অর্থনীতিস্বাস্থ্যে

একই ঘটনা ঘটছে। তবে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ব্যক্তি আর সমাজ এক কথা নয়। কিন্তু সমাজ যদি সমাজের নিচতলার ব্যক্তিদের প্রতি উদাসীন হয়, তখন সমাজের কাছে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত বিপদাপন্ন ব্যক্তির কিছুই চাওয়ার থাকে না। ব্যক্তিটি হয়ে পড়েন অসহায়, অতি অসহায়; আর চিকিৎসার কয়েক দিনের মধ্যেই বাধ্য হন সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হতে। ফলে তার জীবনের কঠোর শ্রমে অর্জিত বহু বছরের পুঞ্জীভূত অর্থ-সম্পদ নিমেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। তার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা (সন্তান-সন্ততি) হয়ে পড়েন অসহায়; দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে দু হাত তুলে আল্লাহ-ভগবান-ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া অন্য কিছু করার থাকে না—তার ও তার প্রিয়জনদের। একটু ভাবুন—কোভিড-১৯ এর লকডাউনে যে ক্ষতি-মহাক্ষতি হয়েছে আর একই সাথে অর্থনীতিতে যে মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে, তা কি একই সাথে দুই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিটির তুলনায় অন্য কিছু, ভিন্ন ধরনের কোনো কিছু কি?

কোভিড-১৯-এর লকডাউন আর একই সাথে অর্থনীতিতে মন্দার (মহামন্দার) যৌথ ক্রিয়ায় আমাদের সমাজ-অর্থনীতিস্বাস্থ্যে *ছয়টি মহারোগ* হয়েছে (যা আগেই বলেছি); আর এসব মহারোগ নিরাময়ে অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত ধারার চিকিৎসকেরা (যারা নিজেদের বড় অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মনে করেন) যে ১১টি তত্ত্বসংবলিত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন সে কথাও বলেছি। এখন যৌক্তিক প্রশ্ন—তাহলে কী দাঁড়াল? সমস্যা কোথায়? রোগ তো নির্ণীত হয়েছে (অর্থাৎ ডায়াগনোসিস) আর অতসব চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একটা না একটা তো বেছে নিতেই হবে। সমস্যাটা এখানেই। কোন চিকিৎসকের কাছে যাবেন, কোন চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেবেন, মরণব্যাধি নিরাময়ে তিনি কোন পদ্ধতি বাতলে দেবেন—এসবের কেনোটিতেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে রুগির কোনোই হাত নেই। আর সে কারণেই আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি (যাকে পরবর্তীতে আমরা বলছি "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" উত্থাপনের আগে সমস্যা সুচিহ্নিত করে সম্ভাব্য নিরাময় পদ্ধতির সব বলা দরকার। কারণ রোগাক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তির সেটা জানার অধিকার রয়েছে, আর ডাক্তারের (তিনি যতই ব্যস্ত হোন না কেন) দায়িত্ব হলো সবকিছু খুলে বলা, যত সংক্ষেপেই হোক না কেন; মূল কথা সবধরনের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ খুলে বলা জরুরি। তা বলতে হয় এ জন্যও যে রুগিরও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে—যিনি সবকিছু জেনে-বুঝে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার জন্য শ্রেয় বিকল্পটি বেছে নেবেন।

আমরা ইতিমধ্যে যে ছয়টি রোগের কথা বলেছি সমগ্র বিশ্বই এখন ওই ছয় রোগে আক্রান্ত। রোগের প্রতিফলনও মোটামুটি একইরকম। তবে বলতে লজ্জা নেই যে রুগি হিসেবে আমরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির রুগি (তবে আমাদের মধ্যেও আবার একটা শ্রেণিভেদ আছে, যা ধনী দেশগুলোতেও সম্ভবত সমভাবে আছে—পার্থক্য শুধু ওদের দরিদ্ররা ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে 'নিজের' মোটরগাড়ি চালান, আর আমাদের দরিদ্ররা ব্যাংক ঋণ পান না (পেলেও অতি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে চাষবাস করে কোনোমতে জীবন চালান)। তাহলে একই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি-প্রক্রিয়া (যাকে বলে প্রটোকল) ওদের আর আমাদের এক হবে না। তবে আমাদের মনে হয়, ওই ছয় রোগ যেহেতু মানুষেরই হয়েছে আর ওরা-আমরা উভয়েই মানুষ, সেহেতু নীতিগতভাবে চিকিৎসায় তেমন ফারাক থাকবার কথা নয়।

রোগ যেটা হয়েছে তার নাম *"কোভিড-১৯ মন্দারোগ"*। রোগটা এক কথায় এ রকম: *২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই ছিল, তবে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ছিল। ২০২০ সালের আনুমানিক ২৬ মার্চে যখন কোভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয়ে লকডাউন শুরু হলো, তখন থেকে যোগাযোগ-পরিবহন-কলকারখানা-ব্যবসাবাণিজ্য-নির্মাণকাজ-হোটেল-রেস্তোরাঁ-দোকানপাট-*

অফিস-আদালত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কারণে সমাজ-অর্থনীতির শরীরে মহারোগ শুরু হলো। অতি স্বল্পসময়ে—কিছু বুঝে ওঠার আগেই—মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যেই (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০-এর মধ্যে) রুগির অবস্থা এতই খারাপ হলো যে সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম চিকিৎসা দিয়েও রুগির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। চিকিৎসক হিসেবে আমরা রুগিকে লকডাউনের আগের স্বাস্থ্যাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাই। আর একই সাথে চাই যে বৈষম্য যেন একটু কমে—কারণ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এতই বেশি যে মূল রোগ আপাতত প্রশমিত হলেও ব্যথা-যন্ত্রণা কমে না।

তাহলে বিষয়টা এ রকম: আমরা কোভিড-১৯-এর পূর্বাবস্থায় ফিরতে চাই এবং একই সাথে বৈষম্যজনিত কারণে যে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় সেটাও কিছুটা কমাতে চাই। তাহলে আমরা চাইছি 'কোভিড-১৯ মন্দারোগ' থেকে মুক্তি এবং ব্যথা-যন্ত্রণার কারণ হিসেবে সমাজশরীরে যে বৈষম্যের খানাখন্দ আছে তাও কিছুটা প্রশমিত করতে। চিকিৎসক বলবেন—ভাই এ এক মহারোগ, যা অতীতে কারো হয়নি; সুতরাং এ রোগ থেকে মুক্তির কোনো পথ আমার জানা নেই, মাফ করবেন। অথবা বলবেন, দেখি না চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না—বিকল্প তো কিছু থাকতেও পারে। আমাদের কথাও চিকিৎসকদের মতোই। "কোভিড-১৯ মন্দারোগ"-এর চিকিৎসা আছে এবং নেই। প্রশ্নটা হলো—আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন, কোন পথে যাবেন; মহারোগের চিকিৎসা-ব্যয়ও কম হবে না, আপনি কোন ব্যয়টা করবেন (করতে পারবেন) আর কোন ব্যয়টা করবেন না (করতে পারবেন না), অথবা কোন ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও আপনার ইচ্ছে নেই অথবা আপনার আত্মীয়স্বজনেরা (স্বার্থ গোষ্ঠী) রাজি নন। "কোভিড-১৯ মন্দারোগের" চিকিৎসায় এসব বিবেচনা-সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আগেই বলেছি *"কোভিড-১৯ মন্দারোগ"* নিরাময়ে ৬টি জটিল রোগের চিকিৎসা হতে হবে। রোগ ছয়টি হলো: (১) শ্রেণিকাঠামো অবনতি-নিম্নগামী উদ্ভূত রোগ, (২) ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত উদ্ভূত রোগ, (৩) বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ, (৪) মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, আতঙ্ক, বিষণ্নতা রোগ, (৫) মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ, (৬) মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ। রুগি হলো সমাজ আর চিকিৎসক হলেন রাষ্ট্র-সরকার।

প্রসঙ্গ: চিকিৎসা নিরাময়পত্র (প্রেসক্রিপশন)

জটিল রোগ 'কোভিড-১৯ মন্দারোগ'-এর চিকিৎসা হতে পারে যেকোনো তিন ধরনের মধ্যে একটি। আর চিকিৎসার ধরনের ওপর নির্ভর করবে রোগ নিরাময়মাত্রা। রোগ নিরাময় ফলসহ এই তিনটি চিকিৎসা পদ্ধতি লেখচিত্র ১-এ সচিত্র দেখানো হয়েছে। চিকিৎসা পদ্ধতি তিনটি নিম্নরূপ:

(১) "কোনো চিকিৎসা নেই", যাকে আমরা বলছি "L-পদ্ধতি",

(২) "মাঝারি চিকিৎসা", যাকে আমরা বলছি "U-পদ্ধতি", এবং

(৩) "V-পদ্ধতি", যাকে আমরা বলছি "খুব ভালো চিকিৎসা"।

বলে রাখা জরুরি যে, "কোভিড-১৯ মন্দারোগ" হলো উল্লিখিত ছয়টি জটিল রোগ বা মরণব্যাধির চিকিৎসা, আর বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করবেন সরকার। আর সেটা অবশ্যই হতে হবে "সংবিধানের প্রাধান্য মেনে চলে—'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'।" 'কোভিড-১৯ মন্দারোগ' চিকিৎসার আপাতত নিম্নতম লক্ষ্য হওয়া উচিত যে উল্লিখিত ছয়টি রোগের অবস্থা

কোভিড-১৯ আগমনের ঠিক পূর্বের অবস্থায় (অথবা ওই সময়ের প্রবণতার দিকে) ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ বলা যায় (ধরুন) ২০২০-এর ফেব্রুয়ারি মাসের অবস্থায় নিয়ে আসা (লেখচিত্র ১ দেখুন)। দেশ-সমাজ-অর্থনীতি নিম্নমাত্রায় কাম্য-কাঙ্ক্ষিত এ অবস্থায় ফিরবে কি ফিরবে না তা নির্ভর করছে আমরা রোগ নিরাময়ের তিন পদ্ধতির কোনটি গ্রহণ করব তার ওপর। নিরাময় ফলসহ তিন চিকিৎসা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

"L-পদ্ধতি" অর্থাৎ 'চিকিৎসা নেই' এবং রুগির মৃত্যুঝুঁকি অনিবার্য (লেখচিত্র ১ ক): আসলে এটা কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, আবার পদ্ধতিও। কারণ, এ পদ্ধতির চিকিৎসায় মনে করা হয় মরণব্যাধিটা এমনই যে এর চিকিৎসা করে কোনো লাভ নেই অথবা এমনও হতে পারে যে চিকিৎসা এত বেশি ব্যয়বহুল যে মরণব্যাধি জেনেও রুগির চিকিৎসা করার সামর্থ্য থাকে না অথবা স্বজনেরা চিকিৎসার দিকে পা বাড়ান না। যদি ছয়টি মরণব্যাধির কোনোটিতেই তেমন হাত না দেওয়া হয়, তাহলে যা ঘটবে তা হলো—কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের ফলে ছয়টি রোগ যে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা থেকে কখনো আর উন্নতি হবে না। অর্থাৎ রুগির মৃত্যু অনিবার্য। 'L' চেহারার এ ঘটনাটা অর্থাৎ রুগির মৃত্যু অনিবার্য হবে, যখন রোগ নিরাময়-উদ্দিষ্ট উল্লিখিত 'প্রয়োজনীয় শর্তের' তিন উপাদান বা ফ্যাক্টর অনুপস্থিত। এ হবে প্রজাতন্ত্রের মালিকের প্রতি "সাংবিধানিক সেবক" রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের চরম ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশমাত্র।

"U-পদ্ধতি"র চিকিৎসা হলো "মাঝারি চিকিৎসা" পদ্ধতি, যে পদ্ধতির চিকিৎসায় রুগি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন না; তবে কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন (লেখচিত্র ১ খ): এ পদ্ধতির চিকিৎসায় ছয়টি মরণব্যাধির কোনো কোনোটির চিকিৎসা হবে, যা রুগির স্বস্তিবোধ বাড়াবে এবং জীবনযাত্রাকে কিছুটা উন্নততর করবে। যেমন এ পদ্ধতিতে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে (অর্থাৎ ২ নম্বর রোগের চিকিৎসা), বেকারত্ব দূর করার জন্য কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হতে পারে (অর্থাৎ ৬ নম্বর রোগের চিকিৎসা), স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহকে সংগঠিত করে মানুষে মানুষে সহিংসতা কিছুটা কমানো যেতে পারে (অর্থাৎ ৫ নম্বর রোগের চিকিৎসা), সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডসহ শিক্ষা, জনশৃঙ্খলা, আইনি সহায়তাসহ (যেসবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ থাকে) যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সংহতিবোধ বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা যেতে পারে (অর্থাৎ ৪ নম্বর জটিলতর রোগের চিকিৎসা)। U-পদ্ধতির চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–এ পদ্ধতিতে ছয় রোগের রোগ নির্ণয় ও প্রশমনের জন্য উল্লিখিত 'প্রয়োজনীয় শর্তের' তিনটি উপাদানের কিছু কিছু জোগান থাকবে, জোগান অব্যাহত থাকবে না এবং 'আবশ্যিক শর্ত' অনুপস্থিত থাকবে। এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির ফল হবে, মাঝারি। অর্থাৎ লকডাউনের দুই মাস পরে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ধীরে ধীরে অবস্থা উন্নততর হবে, কিন্তু সমাজ-অর্থনীতি কোভিড-১৯-এর পূর্বাবস্থায় ফিরবে না। অর্থাৎ কোভিড-১৯-পূর্ব প্রবণতা রেখার সাথে বাস্তব অবস্থার (অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থার) একটা ফারাক থেকেই যাবে (লেখচিত্র ১ খ দেখুন)। পরবর্তী কোনো সময়ে এই ফাঁক/ ফারাক দূর করার কথা ভাবতেই হবে, নইলে সমাজদেহ আবারও অসুস্থ হতে বাধ্য। তবে ঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা না করার ফলে পরবর্তীকালে আগের রোগ আরো তীব্রতার সাথে আবির্ভূত হবে (সমাজদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে এটা হতে বাধ্য)।

লেখচিত্র ১: "কোভিড-১৯ মন্দারোগ": চিকিৎসার বিকল্প পদ্ধতিসমূহ

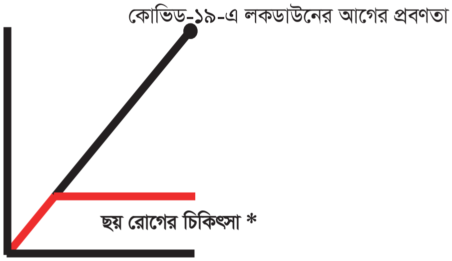

১ ক কোনো চিকিৎসা নেই L (পদ্ধতি)

* ৬ রোগ = শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হওয়ার রোগ (রোগ ১), ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ (রোগ ২), বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (রোগ ৩), মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক-বিষণ্ণতা রোগ (রোগ ৪), মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ (রোগ ৫), মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ (রোগ ৬)

১ খ মাঝারি চিকিৎসা U (পদ্ধতি)

* ছয় রোগ = শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হবার রোগ (রোগ ১), ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ (রোগ ২), বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (রোগ ৩), মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক-বিষণ্ণতা রোগ (রোগ ৪), মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ (রোগ ৫), মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ (রোগ ৬)

১ গ খুব ভালো চিকিৎসা V (পদ্ধতি)

* ৬ রোগ = শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামী হওয়ার রোগ (রোগ ১), ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকার রোগ (রোগ ২), বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (রোগ ৩), মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক আতঙ্ক-বিষণ্ণতা রোগ (রোগ ৪), মানুষের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি রোগ (রোগ ৫), মানুষের মৌলিক অধিকার হরণকারী কর্মহীনতা ও বেকারত্বের রোগ (রোগ ৬)

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ২০৫।

'V-পদ্ধতি' হলো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, বলা যায় 'Victory-পদ্ধতি' (লেখচিত্র ১ গ দেখুন)। এ পদ্ধতি প্রয়োগে "কোভিড-১৯ মহামন্দা রোগ" পুরো মাত্রায় প্রশমন সম্ভব। এ পদ্ধতিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে ছয়টি জটিল ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিদ্যমান কাঠামোতে 'V-পদ্ধতি'র চিকিৎসা অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় (অর্থাৎ L ও U পদ্ধতির তুলনায়) অনেক বেশি ফলপ্রদ এবং বলা যায় রোগ নিরাময়ের 'শ্রেষ্ঠ সমাধান'। কারণ এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন রোগ নির্ণয় ও উপশমের "প্রয়োজনীয় তিন শর্ত" প্রয়োগ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি 'আবশ্যিক শর্তটিও' প্রতিপালনের চেষ্টা থাকে। তবে সাধারণ চিকিৎসায় এ পদ্ধতিতে জটিল দুটি রোগ নিরাময় প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ ওই রোগ দুটি সমাজকাঠামোর রোগ, অর্থাৎ সমাজকাঠামো না বদলালে ওই রোগ দুটি নিরাময় সম্ভব নয় (অথবা খুবই নগণ্যমাত্রায় নিরাময় হলেও হতে পারে)। এই রোগ দুটি হলো শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামিতা-উদ্ভূত রোগ (প্রথম রোগ) এবং বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ (৩ নম্বর রোগ)। সমাজকাঠামো না পাল্টে, পুঁজিবাদী মুক্তবাজার জিইয়ে রেখে, নব্য-উদারবাদী মতাদর্শ তোষণ করে, ধনী সম্পদশালীদের সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন না করে, দরিদ্র মানুষকে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে শোভন কাজ না দিয়ে, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার না করে, ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকদের সমবায় গঠন না করে, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না করে, অধিক হারে সম্পদ কর না বসিয়ে, অর্থ পাচার ও কালোটাকা উদ্ধার করে তা দরিদ্র মানুষের জীবন-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যয় না করে, সরকারি খাতে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত না করে, সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুযোগের সমতা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত না করে, স্থানীয় সরকারের হাতে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা না দিয়ে—শ্রেণিকাঠামোর অবনতি-নিম্নগামিতা উদ্ভূত রোগ এবং বৈষম্য বৃদ্ধির রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়।

রোগ নিরাময়ের তিন পদ্ধতি—অর্থাৎ L-পদ্ধতি, U-পদ্ধতি ও V-পদ্ধতির কোনটি কী মাত্রায় কাজ করবে তা মূলত যেসব উপাদানের (বা ফ্যাক্টর) ওপর নির্ভর করবে, তা হলো: (১) সুযোগ্য দক্ষ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাহেব আছেন কি না (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে শ্রমশক্তি বা labour force), (২) রোগ নির্ণয় ও রোগ প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি-মেশিনপত্র, যথেষ্ট সুসজ্জিত বেড, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ যথেষ্ট কার্যকর ওষুধপত্র আছে কি না (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে 'মূলধন' অর্থাৎ 'পুঁজি' বা capital অর্থাৎ বলতে পারেন অর্থ বা টাকার জোগান), (৩) যদি চাহিদা অনুযায়ী ১ ও ২-এর সরবরাহ ব্যাহত হয়, সেক্ষেত্রে সরবরাহ লাইন চালু থাকার ব্যবস্থা আছে কি না (অর্থনীতির ভাষায় বলতে পারেন 'ঋণ' বা 'ক্রেডিট লাইন' অব্যাহত থাকা)। এই ৩টি ফ্যাক্টর বা উপাদানের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতিই হলো ৬ রুগির রোগ নিরাময়ের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত (primary necessary precondition); তবে 'যথেষ্ট শর্ত' (sufficient) নয়। 'যথেষ্ট শর্ত' পূরণে প্রথমেই প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ হতে হবে, আর তারপরে যে উপাদানটি আবশ্যিকভাবেই থাকতে হবে, তা হলো—রুগির জন্য সুযোগ্য-দক্ষ চিকিৎসকের যোগ্যতা-দক্ষতার যথাসাধ্য পূর্ণ প্রয়োগ (যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে 'উচ্চ উৎপাদনশীলতা' বা high productivity)।

কোভিড-১৯ মহামন্দার মহারোগ-এর স্বরূপ যখন জানা গেল এবং একই সাথে রোগমুক্তির পথ-পদ্ধতিগুলোও যখন জানা সম্ভব হলো, তখন কাজ একটাই। তা হলো প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে "কোভিড-১৯ মন্দারোগ" চিকিৎসার কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে: 'L-পদ্ধতি', যা রুগির মৃত্যু অনিবার্য করবে; 'U-পদ্ধতি' যা রোগ প্রশমনে কিছুটা কার্যকর হবে, জীবনমান কিছুটা বাড়াবে তবে পূর্বাবস্থায় ফেরাতে পারবে না; নাকি 'V-পদ্ধতি' যা রুগিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা

দেবে। চিকিৎসার পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্র, আর সরকার তা প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করবে। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা সংগত কারণেই চাইব রাষ্ট্র-সরকার সর্বোৎকৃষ্ট পথ 'V' (বা victory) পদ্ধতিটাই বেছে নিক। আমরা কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় রোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল" উত্থাপন করতে যাচ্ছি, তা 'Victory' বা 'V' পদ্ধতি অনুসরণেই প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও মহামন্দা থেকে মুক্তি: শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল

আমরা এখন একই সময়ে দুই মহারোগে আক্রান্ত। প্রথম ও প্রধান মহারোগটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসৃষ্ট মহারোগ। শোষণভিত্তিক-মুনাফালোভী-বৈষম্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিকারী লোভ-লালসাভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—অনিবার্য পরিণতি-উদ্ভূত *মহামন্দা রোগ* নামক *সংকট মহারোগ*। যে মহারোগের একমাত্র এবং চিরস্থায়ী ভ্যাকসিন-ওষুধ হলো—যে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রোগটি হচ্ছে ওই ব্যবস্থাটাই পাল্টে ফেলা, নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, যেখানে মহামন্দা রোগ বা সংকট নামক মহারোগ আবির্ভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগই থাকবে না। আর অন্যটি অর্থাৎ দ্বিতীয় মহারোগটি প্রকৃতির প্রতি অবিচার-অন্যায্য আচরণ-উদ্ভূত মহারোগ—*কোভিড-১৯ মহারোগ*, যে মহারোগ থেকে হয়তো বা আপাত'মুক্তি' সম্ভব হবে যদি রোগমুক্তির ভ্যাকসিন-ওষুধ আবিষ্কার হয়। তবে এখানে দুটো বিষয় মনে রাখা দরকার: (১) 'ভ্যাকসিনের রাজনীতি'—এক মহারাজনীতি, অত্যুচ্চ মুনাফার রাজনীতি, সর্বৈব অনৈতিক রাজনীতি;[২] (২) প্রাণিজগতে ১৫ লক্ষ ভাইরাস ঘোরাঘুরি করছে—এদের মধ্যে যারা আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনকি আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে—কোনো সুনির্দিষ্ট ধরনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যদি তাদের উত্তেজিত করার কারণ হয়, সেক্ষেত্রে ওই আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকেই তো উচ্ছেদ করা দরকার—সমগ্র মানবসমাজের অস্তিত্বের স্বার্থেই তো এটা জরুরি।

আমরা এখন একই সময় একই অঙ্গে দুই মহারোগে আক্রান্ত—বলা যায় এ হলো একই সময় একই সঙ্গে মোটামুটি অনিরাময় যোগ্য 'multiple organ disorder'—*কোভিড-১৯* disorder (যা ভ্যাকসিন/ওষুধ আবিষ্কার হলে নিরাময় হবে অথবা অন্য যেকোনোভাবে মানুষের শরীরে ওই ভাইরাস থেকে মুক্তি অথবা প্রকৃতির শক্তির কারণেই মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মুক্তি হবে) এবং অর্থনৈতিক সংকট-উদ্ভূত মহামন্দা-মহারোগ (বা মহা disorder) থেকে মুক্তির জন্য আমরা '*শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল*' প্রণয়ন করেছি। মডেল প্রস্তাবনার সাথে সাথে বড় পর্দায় ছোটখাটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি উত্থাপন করব।

প্রথমেই বলে রাখি কোভিড-১৯-এর প্রভাব-অভিঘাত মোকাবিলায় সরকার কী করবে-করেছে—এ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে সরকারপ্রধান ২০২০ সালে ইতিমধ্যে দুই দফায় (২৫ মার্চ ও ২৫ এপ্রিল ২০২০) মোট প্রায় ৯৬ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন (সম্ভবত আরো অনেক টাকার প্যাকেজ ঘোষিত হতে হবে)। যার মধ্যে 'বড়রা' আপাতত তুলনামূলক অনেকই পাবেন—৩০ হাজার কোটি টাকার

---

২ সম্ভবত মোটামুটি দ্রুতই কভিড-১৯ প্রতিরোধের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়ে যাবে। আবিষ্কারটা করবে মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানাধীন কর্পোরেশন। ফলে ভ্যাকসিন আবিষ্কারে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়-এর হিসাব ভ্যাকসিনের বাজারমূল্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। ওসব হিসেবপত্তর হবে অতিমূল্যায়িত, যেন শেষপর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শত শত গুণ বেশি দেখানো যায়। ফলে ভ্যাকসিনের বাজারমূল্য হবে অতিমূল্যায়িত, যার ফলে তা হবে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। উল্লেখ্য, পোলিও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে আজ থেকে ৭০ বছর আগে ১৯৫২ সালে সরকারি অর্থায়নে। তারপরেও বিগত ৭০ বছরেও পৃথিবী থেকে পোলিও নির্মূল হয়নি।

৪.৫ শতাংশ (সরল) সুদে চলতি মূলধন ঋণের পুরোটা এবং ইতিমধ্যে রপ্তানিমুখী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পশ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি সহায়তার ৫ হাজার কোটি টাকা পেয়েছেন; রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল এবং প্রাক্-জাহাজীকরণ পুনর্ভরণ তহবিলের ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সুবিধেও তারা পাবেন। পাশাপাশি ঘোষিত হয়েছে কৃষি ভর্তুকির ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহবাবদ ২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা, আর সরকারিভাবে ২ লক্ষ টন অতিরিক্ত ধান ক্রয় করে মজুদ রাখার জন্য ৮৬০ কোটি টাকা, গৃহহীন মানুষদের আবাসনের জন্য ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা, দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৮৬০ কোটি টাকার নগদ অর্থসহায়তা, বিভিন্ন ভাতা সম্প্রসারণে ৮১৫ কোটি টাকা। এসব হিসেবপত্তর যা-ই হোক না কেন প্রায় ৯৬ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা চলে যাবে 'বড়'দের হাতে—সেটাই আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির অধীন রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত 'অশোভন' ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম। ওরা 'বড়রা'—'জোম্বি বড়রা', "ডাকিনীবিদ্যক গ্রুপ বা কর্পোরেশন"রা হাতিয়ে নেবে সবকিছু। এ কাজে ব্যবহার করবে সরকারের ফিসক্যাল পলিসি—অর্থাৎ আয় ও ব্যয় নীতি। মুদ্রানীতি হবে ওদের স্বার্থের অধীন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপাবে, 'বড়রা'—'জোম্বি'রা তা নেবেন এবং ফেরত দেবেন না; কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবারও টাকা ছাপাবে, বড়রা আবারও নেবেন এবং ফেরত দেবেন না। এভাবে চলতে চলতে প্রতি ১০ বছর পরপর অবশ্যম্ভাবীভাবেই হবে অর্থনৈতিক সংকট। কোভিড-১৯ ওদের খুবই উপকার করেছে। কোভিড-১৯ নামক উপলক্ষকে ওরা ওদের স্বার্থে অবস্থার অবনতির কারণ হিসেবে ব্যবহার করবে। ওরা মিথ্যা বলবে যে ওদের খুব ক্ষতি হয়েছে, যা আসলে হয়নি। দেশের মহাবিপদকালীন এই মুহূর্তে বলেই দেখুন যে নতুন করে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের অনুমতি দেওয়া হবে, দেখবেন আবেদনকারীর সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৫০ হাজার; বিশ্বাস না করলে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন।

আসলে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক ভাবলে (*"সংবিধানের প্রাধান্য"* অনুযায়ী আমরা তা ভাবতে ও মানতে বাধ্য) যা জরুরি প্রয়োজন তা হলো—বিপন্ন আমজনতার স্বার্থ দেখা। আমাদের হিসেবে এখন প্রায় ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র—অভুক্ত-অর্ধভুক্ত, এরা 'দিন আনে দিন খায়' গ্রুপের মানুষ, এসব মানুষের কাজ নেই—আর কিছুই না-হোক এসব মানুষের জন্য 'মানুষ বাঁচাও কর্মসুচি' চালু করে অন্তত ৬ মাস খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর শুধু সে জন্যই তো প্রয়োজন হবে দৈনিক ৫২৫ কোটি টাকা করে ৬ মাসে মোট ৯৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আমরা 'শোভন সমাজব্যবস্থা' ও 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র যে ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো ইতিমধ্যে উত্থাপন করেছি (প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে) সেখানে মূল কথাটিই হলো—প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ মাত্রায় অনুগত থেকে আলোকিত মানুষসমৃদ্ধ বৈষম্যহীন ব্যবস্থা বিনির্মাণ করা। আর বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আমাদের এখন ভাবতে হচ্ছে কোভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয় ও আর্থসামাজিক মহামন্দা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল নিয়ে। আর সে কারণেই নৈতিক ও মানবিক যুক্তিতে বাঁচাতে হবে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষকে। এখানে বলা জরুরি যে কোভিড-১৯-এর লকডাউন শুরুর ৫ দিনের মাথায় (৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে) সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম যে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং 'মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি' গ্রহণ না করলে সমূহবিপদ অবশ্যম্ভাবী। এ নিয়ে যা লিখেছিলাম, গুরুত্বের কারণে—কলেবরে একটু বড় হলেও তার একাংশ হুবহু উদ্ধৃত করছি:

"করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা এবং সমাধানের লক্ষ্যে উত্থাপিত কল্পচিত্রটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব ভাবনা। কোনো প্রমাণিত তত্ত্ব অথবা প্রাক্-অভিজ্ঞতা উদ্ভূত নয়। তবে সমাধান-উদ্দিষ্ট ভাবনার পেছনে বেশ কিছু যুক্তি আছে, যা পরে বলেছি।

আমার মূল বক্তব্যটি এ রকম: বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব; ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয়; কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব।

আসা যাক আমার দ্বিতীয় বর্গের বক্তব্যে, যেখানে আমি বলেছি "ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয়; কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব"। সম্ভাব্য অপরিমেয় ক্ষতিটা হতে পারে কীভাবে? মানুষের অকাল মৃত্যু ও বিভিন্ন মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কথা তো আগেই বলেছি—এসব হলো প্রথম ক্যাটাগরির ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ক্ষতিটা হবে একই সঙ্গে পাশাপাশি। তবে ক্ষতির রূপটা হবে ভিন্ন এবং সম্ভবত ক্ষতির গভীরতা হতে পারে কল্পনাতীত ও অপরিমেয়। বিষয়টার উদ্ভব হবে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা গতি স্লথ হয়ে যাওয়ার কারণে। ইতিমধ্যেই আমরা এসব লক্ষ্য করছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায়: শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (বিশেষত বস্ত্র, গার্মেন্টস, লেদার ইত্যাদি); বন্ধ হচ্ছে সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট; বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাত—রিকশা, ভ্যানসহ শহর-উপশহর-গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা জীবিকানির্বাহ কর্মকাণ্ড; বেকারত্ব বাড়ছে এবং বাড়বে—সর্বত্র; কৃষক কৃষিজ ফসল বিক্রির জন্য হাটবাজারে যেতে পারছেন না, কারণ করোনার কারণে হাট বসতে দেওয়া হচ্ছে না; বৈদেশিক বাণিজ্যে-আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই কমছে; ইতিমধ্যে বস্ত্র ও গার্মেন্টসের প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলালের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে; ব্যাংকের এলসি প্রায় স্থবির; প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমে আসছে—এসবই বড় ধরনের অনিশ্চয়তা এবং এ অনিশ্চয়তা কত দিন চলবে, তা কেউই জানে না। আমার মতে, এসব কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টা সমাগত—এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই সম্ভবত—তা হলো হয়তো বা খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি থাকবে না, কিন্তু গ্রাম-শহরনির্বিশেষে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, তারা সন্তান-সন্ততিসহ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন। কারণ যেসব মানুষ (খানা) 'দিন আনে দিন খায়' তাদের 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে গেলে তারা খাবেটা কী? আর কাজ না থাকলে তো 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে যাবে।

এ এক সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো ক্ষুধার্ত-অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে অর্থ থাকুক বা না থাকুক তাদের চুলায় নিম্নতম প্রয়োজনমতো খাবার থাকতেই হবে। সরকারি পরিসংখ্যানুযায়ী এসব মানুষের সংখ্যা ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ৩ কোটি ৪০ লাখ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না, তখন এসব মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়াবে আনুমানিক ৬ কোটি। অর্থাৎ এরা হলেন দেশের মোট খানার আনুমানিক ৩৭ শতাংশ। এই ৬ কোটি মানুষ বাস করেন আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ খানায়, যার মধ্যে গ্রামে ১ কোটি খানা আর শহরে ৫০ লক্ষ খানা।

যদি করোনা ভাইরাস-১৯ অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয়, তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। আসা যাক কিছু হিসাবের কথায়। মূল কথা হলো, এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত প্রতিটি মানুষকে খাদ্যবাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে (হিসাবটি করা হয়েছে খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর দারিদ্র্যের নিম্নরেখার সাথে মূল্যস্ফীতি যোগ করে)। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারা দেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৬ মাস চালাতে হলে লাগবে ৮১ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য অনিশ্চিত এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অংক কম-বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য, যেখানে শিল্পমালিকদের জন্য আপাতত ৫ হাজার কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আর্থিক ও নীতি সুবিধাসহ আরো অনেক সুবিধে দিতে হবে, সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষ বাঁচাতে তাদের মধ্যে খাদ্যবাবদ ৬ মাসের জন্য ৮১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ যেকোনো বিবেচনায় ন্যায্য বরাদ্দ। আবার ওই বরাদ্দফল কিন্তু পরবর্তীকালে পুঁজির মালিকেরাই আনুপাতিক বেশি হারে ফেরত পাবেন; কারণ তাদের দরকার হবে সুস্থ শ্রমিক। আর ওই সুস্থ শ্রমিকেরাই দেশজ উৎপাদন বাড়াবেন এবং একই সাথে সত্যিকার অর্থে সুস্থ থাকলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে, বাড়বে প্রবৃদ্ধি। শেষ বিচারে আনুপাতিক হারে এসবের বেশি অংশের ফল ভোগ করবেন পুঁজির মালিক ও তাদের স্বার্থবাহীরা।

সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দপ্রাপ্তি যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ন; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগবিহীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এখনই। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময়নির্ধারিত। তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হলো গ্রাম এবং শহরে যেসব খানা নারীপ্রধান, যার প্রায় শতভাগই আর্থিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তালিকাভুক্ত হবেন (তবে কেউ সংগত কারণে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইলে তাকে বাদ দেওয়া উচিত), তালিকাভুক্ত হবেন সরকারি হিসেবের সব দরিদ্র খানা, সেসব খানা যাদের কোনো সদস্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে পারেননি অথবা পারছেন না, এবং সেসব খানা যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো আবাসন নেই এবং গৃহহীন খানা, শহরের বস্তিবাসী এবং ভাসমান মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট অংশ, করোনা আক্রান্ত অথবা সম্ভাব্য আক্রান্ত সকল দরিদ্র খানা, চর-হাওড়-বাওড়ের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এবং যারা ইতিমধ্যে বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি পাচ্ছেন তাদের বাদ না দেওয়া। এ তালিকা প্রণয়নে দল-মত-গোষ্ঠী-সমাজ যেন কোনোভাবে প্রভাব না ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে, মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

এর পরের প্রশ্ন—তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা খাবার কীভাবে পৌঁছাবে? বরাদ্দকৃত অর্থ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং অথবা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে একই খানার জন্য যেন শুধু একটি (একাধিক নয়) মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও ফলপ্রদ সরকারি সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী অথবা সামাজিক সেফটি নেট কর্মসূচির মাধ্যমে যে শতাধিক ধরনের বরাদ্দ মানুষের কাছে পৌঁছায় সেটা অনুসরণ করা যেতে পারে। খাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা বরাদ্দকৃত খাদ্য সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিলি-বণ্টন ও মনিটরিং ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নেবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জনগণের সেবাসংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা-শৃঙ্খলা ও আইনি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। কেন্দ্রীয়ভাবে রিপোর্ট যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে, যিনি প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে সরাসরি রিপোর্ট করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চিফ অব কমান্ড হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিটি হবেন চিফ

অব অপারেশনস। অর্থাৎ সমগ্র মেকানিজম হবে মোটামুটি "করোনা ভাইরাস-১৯ প্রতিরোধ" কার্যক্রম যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে ঠিক একই ধরনের গুরুত্ব দিয়ে।

এখন প্রশ্ন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বাঁচাতে ৬ মাসের খাদ্যসহায়তা বাবদ যে ৮১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ লাগবে তা কোথা থেকে আসবে? এ প্রশ্নের পাটিগাণিতিক উত্তর তেমন কঠিন নয়।

আমাদের চলমান ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা হলো উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ, যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। মোট ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সর্বমোট যে পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয় তার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় প্রথম ১০ মাসে। আর পরের দুই মাস অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' প্রবল অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় মিস-অ্যালোকেশন অথবা অপচয়। এ হিসেবে চলমান উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ এখনও ব্যয় হয়নি। বরাদ্দকৃত অ-ব্যয়িত এ অর্থের মোট পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৮৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই যে আগামী দুই মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অথচ অ-ব্যয়িত একাংশ ব্যয় হতেই হবে (যেমন খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ণ, মহিলা ও শিশু, জনশৃঙ্খলা) সেক্ষেত্রেও বর্তমান জরুরি অবস্থায় ওই অ-ব্যয়িত অংশের সর্বোচ্চ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়কে যুক্তিসংগত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ তারপরেও হাতে থাকবে ৭৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। এ মুহূর্তে যে কাজটি করা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই উল্লিখিত ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে খাত-উপখাতওয়ারি এ তথ্যাদি জেনে নিন যে প্রত্যেকের কাছে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অথচ এখনও ব্যয় হয়নি এমন অর্থের পরিমাণ কত; নির্দেশনা দিন আগামী ২ মাসে ব্যয় না করলেই নয় এমন খাত-উপখাতগুলো কী কী এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি। দেখবেন অর্থের অভাব তো হবেই না, বরঞ্চ অর্থবছরের শেষের দিকে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' উল্টে যাবে। এটাও তো হতে পারে কোভিড-১৯-এর কারণে বহু দিনের পচনশীল বাজেট বাস্তবায়ন সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এসবের পাশাপাশি দেশের মধ্যেই সরকারি রাজস্ব অর্থাৎ অর্থ-আহরণের বহু উৎস আছে, যাতে কখনো হাত দেওয়া হয়নি যেমন—গত বাজেট বক্তৃতায় (২২১ অনুচ্ছেদে) মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন "বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই...। অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না"। একই সাথে সামনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধপরবর্তী সময়ে খাদ্যসহায়তা, কর্মসৃজন-সহায়তা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়তার লক্ষ্যে বহু ধরনের বৈশ্বিক তহবিল গঠিত হবে। আগেই বলেছি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমরা এসব তহবিলের ৩ শতাংশ হিস্যা পেতে পারি। তাহলে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ৬ মাসের খাদ্যসহায়তা বাবদ ৮১ হাজার কোটি টাকা আহরণ আদৌ কোনো কঠিন কাজ হবে না।

আগেই বলেছি মানুষের 'কাজ' না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে করি 'কাজ' নিয়ে নিরাশ না হয়ে পথ-পন্থা খুঁজতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় কেইন্সীয় সমাধানপথ যথেষ্ট কার্যকর। আর তা হলো অবস্থা একটু উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কর্মকাণ্ড চালু করা। হতে পারে তা রাস্তার কাজ, নির্মাণকাজ, নদী খননের কাজ, পুকুর-দিঘি খননের কাজ, স্কুলঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। কাজ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে হবে। কাজ নিয়ে উদ্ভাবনের স্বরূপ সময়ই বলে দেবে।

আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরামূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেশন বরদাস্ত না করা। অতীতের ইতিহাস বলে, সিন্ডিকেটওয়ালারা বিভিন্ন অজুহাতে অযথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য বাড়িয়ে বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন। ফলে মানুষ দরিদ্রতর হয় এবং বৈষম্য বাড়ে। করোনা আক্রান্তকালে ও পরবর্তী কিছুকাল এসবের সম্ভাব্য মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে যদি শক্ত হতে তা দমন না করা যায়। এ ধরনের সবকিছু ফৌজদারি অপরাধ গণ্য করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আর এসবের পাশাপাশি এ মুহূর্তে (মার্চ-এপ্রিল) যেসব চৈতালি ফসল মাঠে আছে অথচ কৃষক হাটবাজারে বিক্রি করতে পারছেন না, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল, গম, মরিচ আর সামনে (মে মাসে) যে ফসল উঠবে যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি সেসব যেন সরকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করার এটাও এক সুযোগ। অন্যথায় কৃষক আবারও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনস্থ হবে আর রাজত্ব করবে সিন্ডিকেটওয়ালারা। এসবই দমন করতে হবে—কঠোর হাতে।

আমার প্রস্তাবিত 'মানুষ বাঁচাও' কল্পচিত্র কর্মসূচিতে আরো দু-একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি: কৃষিখাতকে সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য খাত হিসেবে বিবেচনা করে তদনুযায়ী যতদিন করোনা ভাইরাস ও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আমরা মুক্ত না হচ্ছি, ততদিন কৃষিখাতে সবধরনের উৎপাদন প্রণোদনা থেকে শুরু করে ঋণ মওকুফ, ক্ষুদ্র ঋণের সুদ মওকুফ, স্বল্প সুদে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বিনাসুদে কৃষিঋণ প্রদানসহ কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির সকল কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু রাখতে হবে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন কর্মসূচি ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাস-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে। আগামী বাজেটে করোনা ভাইরাস-১৯-এর ঘাত-প্রতিঘাতসহ সংশ্লিষ্ট 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাজেটের প্রচলিত-গতানুগতিক কাঠামো পরিবর্তিত হবে। অর্থনীতি আবারও জেগে উঠবে কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে পড়বে অনেক খাত-ক্ষেত্র-শিল্প-ব্যবসা।

ইতালিসহ কিছু দেশে ব্যাংকিং সংকটের আশঙ্কা আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার আঘাত ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান; একই সাথে এ মুহূর্তে ৩০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বেকারত্ব-ইন্সুরেন্স দাবি করছেন, যা বাড়বে; গণচীনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৩.৫ শতাংশ কমেছে; যুক্তরাজ্যে করোনার আঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে—সব মিলিয়ে বৈশ্বিক আর্থসামাজিক অবস্থা দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে; সম্ভবত পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ ও মেরুকরণ। আমরা এসব ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাত থেকে মুক্ত নই। সুতরাং আমাদেরও ভাবতে হবে; কঠিন ভাবনা কারণ 'অনিশ্চয়তার' মধ্যে সুস্থ ভাবনা শুধু মানসিকভাবেই নয় যৌক্তিক কারণেই সহজ নয়। জটিল এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথরেখা বিনির্মাণে ধৈর্য্য, সততা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মিলনের বিকল্প নেই। আমরা এখন যে সময় পার করছি তার প্রাক্-অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। অনিশ্চিত সময়টা হলো "ডিজিটাল সংযোগের যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট।" সুতরাং মানব উন্নয়নসংশিষ্ট সকল চিন্তাভাবনা-পরিকল্পনায় এ বিষয়টি মূল নীতি-কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আমার আপাত শেষ কথা: করোনা ভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির যে কল্পচিত্র প্রস্তাব করেছি তা যথেষ্ট মাত্রায় যৌক্তিক। কারণ একদিকে যেমন মানুষকে ভাইরাস থেকে প্রতিরোধ করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে কোনোভাবেই দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করা যাবে না এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরাতে হবে। আমরা এসব মোকাবিলায় সক্ষম। কারণ আমাদের নেতৃত্বের শিখরের ব্যক্তিটির

মানবিক দায়বোধ সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। আর এসব মোকাবিলা করতে সক্ষম হলে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-প্রভাব বা স্পিল ওভার ইফেক্ট হবে উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক; শ্রম ও পুঁজির বাইরে উন্নয়নে আরো যেসব উপাদান কাজ করে তার প্রভাব হবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা; মোট দেশজ উৎপাদনের ভাবনাজগতে নির্ধারক স্থান করে নেবে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি অথবা জীবনকুশলতা; অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ফ্যাক্টরের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাক্টর বেশি প্রভাব ফেলে—আমরা সেদিকেই এগুবো; এবং সর্বশেষ কথা, আমাদের দেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে যা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি সেসব গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্বলিত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে। ফলে সুশাসন নিশ্চিত হবে; নিশ্চিত হবে শুধু জবাবদিহিতা নয় মানবিক দায়বদ্ধতাও। শেষ বিচারে আমরা অবশ্যই পারব এমন এক সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বিনির্মাণ করতে, যা "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"-এ দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম, যা সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে "ডিজিটাল যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট" কাটিয়ে উঠতে সক্ষম, এবং যা শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি আস্থা-সম্মান রেখে মানুষের জীবনসমৃদ্ধি ও জীবনকুশলতা বাড়াতে সক্ষম।"[৩]

কোভিড-১৯-এর ক্ষতি মোকাবিলা এবং একই সাথে নিম্নগামী ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার উত্তরোত্তর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বহু কিছু করতে হবে, লাগবে অর্থ, লাগবে জনগণের সম্পৃক্ততা, লাগবে নেতৃত্বের সততা, সাহস, দেশপ্রেম। তবে এসবে করণীয় ভাবনাটা কেমন হতে পারে? এ নিয়ে আমাদের নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ ভাবনাটা হলো এ রকম: অর্থনীতিকে 'প্রবাহ' (flow) হিসেবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রকে একই সাথে ৪ ধরনের সচেতন হস্তক্ষেপ (intervention) করতে হবে। হস্তক্ষেপ ৪টির প্রভাব হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। এই ৪ হস্তক্ষেপের মধ্যে থাকবে (১) ব্যয় হ্রাস/সংকোচন, (২) ঋণ পুনর্গঠন/ঋণভার হ্রাস, (৩) সম্পদশালীদের সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে (সমাজের নিচতলায়) পুনর্বণ্টন, এবং (৪) (প্রয়োজনে) টাকা ছাপানো। আমাদের প্রস্তাবনায় অর্থনীতির 'প্রবাহ' নিশ্চিত করতে হবে, যা সম্পদ/স্টক বৃদ্ধি ঘটাবে। আমাদের প্রস্তাবনাটি কোভিড-১৯ এর মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট। আমাদের এ প্রস্তাবনাটি আমরা 'শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল' হিসেবে অভিহিত করছি। এই মডেলের সংক্ষেপ-কাঠামো লেখচিত্র-২-তে দেখানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিচে করা হয়েছে।

---

৩ পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি দেখুন, বারকাত, আবুল (২০২০, মার্চ ৩১, ১ এপ্রিল ও ২ এপ্রিল), করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র, পৃ. ৪।

লেখচিত্র ২: কোভিড-১৯-এর প্রভাবে অবনতিশীল ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সামনে চলা: বৈষম্যহীন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল

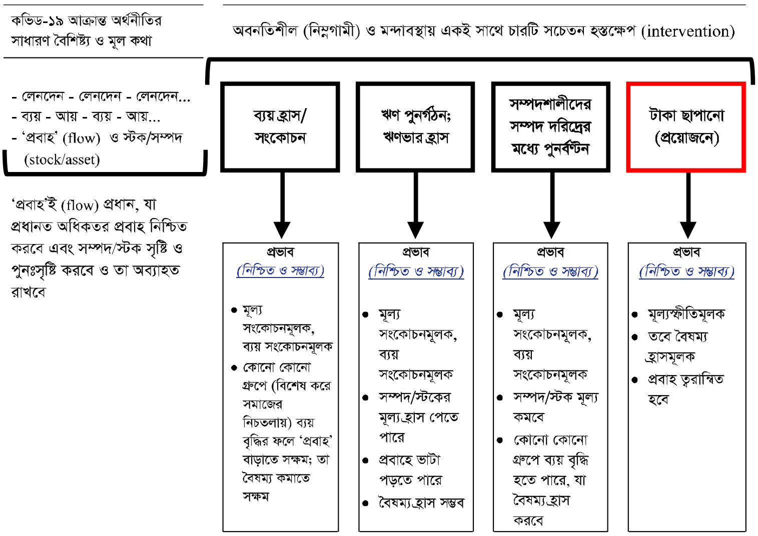

উৎস: বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। পৃ. ২১৬

১. ***ব্যয় সংকোচন করতে হবে* (Cut spending)**: ব্যয় সংকোচন করবে ব্যক্তি, সংকোচন করবে ব্যবসা-বাণিজ্য (তবে এর সম্ভাব্য অভিঘাত হবে মূল্য সংকোচনমূলক deflationary, যার ফল হতে পারে কর্মহীনতা বৃদ্ধি), সংকোচন করবে সরকার—কমাবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় যাকে বলে কৃচ্ছ্রসাধন (এরও সম্ভাব্য ফল হতে পারে মূল্য সংকোচনমূলক এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিপরীত)। যদিও শুরুতে এ ধরনের ব্যয় সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণের বিকল্প নেই—এ বিকল্প স্থায়ী হবে না। এ পদ্ধতি দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর ফল দেবে না। তবে এ পথে যদি দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থানভিত্তিক অর্থ/ব্যয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, তাহলে তা অর্থনীতির প্রবাহ (flow) বাড়াবে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নবদরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয়-বৃদ্ধিমূলক হস্তক্ষেপ করতে হবে। কারণ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নবদরিদ্র এমনকি নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সবারই লকডাউনে ব্যয় সংকুচিত হয়েছে; অনেকেরই এমন সংকুচিত হয়েছে যে তারা অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থায় ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র এবং ৩ কোটি ৯০ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্তসহ ১০ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের জন্য ব্যয় বৃদ্ধিমূলক সহায়তা জরুরি। যদিও ব্যয় সংকোচন/হ্রাসমূলক হস্তক্ষেপের প্রভাব প্রধানত মূল্য সংকোচনমূলক তথাপি সমাজের নিচতলায় এই ব্যয় বৃদ্ধিমূলক হস্তক্ষেপের প্রভাবে একদিকে নিচতলায় 'প্রবাহ' বাড়বে, আর অন্যদিকে তা বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক হবে।

২. ***ঋণ-ভার কমাতে হবে এবং ঋণ পুনর্গঠন করতে হবে* (Restructure debt)**: এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এ জন্য যে ঋণগ্রহীতাদের অনেকেই লকডাউনের কারণে ঋণ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়েছেন, অনেকেই ঋণ পেলেও সুদের হার চড়া হলে ঋণ গ্রহণও করতে পারবেন না। অনেকেরই ঋণের বিপরীতে বন্ধক দেওয়ার কিছু নেই। প্রায় সবারই বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য কমেছে যে কারণে প্রয়োজনীয় ইক্যুইটি দিতে পারবেন না। এসব কারণে ঋণদাতা ব্যাংকও হয় ঋণ দেবে না (যেটা স্বাভাবিক সময়ে ব্যাংকের জন্য 'অ্যাসেট'—লায়াবিলিটি নয়) অথবা ঋণ দেওয়াকে অত্যন্ত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং হয়তো বা

অনিশ্চিত মনে করবে। আবার একই সাথে এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে অনেকেই এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যে ঋণ না পেলে ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানার কার্যক্রম শুরুই করতে পারবেন না; কোনোভাবে শুরু করলেও চালাতে পারবেন না; এমনকি চালাতে গিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করবেন—বেকারত্ব বাড়বে। অতএব এক্ষেত্রে যুক্তিসংগত হস্তক্ষেপটা হবে—স্বল্প সুদে ঋণ; অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ; প্রয়োজনে ঋণসহায়ক অন্যান্য সুবিধা প্রদান। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিনাসুদেও ঋণ দিতে হতে পারে (যেমন কৃষক ও কৃষির বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে ঋণ)।

ঋণ পুনর্গঠন ও ঋণ-ভার হ্রাসসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপে "One size fits all" পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং হবে না। হবে না এ কারণে যে সবার অবস্থা এক নয়—অর্থনীতির প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে (যে অবস্থাও পরিবর্তনশীল) কাউকে দিতে হবে অনুদান, কাউকে দিতে হবে কম ঋণ, কাউকে আবার বেশি ঋণ, কাউকে কিছুই দেওয়া যাবে না। আর "One size fits all" পদ্ধতির ততটুকু বাস্তবত প্রয়োগ করতেই হবে, যার মধ্যে থাকবে ঋণের স্বল্প সুদ হার এবং ঋণ পরিশোধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদ। শেষোক্ত এসবে থাকবে স্বল্প সুদে (২%-৪%) তুলনামূলক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, কর্মসৃজনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বল্প সুদের ঋণ (২%), স্বল্প সুদে (২%-৪%) হালকা শর্তে চলতি মূলধন ঋণ ইত্যাদি।

বড় ঋণগ্রহীতাদের কোনোভাবেই নগদ অর্থ প্রণোদনা (cash incentive) দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এতে একদিকে যেমন সম্পদের অপচয় (wastage of resources) এবং সম্পদের ভুল বরাদ্দ (misallocation of resources) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর অন্যদিকে থাকে অর্থ পাচারের সম্ভাবনা—এ পথে যাওয়া যাবে না। বড় ২০-৫০ ঋণগ্রহীতার কাছে নগদ টাকায় ঋণ ফেরত নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে এ প্রচেষ্টা যে খুব বেশি সফল হবে তা ভাবার কারণ নেই। এর কারণ অনেক। ওরা মূলত রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর মানুষ, ওদের সাথে পারা কঠিন। আবার অনেকেরই অত নগদ অর্থ নেই, তবে বিদেশি মুদ্রাসহ সোনাদানা, হীরা, মণিমুক্তো দেশে-বিদেশে থাকা স্বাভাবিক। আর একই সাথে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি-স্টকের মূল্যপতন হয়েছে।

সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনে বড় ঋণগ্রহীতা-ক্লায়েন্টদের শূন্য ডাউনপেমেন্টে (এখন আছে ২%) ৩-৫ বছরের জন্য ঋণ পুনর্তফসিল করে অশ্রেণিকৃত ও নিয়মিতকরণ করলে তারা ব্যাংকের সবধরনের সুবিধা পেয়ে (যেমন ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি, চলতি মূলধন প্রাপ্তি, কিস্তির সাইজ ছোট হওয়ার সুবিধা) শিল্প-ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। এসব সুবিধা তারাও পেতে পারেন, যারা ইতিমধ্যে ব্যাড-অ্যান্ড-লস (BL) ক্যাটেগরিতে পড়ে শিল্প চালাতে পারছেন না, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি করতে পারছেন না, চলতি মূলধন পাচ্ছেন না। তবে শূন্য ডাউনপেমেন্টের এসব সুবিধা দেওয়ার আগে খুব ভালো করে যাচাই করতে হবে যে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর শিল্পকারখানা চালু আছে কি না, যন্ত্রপাতি চালু আছে কি না (অথবা সহজেই চালু করা যায় কি না), প্রকল্প ভায়াবল কি না ইত্যাদি। এসবই যাচাই করে দেখবে ঋণদাতা ব্যাংক, দায়িত্ব নেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। এ সম্পর্কে সব নীতিমালা প্রণয়ন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য, অনেক প্রকল্প (শিল্প-কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য) আছে, যা যৌক্তিক মানসম্মত কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক মালিক তা চালাতে চান না—এসব ক্ষেত্রে মার্জিংও খারাপ সমাধান না।

আমাদের প্রস্তাবিত ঋণ পুনর্গঠন ও ঋণভার হ্রাসসংশ্লিষ্ট (loan restructuring/ debt restructuring) হস্তক্ষেপটি যেহেতু ব্যয় সংকোচনমূলক-মূল্য সংকোচনমূলক, সেহেতু তা এককভাবে ফলপ্রদ হবে না, সাথে অন্যান্য পদ্ধতি লাগবে। সেইসাথে আমরা মনে করি, আমাদের প্রস্তাবিত এ পদ্ধতি অর্থনীতিতে 'প্রবাহ' (flow) বাড়াবে; আর প্রবাহ বৃদ্ধির প্রভাবে সম্পদ ও স্টক বাড়বে।

আমরা এও মনে করি, প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপ বৈষম্য হ্রাসেও সহায়ক হতে পারে। একটু বেখাপ্পা মনে হলেও আমাদের এই প্রস্তাব আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর হতে পারে। কারণ (১) ধনীরা যদি তাদের সম্পদ/স্টক-এর মূল্যপতনের ফলে একটু গরিব হন, আর গরিবদের যদি তেমন কোনো সম্পদ/স্টক না থাকে—তাহলে তো সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেবেই বৈষম্য কমে (তা যতটুকু কমুক না কেন); (২) ধনীরা যদি সহজ শর্তে-স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-কলকারখানা চালাতে সক্ষম হন, তাহলে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান বাড়বে (আয়-ব্যয় সক্ষমতা বাড়বে) এবং একই সাথে রাষ্ট্র যদি এমনভাবে ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেন, যখন ধনীদের মুনাফা হার বৃদ্ধির চেয়ে মজুর-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার বেশি হবে। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তুলনামূলক আয় বৈষম্য কমবে—বিষয়টি 'trickle down' প্রভাব নয় 'trickle up'[৪], (৩) ধনীরা যদি স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পান; আর অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা বিনাসুদে ঋণ, অনুদান, রেশনের মাধ্যমে খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় জীবনধারণ সামগ্রী (যেমন কলকারখানার শ্রমিকসহ নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা), বিনামূল্যে খাদ্য-চিকিৎসা-আবাসন পান—সেক্ষেত্রে অবশ্যই ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমবে। এটাও 'trickle up' প্রভাব 'trickle down' নয়। আমরা এসব প্রস্তাব দিচ্ছি যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণে। দেশের অর্থনীতিকে কোনোভাবেই "হারিয়ে যাওয়া দশক" (lost decade)-এর মধ্যে ফেলা যাবে না।

৩. *ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করতে হবে* **(Redistribute wealth from rich to poor)***:* ধনী ও সম্পদশালীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে গরিবদের দেওয়া—আমাদের এ প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ বৈপ্লবিক, বাস্তবতাবিবর্জিত—অবাস্তব ও অসম্ভব মনে হতে পারে। আসলে প্রস্তাবটি বৈপ্লবিকও নয়, অবাস্তবও নয়, অসম্ভবও নয়। প্রস্তাবটি বৈপ্লবিক হতো যদি আমরা বলতাম ধনী-সম্পদশালীদের সব সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ-জাতীয়করণ করে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানায় নিতে হবে। আমরা এসব বলিনি, যদিও আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"-এর ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত আছে যে *"উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা হইবে : (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায়ী মালিকানা, (গ) ব্যক্তিমালিকানা"*। এসবের বিপরীতে কোভিড-১৯ ও লকডাউনের মহাবিপর্যয় রোধে কোনো ধরনের 'বৈপ্লবিক' প্রস্তাব না দিয়ে 'ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করার' যে প্রস্তাব ('তৃতীয় হস্তক্ষেপ' হিসেবে) উত্থাপন করেছি তা ন্যায়সংগত-সংস্কারমূলক প্রস্তাব।

সামগ্রিক অবস্থা যা তাতে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকলে এবং নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হলে ধনী-সম্পদশালীরা যাদের সম্পদ/সম্পত্তি প্রধানত অনুপার্জিত, কষ্টার্জিত নয়, বহু ধরনের ফাঁকিজুকি-জোরজবরদস্তি উদ্ভূত, অতিশোষণ-অতিমুনাফা উদ্ভূত (ভাগ্য ভালো যে গরিব মানুষ এখনও এতসব বোঝেন না!) ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজেরাই তাদের ধন-সম্পদ পুনর্বণ্টনের এ প্রস্তাব দেবেন—এ নিয়ে আমাদের খুব সন্দেহ নেই। কারণ, দেশে আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্য চরম বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে—গিনি সহগ

---

৪ অর্থনীতি শাস্ত্রে ধনীদের আরো ধনী করার ক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে প্রায়শই 'trickle down' ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। 'Trickle down Theory' কে আমরা বলি "ভ্রান্ত তত্ত্বকে জায়েজ করতে সুবিধাবাদী তত্ত্ব" (theory of convenience)। আমরা প্রায়শই বলি "মাথার ঘাম পায়ে ফেলে", কিন্তু কেন যে বলি না "পায়ের ঘাম" কোথায় যায়; আমরা বলি "পানি গড়িয়ে নিচের দিকে যায়" কিন্তু বলি না "পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরের দিকে যায়"; আমরা বলি সব পানি নিচের দিকে যেতে যেতে নদীতে আর নদীর পানি আরো নিচের দিকে সাগরে পড়ে, কিন্তু বলি না "জলোচ্ছ্বাসে পানি কোন দিকে যায়—নিঃসন্দেহে উপরের দিকে"। বিষয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এখন ০.৬৩৫, পালমা অনুপাত ৭.৫৩, কমপক্ষে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ এখন দরিদ্র, যাদের সবাই শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে নেমে গেছেন—আর এসবই ক্রমবর্ধমান। এ অবস্থায় আয় বৈষম্য ও ধন বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যে প্রয়োজন, তা সম্পদশালীরা খুব ভালো বোঝেন। আর এ ধরনের অবস্থায় সম্পদ আঁকড়ে ধরে থাকার পরিণতিতে ধন-সম্পদবানদের ভাগ্যে ও সমাজ-অর্থনীতিতে কী ঘটে, কেন ঘটে, কী তাদের লাভ-ক্ষতি—এসবের ইতিহাস তাদের অজানা নয়। আর সে কারণেই আমরা মনে করি সম্পদের পুনর্বণ্টনসংশ্লিষ্ট আমাদের প্রস্তাবনাটি যথেষ্ট মাত্রায় বাস্তবসম্মত এবং ঐতিহাসিকভাবে কার্যকর বলে প্রমাণিত।

বলে রাখা জরুরি যে এ কথা প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য যে সম্পদ কর (wealth tax) আরোপ বৈষম্য হ্রাস করে; অর্থ পাচার ও কালোটাকা বৈষম্য বাড়ায়; সম্পদ মালিকদের ওপর কর কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না; সমাজের নিচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের ওপর কর কমালে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উভয়ই বাড়ে।

উল্লেখ্য যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ১৯২৯-৩৩-এর মহামন্দার সময় যে 'অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর' (tax on excess profit) আরোপ করা হয়েছিল তার ফল ভালো হয়েছিল। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে এসব বিবেচনায় আমরা মনে করি দেশে সম্পদ কর আইন আছে, কিন্তু সম্পদ কর আহরণ করা হয় না—এখন জরুরিভাবে সম্পদ কর আহরণ করতে হবে। সেই সাথে অতিরিক্ত মুনাফার ওপরও কর বসাতে হবে।

এ কথা মনে করার কোনোই কারণ নেই যে লকডাউনের মধ্যে সবাই গরিব হয়ে গেছে। আসলে কেউ কেউ অনেক ধনী হয়েছেন। হয়েছেন কল্পনাতীত ধনী। সাধারণভাবে অফ্-লাইন ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন সুবিধা করতে পারেনি, কিন্তু অনলাইনওয়ালারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। কোভিড-১৯ নিয়ে যারা ব্যবসা করতে পেরেছেন তা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি হোক আর দৈনন্দিন জীবন পরিচালনের ভোগ্যপণ্যই হোক—তারাও দ্রুত সম্পদ বানিয়ে ফেলেছেন। অর্থনীতির অবস্থা যা-ই হোক না কেন যারা স্টক মার্কেটে ঠিকমতো খেলতে পেরেছেন, তাদের অনেকেই অনেক ধনী হয়েছেন; অস্ত্র-মাদক—এসব ব্যবসার কথা না-ই বললাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লকডাউনে বেশকিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিলিয়ন ডলারের ওপর মুনাফা করেছে এবং নিট সম্পদ বাড়িয়েছে।

অর্থ পাচারকারীদের অর্থ, ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যে শুধু 'সম্পদ কর' আর অতিরিক্ত মুনাফার ওপর করই নয়, সেইসাথে উদ্ধার করতে হবে কালোটাকা ও অর্থ পাচার। আর এসবের পাশাপাশি বাজারে বন্ড ছেড়ে অর্থ আহরণ করতে হবে; অবশ্যই প্রত্যক্ষ কর হতে হবে পরোক্ষ করের তুলনায় বেশি (যেন কর বৈষম্য দূর হয়)। একই সাথে আমরা মনে করি, এখন (এমনকি সামনের কয়েক বছর) মধ্য-মধ্যবিত্ত থেকে নিচের দিকে কোনো ধরনের কর বসানো সমীচীন হবে না। তাদের জন্য এখন কর হবে দাসত্ব। তাদের 'কর দাসত্ব' থেকে মুক্তি দিতে হবে।

আমাদের মডেলে প্রস্তাবিত সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে বণ্টনের মেকানিজমটিও মূল্য সংকোচনমূলক-ব্যয় সংকোচনমূলক। তবে এ পদ্ধতি একদিকে যেমন আয় বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্য কমাবে, তেমনি একই সাথে অর্থনীতিতে 'প্রবাহ' বাড়াবে।

আমাদের মডেলের তৃতীয় প্রধান মৌল উপাদান হলো ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা। তবে কোভিড-১৯-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় এবং একই সাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা থেকে উত্তরণের

ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে আমাদের মডেলে আরো একটা উপাদান যুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রস্তাবটা হলো 'সম্পদ তহবিল' (Wealth Fund) সৃষ্টি করা। দুই ধরনের সম্পদ তহবিল। একটি 'সম্পদ তহবিল' হবে জাতীয়—বাংলাদেশ পর্যায়ে (সব দেশে নিজ নিজ দেশ পর্যায়ে)। যে তহবিলের উৎস হবে ধনীদের ওপর সম্পদ কর, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর, অর্থ পাচার উদ্ধার, কালোটাকা উদ্ধারসহ দেশের অভ্যন্তরে যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেমন গ্যাস, তেল, কয়লাসহ মাটির নিচে ও মাটির ওপরের সব প্রাকৃতিক সম্পদ। 'জাতীয় সম্পদ তহবিল' বা 'National Wealth Fund' ব্যবহার করতে হবে বৈষম্য হ্রাসসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানুষের জীবনকুশলতা বৃদ্ধি, সবুজ অর্থনীতি-সবুজ প্রযুক্তি বিনির্মাণ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যের সবধরনের কর্মকাণ্ডে।

যেহেতু কোভিড-১৯ কোনো স্থানিক বিষয় নয়—তা বৈশ্বিক, যেহেতু বৈশ্বিক মহামন্দা বিশ্বের ছোট-বড় সব দেশকেই বিপর্যস্ত করেছে; যেহেতু বৈষম্য-অসমতা-বঞ্চনা-দুর্দশা এখন বৈশ্বিক বিষয়, সেহেতু অন্য আর একটি 'সম্পদ তহবিল' গঠন করতে হবে—বৈশ্বিক পর্যায়ে। এ তহবিলের নাম হবে/হতে পারে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' বা Global Wealth Fund। 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল'-এর উৎস কী হবে, কে বণ্টন করবে, কোন দেশ কত পাবে? এসবই বাস্তব জীবনের অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ: (ক) 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' (Global Wealth Fund)-এর উৎস হবে দুটো—প্রথম উৎস হবে বিশ্বব্যাপী সারা বছরে যেসব আর্থিক লেনদেন হয় তার ওপর ০.০১ শতাংশ হারে করারোপ (অর্থাৎ 0.01% tax on Global Financial Transaction, এটাকে বলা হয় টবিন ট্যাক্স Tobin tax); আর দ্বিতীয় উৎস হবে আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের ওপর ০.৩৫ শতাংশ হারে করারোপ (অর্থাৎ 0.35% tax on Internationally Traded Goods, এটাকে বলা হয় টেরা ট্যাক্স, Terra tax)।[৫] আমাদের হিসাবে উল্লিখিত হারে ২০১৮ সালে টবিন ট্যাক্স থেকে আহরণ সম্ভব ১.৪৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট বৈশ্বিক লেনদেন ছিল ১৪.৯ কোয়াড্রিলিয়ন মার্কিন ডলার), আর টেরা ট্যাক্স থেকে ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ১৯.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অর্থাৎ ২০১৮ সালের হিসাবকে যদি ঠিক ধরে নিই, তাহলে এ মুহূর্তে 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' (Global Wealth Fund) হতে পারে ১.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ (ডলারের বিনিময়মূল্য ৮৫ টাকা ধরলে বাংলাদেশি টাকায় ১,৩২,৪৫,১২৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ)। এই তহবিলের ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন ও নির্দেশনার দায়িত্বে থাকতে পারে পৃথিবীর সব দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন যেখানে, নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হবে সমান; তবে "বড় মাতাব্বরদের" থেকে দূরে থাকতে পারলে ভালো হয় (যদিও তা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার)। ধরুন বছরে ২.১৯ ট্রিলিয়ন ডলার বণ্টন হবে—কোন দেশ কত পাবে? এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দেশের মোট জিডিপি কোনো মানদণ্ড হতে পারবে না। দেশের জনসংখ্যা মানদণ্ড হবে না, ভালো মানদণ্ড হবে মানুষের সত্যিকার প্রয়োজন (জনসংখ্যা যা-ই হোক না কেন)। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—"বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল" (Global Wealth Fund)-এর সর্বনিম্ন/রক্ষণশীল (conservative হিসাব অর্থে) যে হিসাব দেখালাম বাংলাদেশে আমরা যদি বিশ্বের জনসংখ্যানুপাতে তার হিস্যা পাই (অর্থাৎ ২.১১ শতাংশ) সেক্ষেত্রে আমাদের বাৎসরিক প্রাপ্য হতে পারে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৭৩ কোটি টাকার সমপরিমাণ

---

৫ 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল' বা Global Wealth Fund এবং টবিন-ট্যাক্স ও টেরা ট্যাক্সের ধারণা নতুন নয়। বিশ্বব্যাপী ইকো-সোশ্যাল মার্কেট ইকোনমি বিনির্মাণের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে Global Marshall Plan Initiative-এর আওতায় এসব প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন, Franz Josef Radermacher সম্পাদিত গ্রন্থ "Global Marshall Plan : A Planetary Contract" 07/2004, Hamburg, p.144.

(১ ডলারে ৮৫ টাকা ধরলে)। আমরা মনে করি 'জাতীয় সম্পদ তহবিল' ও 'বৈশ্বিক সম্পদ তহবিল'—এ দুটো প্রস্তাবই সময়োপযোগী এবং বৈশ্বিক ঐকমত্য থাকলে বাস্তবায়নযোগ্য।

৪. প্রয়োজনে টাকা ছাপাতে হবে **(Print money if necessary):** কোভিড-১৯ ও লকডাউনের প্রভাব-অভিঘাতে অবনতিশীল (recession) ও মন্দাগ্রস্ত (crisis) অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার ও দ্রুতলয়ে তা সামনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মডেলের চতুর্থ হস্তক্ষেপ-প্রস্তাব হলো প্রয়োজনে টাকা ছাপানো। অপ্রয়োজনে টাকা ছাপানো নয় এবং অপ্রয়োজনীয় টাকা ছাপানোও নয়।

আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে টাকা ছাপানোর কথা বললেই বুঝে-না বুঝে অনেকেই আঁতকে উঠবেন যে তাহলে তো মূল্যস্ফীতি হবে—হবে মহাবিপদ। অর্থনীতিশাস্ত্রের অতি সাধারণ বক্তব্য যে অতিরিক্ত টাকা ছাপলে টাকার মূল্য কমে যাবে (যাকে বলে টাকার অবচিতি বা currency depreciation) —হবে মূল্যস্ফীতি। কেউ বলবেন মূল্যস্ফীতি দরিদ্র মানুষের প্রধান শত্রু (এটা কি ধনীদের প্রধান মিত্র?); বলবেন টাকা ছাপলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হবে (তাহলে বিপরীতে ধনী কি ধনীতর হবেন?)। কেউ আবার উদাহরণ টানবেন অতিরিক্ত টাকা ছেপে কি বিপদেই না পড়েছিল ভেনিজুয়েলা, জিম্বাবুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি। আর অর্থনীতির রাজনৈতিক ইতিহাসবেত্তারা হয়তো বা বলবেন এসব করেই তো জার্মানির দুর্দশা হয়েছিল; আর সেই সুযোগে ফ্যাসিস্ট হিটলার ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন; আবার কেউ বলবেন অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর কারণেই তো তৃতীয় শতকে মহাপরাক্রমশালী রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল (যা 'তৃতীয় শতকের মহাসংকট' হিসেবে পরিচিত)। এসবই একদিকে আধাসত্য ভাষ্য, অন্যদিকে অসম্পূর্ণ ভাষ্য। কারণ কেউই তেমন বলেন না যে ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দায় মূল্যস্ফীতি হয়নি, হয়েছিল ঠিক উল্টোটা—মূল্যসংকোচন—ওই সময় ৩ বছরে মার্কিন ডলারের মূল্যমান ১০ শতাংশ বেড়েছিল। যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঁতকে ওঠার সম্পর্ক আছে, যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে ভয়ভীতির সম্পর্ক আছে, যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে মূল্যস্ফীতির এমনকি হাইপার-মূল্যস্ফীতির সম্পর্ক আছে, যেহেতু টাকা ছাপানোর সাথে ইতিহাসে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত উত্থান ও পতনের সম্পর্ক দেখা যায়—সেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত মডেলের সর্বশেষ 'চতুর্থ হস্তক্ষেপ অঙ্গ' (fourth intervention) —'প্রয়োজনে টাকা ছাপানোর' মর্মকথার ব্যাখ্যা জরুরি।

একদিকে অর্থনীতির ছাত্র আর অন্যদিকে বৈশ্বিক ইতিহাসের প্রমাণাদি থেকে আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে অতিরিক্ত টাকা ছাপালে তা সমূহবিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো: অতিরিক্ত টাকা ছাপানো মানে কত টাকা? কখন, কোন অবস্থায় ছাপানো টাকা অতিরিক্ত বলে গণ্য হতে পারে? কত টাকা পর্যন্ত ছাপলে "সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না"? টাকার গতিবেগ (যাকে বলে velocity of money) কত হলে তা অতিরিক্ত হবে না? নিয়োগ-গুণক (employment multiplier) বাড়াতে পারলে 'অতিরিক্ত' টাকা ছাপানো ভুল কি? 'অতিরিক্ত' টাকা যদি অর্থনীতিতে 'কার্যকর চাহিদা' ("effective demand" বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাই পরে আসব) বাড়াতে প্রয়োজন হয়, তাহলে টাকা ছাপাতে দোষ কোথায়? সুতরাং টাকা ছাপানো—'অতিরিক্ত' টাকা ছাপানোর বিষয়টি সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ। তা ভ্রান্ত নীতি হতে পারে, যদি যথেষ্ট বিশ্লেষণ না করে তা করা হয়; আবার তা সম্পূর্ণ সঠিক নীতি হতে পারে যদি অগ্রপশ্চাৎ যুক্তি বিবেচনা থেকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনে করা হয়। এসব বিবেচনা থেকে আমাদের মডেলে প্রস্তাব হলো মূল্যস্ফীতিমূলক হলেও প্রয়োজনে প্রস্তাবিত প্রথম তিনটি হস্তক্ষেপ-মেকানিজমের পাশাপাশি টাকা ছাপানোর কথা ভাবতে হবে। তবে অতিরিক্ত নয়। এ মর্মে অন্যান্য অনেক যুক্তির মধ্যে আমরা মাত্র একটি যুক্তি দেখাব যে প্রয়োজনমতো টাকা ছাপানো অতিরিক্ত হবে না যদি ব্যাপক কর্মচ্যুতি-বেকারত্ব-কর্মসংস্থানহীনতার মধ্যে বছরব্যাপী গ্রাম-শহরে

ব্যাপক শ্রমঘন (labour intensive) পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের জনহিতকর ও উৎপাদনমূলক কর্মসূচি চালু করা হয়। কাজটি রাষ্ট্রের পক্ষে করবে সরকার। এ প্রসঙ্গে আসার আগে 'টাকা' নিয়ে অর্থবহ কয়েকটি কথা বলা জরুরি। অর্থবহ-জরুরি কথাগুলো নিম্নরূপ (এসব বুঝবার জন্য অর্থনীতিশাস্ত্রে বা ধনবিজ্ঞানের মানুষ হওয়ার কোনোই প্রয়োজন পড়ে না—সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিই যথেষ্ট):

(ক) 'টাকা' অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। কিন্তু টাকার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সে নিজে নিজেকে প্রসারিত করতে অক্ষম। আপনি দোকানদারকে ১০০ টাকার নোট দিয়ে যদি বলেন বিনিময়ে আমাকে ১০০ টাকার নোট দিন—নিঃসন্দেহে দোকানদার (বিক্রেতা) আপনাকে (ক্রেতাকে) পাগল ভাববেন। কিন্তু আপনি যদি ১০০ টাকার নোট দিয়ে ১০০ টাকা দামের ১ প্যাকেট বিস্কুট কেনেন, তাহলে নিশ্চয়ই দোকানদার আপনার ১০০ টাকা নিয়ে ওই ১ প্যাকেট বিস্কুট দেবেন (অর্থাৎ ক্রেতার ১০০ টাকা = বিক্রেতার ১ প্যাকেট বিস্কুট)। 'টাকা' এখানে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম।

(খ) ওই বিস্কুট বিক্রেতা যদি ১০০ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে বাজারে চালের দোকানদারকে বলেন, ভাই এই ১০০ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে আমাকে ৫০ টাকা দরের ২ কেজি চাল দেন—চালওয়ালা দেবেন না। চালওয়ালা বলবেন, ভাই আমাকে ১০০টা টাকা দেন, আমার বিস্কুট দরকার নেই। সত্যটা হলো ১০০ টাকা = ১ প্যাকেট বিস্কুট = ২ কেজি চাল। কিন্তু বাজারের সত্য হলো ১ প্যাকেট বিস্কুট = ১০০ টাকা = ২ কেজি চাল। অর্থাৎ টাকাটা মাঝখানে। অর্থনীতি হলো দৈনন্দিন এ ধরনের কোটি কোটি লেনদেন, যেখানে 'টাকা' হলো বিনিময়ের মধ্যমণি—মাধ্যম। আর যেহেতু সে (টাকা) কোটি কোটি বিনিময়ের মাধ্যম, সেহেতু সে (টাকা) বিনিময়ের সর্বজনীন মাধ্যম। জোরটা তার এখানেই। বিনিময় তো শুধু দ্রব্য-পণ্য-সেবাই হয় না; ঘুষ, প্রভাব—এসবও তো লেনদেনের ব্যাপার। আর এ জন্যই তো "অর্থপূজা" বলা হয়।

(গ) ধরুন, আপনার প্রয়োজন ১০০ টাকার সয়াবিন তেল কিন্তু আপনার ১০০ টাকা নেই, আছে ১০০ টাকার চাল; আর অন্যজনের কাছে আছে ১০০ টাকার সয়াবিন তেল (কিন্তু তার চালের দরকার নেই)। তাহলেও তো আপনি আপনার ১০০ টাকার চাল দিয়ে ১০০ টাকার সয়াবিন তেল কিনতে পারবেন না অথবা সয়াবিন তেল বিক্রেতা আপনার চালের বিনিময়ে আপনাকে সয়াবিন তেল দেবেন না। অর্থাৎ ১০০ টাকার চাল আর সমমানের ১০০ টাকার সয়াবিন তেল লেনদেন হবে না। যদিও ইতিহাসে একসময় এ রকম লেনদেন হতো (যাকে বলে বার্টার ট্রেড) এখন বাজারে এসব হবে না। দরকার টাকা।

(ঘ) ধরুন, আপনার কাছে আপনার শ্রমশক্তি আছে, যা বিক্রি করতে পারছেন না (কারণ আপনার কাজ নেই—আপনি বেকার); কিন্তু আপনার দরকার ৫ কেজি চাল, যা দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি দোকানের পাশ দিয়ে হাজারো ঘুরে যদি বলেনও ভাই আমি শ্রমসক্ষম মানুষ—ভালো মানুষ, আমার ১০০ টাকা নেই দয়া করে ৫ কেজি চাল দিন। লেনদেনভিত্তিক অর্থনীতিতে আপনার মায়াকান্নার দাম নেই। দাম আছে যদি আপনি আপনার শ্রমশক্তি বিক্রি করে ১০০ টাকা উপার্জন করে ওই টাকা নিয়ে ৫ কেজি চালের জন্য দোকানির কাছে ৫ কেজি চাল কেনেন। অর্থাৎ ৫ কেজি চালের সমান শ্রমশক্তি সমান সমান ৫ কেজি চাল নয়। এ শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে উপার্জন করতে পারলেই আপনি বাজারে ৫ কেজি চাল পাবেন—নইলে পাবেন না। কোভিড-১৯-এ বিপর্যস্ত বেকার মানুষের অবস্থা হুবহু এ রকম; তার গায়ে জোর আছে, পেশিতে শক্তি আছে, কাজ করার সক্ষমতা আছে—কিন্তু কাজ নেই; সুতরাং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাজারে তার দাম নেই। এ রকম বেশি সময় চলতে থাকলে তিনি ও তার পরিবার অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকবেন এবং ধীরে ধীরে গায়ের শক্তি, পেশির শক্তি, শারীরিক শক্তি, কাজ করার ক্ষমতাসহ

মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। কোভিড-১৯-এ গত ৬৬ দিনের লকডাউনে (২৬ মার্চ-৩১ মে ২০২০) তার/তাদের অবস্থাটা হয়েছে যা বললাম হুবহু সে রকম।

(ঙ) তাহলে দেখলেন মানুষের কাজ নেই তো খাওয়া নেই। খাওয়া নেই তো বিপন্নতা-অসহায়ত্ব-দুর্দশার শেষ নেই। আপনারা এই অধ্যায়েই দেখেছেন যে কোভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে দেশে ইতিমধ্যে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৭১ জন মানুষ কাজ হারিয়েছেন (lost employment)। এসব মানুষকে কাজ দিতে হবে। সেটা প্রাইভেট সেক্টর খুব একটা দিতে পারবে না। দায়িত্বটা রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকেই নিতে হবে। দরকার কাজ, কাজ, কাজ; আর সেই সাথে নিঃসন্দেহে ন্যায্য-শোভন মজুরি/পারিশ্রমিক।

চ) কাজ দিতে লাগবে টাকা। কত টাকা? সাধারণ জ্ঞান বলে একটা বিশেষ দিনে বাজারে মোট কত টাকার প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করছে ওইদিন বাজারে যা-কিছু বিক্রি হচ্ছে তার মোট বাজারদরের (ধরুন ১ লক্ষ টাকা) ওপর। অর্থাৎ ওইদিন বাজারে থাকতে হবে ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তব অর্থনীতি বুঝতে আরো একটু সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে হবে। ধরুন, বাজারে ১০টা ভিন্ন পণ্য আছে প্রতিটির বাজারদর ২০ টাকা—এ অবস্থায় সাধারণ জ্ঞান বলে—বাজারে মোট ২০০ টাকা (১০ পণ্য x প্রতিটির দাম ২০ টাকা) থাকলেই চলবে। কিন্তু প্রতিটি পণ্য যদি একটা ক্রম অনুযায়ী একের পর এক বিক্রি হয়, তার মানে হবে ওই ২০ টাকা ১০ বার হাত ঘুরল—এই হাত ঘোরাটাই 'টাকার গতিবেগ' (velocity of money)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'টাকার গতিবেগ' হলো ১০। সেক্ষেত্রে বাজারে ১ লক্ষ টাকার সমমানের পণ্য থাকলেও যেহেতু টাকার গতিবেগ (অনেক) ১০, সেহেতু বাজারে মোট ১০ হাজার টাকা থাকলেই চলবে (১ লক্ষ টাকা ÷ ১০)। অর্থাৎ টাকার গতিবেগ যত বেশি হবে, বাজারে তত কম টাকা থাকলেই চলবে; কিন্তু টাকার গতিবেগ কমে গেলে বাজারে বেশি টাকা প্রয়োজন হবে। সুতরাং কোভিড-১৯-এর লকডাউন-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রথম কাজ হলো কাজ হারানো মানুষকে উৎপাদনশীল খাত ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডে কাজ দেওয়া, আর যারা কাজ করবেন তাদের ব্যয় করার সক্ষমতা বাড়ানো (যাতে টাকার মুদ্রাগুণক ও আয় গতিবেগ বাড়ে)। ফলে টাকা কম ছাপালেই হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় টাকা ছাপাতে হবে অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর প্রয়োজন হবে না।[৬]

---

৬ প্রয়োজনীয় টাকা ছাপানোর বিষয়টি একই সাথে দুশ্চিন্তা উদ্রেগকারী এবং জরুরি বিধায় বাজেট প্রণয়নকারী, সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, ফাইন্যানসিয়াল ইঞ্জিনিয়ারসহ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য কয়েকটি তথ্য দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। তথ্যগুলো এ রকম: (১) মোট দেশজ উৎপাদন ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর সংশোধিত হিসেব); (২) ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেয়াদ শেষে স্থিতি: মোট ব্যাপক মুদ্রা (M2) ১১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা (জিডিপির ৫০ শতাংশ), যার মধ্যে সংকীর্ণ মুদ্রা (M1) ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে সংকীর্ণ মুদ্রা, যা **জনসাধারণের হাতে কারেন্সি নোট ও মুদ্রা** আকারে আছে তার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা; আর সংকীর্ণ মুদ্রা, যা তলবি আমানত (অর্থাৎ তলব করলেই পাবেন) হিসেবে আছে তার পরিমাণ ১ লক্ষ ৬ হাজার ৪১১ কোটি টাকা, আর মেয়াদি আমানত হিসেবে আছে ৯ লক্ষ ৮ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা; (৩) রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ছিল ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে); (৪) ২০১৮-এর জুন শেষে ব্যাপক মুদ্রা গুণক (money multiplier) ছিল ৪.৭৫ (রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হয়েছিল); (৫) ব্যাপক মুদ্রার আয়গতি (income velocity of money) ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ছিল ২.০৩ শতাংশ (তথ্য উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (2020) উদ্ধৃত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, পৃ: ৫০, ৫৩-৫৫)। এসব তথ্য বিশ্লেষণে বলা সম্ভব যে মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতিতে টাকা ছাপানো প্রয়োজন (তবে কোনোমতেই 'অতিরিক্ত' নয়) যদি তা সরাসরি উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, যা জিডিপি বৃদ্ধিসহায়ক হয় এবং একই সাথে স্বল্পআয়ী-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধিসহায়ক হয় (যা কোনোমতেই 'বিলাসী' ব্যয় এবং অনুৎপাদনশীল ব্যয় হতে পারবে না); এবং যদি তা ভারসাম্যপূর্ণ বৃদ্ধি করে ব্যাপক মুদ্রার গুণক এবং মুদ্রার আয়গতি; এসব ক্ষেত্রে মেয়াদি আমানতের পরিমাণ ও আচরণ-এর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন (কারণ মেয়াদি আমানত মোট ব্যাপক মুদ্রার প্রায় ৮০ শতাংশ এবং জিডিপির প্রায় ৪০ শতাংশ)।

(ছ) যদি এমনটা হয় যে বেকার মানুষ কাজ পেলেন অর্থাৎ শ্রমশক্তি বিক্রি করে মজুরি পেলেন (টাকা পেলেন), কিন্তু জিনিসপত্তের এত দাম (অর্থাৎ যাকে আমরা সবাই বলি মূল্যস্ফীতি) যে তিনি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসও কিনতে পারছেন না। তাহলে কী হবে? এমনটি যদি হয় যখন সবাই বিক্রেতা-সবাই বিক্রির জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কেউই কিনতে (ক্রেতা) চাচ্ছেন না অথবা পারছেন না– তখন ক্রয়-বিক্রয় দুই-ই অচল-স্থবির হয়ে যাবে। তখনই কিন্তু আমরা সবাই বলব সমাজ-অর্থনীতি মহাসংকটে পড়েছে। আসল ঘটনা হলো এই যে অর্থনীতির সংকটকালে পণ্য বিক্রি হয় না (শ্রমশক্তিসহ– যে কারণে বেকারত্ব অথবা 'কাজ হারানো'), সে কারণে টাকা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, আর টাকার গতিবেগও নিঃসন্দেহে কমে যায়। তাহলে প্রথম যে পণ্য বিক্রির কাজটি করতে হবে তা হলো 'মানুষের শ্রমশক্তি', আর তার বিপরীতে রাখতে হবে জীবিকা পরিচালনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য এবং ওসবের দামও হাতের নাগালে রাখতে হবে। এটাই হবে টাকা ছাপানোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

(জ) কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের প্রভাবে মাত্র ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) ইতিমধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের শ্রেণি-অবস্থানগত অধোগতি-নিম্নগামিতা ঘটেছে (উপ-অধ্যায় ৮.৫-এ দেখিয়েছি)। এর অর্থ কী? তার সহজ-সরল সত্য অর্থ হলো এই ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের মোট ব্যয়ের পরিমাণ (total expenditure) কমে গেছে। কিন্তু দেশের জাতীয় আয় (national income, জিডিপি) ও কর্মসংস্থান (employment) তো নির্ভর করে মোট ব্যয়ের ওপর, যা লকডাউনে ব্যাপক কমে গেছে। আর দেশের মোট ব্যয় কমে যাওয়ার অর্থ জিনিসপত্রের চাহিদা (demand) কমে গেছে। আর যখন এটা ঘটে অর্থাৎ মোট চাহিদা (aggregate demand) কমে, তখন তো উৎপাদনও কমে, কর্মসংস্থানের/কাজের সুযোগ সংকুচিত হতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই জিডিপি/জাতীয় আয় নিচের দিকে নামতে থাকে। কোভিড-১৯-এর লকডাউনের প্রভাবে অবস্থাটা তাহলে এ রকম: ভোগ ব্যয় ও ভোগ প্রবণতা নেমে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটছে না—আপাতত সম্ভাবনাটাও কম— তাহলে জিডিপিসহ মোটামুটি পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়ানোর কোনোই বিকল্প নেই। এ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভবত অন্যতম উপায় (অন্যান্য উপায়ের কথা আমাদের প্রস্তাবিত অন্য তিনটি 'হস্তক্ষেপ' মেকানিজমে উল্লেখ করেছি) হলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা ছাপিয়ে সরকারের হাতে দেওয়া, যা সরকার এমন কর্মসৃজন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করবে, যার ফলে মোট সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি হয় (সঞ্চয় নয়)। আর সেটা সম্ভব একমাত্র কর্মহীন দরিদ্র নারী পুরুষকে উৎপাদনশীল পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে। এ হলো পরিপূরক ব্যয় (বা compensatory spending)। রাষ্ট্র এই ব্যয় করবে ততক্ষণ, যতক্ষণ ব্যক্তিগত ব্যয় বাড়তে থাকবে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে থাকবে। আর পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানোমাত্রই রাষ্ট্র এই ব্যয় বন্ধ করে দেবে। ততক্ষণে জিডিপি ও জাতীয় আয়ও উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে।

তাহলে কোভিড-১৯-এর লকডাউন-উদ্ভূত বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক মডেলের চতুর্থ হস্তক্ষেপ-উপাদানে (component of intervention) আমরা যে প্রয়োজনানুযায়ী টাকা ছাপানোর কথা বলেছি আশা করি তার পেছনের যুক্তিটি স্পষ্ট। আবারও বলি, অতিরিক্ত টাকা ছাপানো নয়। আমাদের মতে, প্রয়োজনীয় ছাপানো টাকার মূল উদ্দিষ্ট হবে কোভিড-১৯-এ লকডাউনকালে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) দেশের গ্রাম-শহরে ইতিমধ্যে যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ দরিদ্র হয়েছেন এবং (আনুমানিক) ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন, এসব মানুষের মধ্যে প্রযোজ্য সবার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সরকারের মাধ্যমে ব্যাপকোভিডত্তক শ্রমঘন (labour intensive) পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচি চালু করা। এসবের মধ্যে থাকবে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচাপাকা রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রধানত কাঁচা রাস্তায় মাটি ভরাট, কাঁচাপাকা রাস্তার দুই পাশে মাটি সরে গেলে তা ভরাট করা, রাস্তার পাশের আগাছা পরিষ্কার করা),

বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, হাওরে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য জেলে সমবায়, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণকাজ—রাস্তা, বাঁধ, স্কুলঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র-হাসপাতাল, মুজিববর্ষে গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুত কাজ, মেগাপ্রজেক্টে কায়িক শ্রম, নদীখনন, পুকুর-দিঘিখনন প্রভৃতি।

উপরে উল্লেখিত সবকিছু বিবেচনায় আমরা হিসাব করে দেখেছি যে আমাদের দেশে গ্রাম ও ইউনিয়নের মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার কাঁচা ও পাকা রাস্তার সারা বছর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকাজে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৯১৯ জন দরিদ্র নারীকে পূর্ণ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া সম্ভব– যাতে সরকারের বাৎসরিক ব্যয় হবে আনুমানিক মাত্র ২ হাজার ২৭১ কোটি টাকা। গবেষণায় দেখা গেছে যে এ ধরনের কর্মসূচির অর্থনৈতিক ব্যয়-লাভ অনুপাত ১ ঃ ২, অর্থাৎ ১ টাকা ব্যয় করলে ২ টাকা রিটার্ন আসে। আর সামাজিক ব্যয়-লাভ অনুপাত হিসেব করলে রিটার্ন হবে কয়েকগুণ বেশি।[৭] ঠিক একইভাবে আমরা হিসেব করে দেখেছি যে দেশের মোট ১৬ হাজার ২৬১ কিলোমিটার বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কমপক্ষে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৬১০ জন নারী-পুরুষকে (কাজের ধরনভেদে, প্রতি কিলোমিটারে ১০ জন করে) পূর্ণ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া সম্ভব, যাতে সরকারের ব্যয় হবে আনুমানিক মাত্র ১ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা; আর সরাসরি উপকৃত হবেন কমপক্ষে ৬৬ লক্ষ খানার সদস্য (সারণি ৭ দেখুন)। গ্রামীণ কাঁচাপাকা রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে যেসব দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থান হবে, তাতে খানার সদস্যসহ মোট ১০ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হবে (খানাপ্রতি সদস্যসংখ্যা ধরা হয়েছে ৪.০৭ জন)। এ ছাড়াও আমাদের হিসেবে দেশের সর্বমোট ৪২৩টি হাওরের ২১ লক্ষ ২১ হাজার একর জলা-জমিতে কমপক্ষে ৪২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৪৪ জন জলামালিকানাহীন দরিদ্র প্রকৃত জেলেকে ২ লক্ষ ১২ হাজার ১৩২টি সমবায়ী গ্রুপে সংগঠিত করে তাদের সারা বছরের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে সরাসরি উপকৃত হবেন ওইসব জলা মালিকানাহীন জেলে সম্প্রদায়ের পরিবারের কমপক্ষে ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৬১ জন সদস্য।[৮] এর ফলে একদিকে যেমন ওইসব পরিবারের দারিদ্র্য ঘুচবে, অন্যদিকে দেশ পাবে মৎস্যসম্পদ। সরকারের সহযোগিতা যতটুকু লাগবে, তা হলো ওইসব খাসজলা ওদের লিজ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা, মৎস্য বাজারজাতকরণের জন্য সহযোগিতা করা।

---

৭ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র নারীদের কর্মদল মজুরির বিনিময়ে যে গ্রামের রাস্তা মেরামত ও সংরক্ষণ করেন, তাতে যা আর্থিক ব্যয় হয় তার চেয়ে লাভ বা রিটার্ন অনেক বেশি। আর সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করলে রিটার্ন হয় ব্যয়ের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি (বিস্তারিত দেখুন, Chowdhury, A. U., Barkat, A., Williams, D. B. C., Baker, J., Poddar, A., Majid, M., Sabina, N., Rahman, M., & Hoque, S. (2006). Social and Economic Cost-Benefit Analysis of Rural Maintenance Programme (RMP); Barkat, A., Halim, S., Mahiyuddin, G., Poddar, A., Mohiuddin, H. M., & Hoque, S. (2006). Well-being Status of Graduated Rural Maintenance Programme (RMP) Women Study. ঠিক একই ধরনের উচ্চ সামাজিক ব্যয়-লাভ অনুপাত দেখা যায় মানুষের ভৌত-নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিনিয়োগ করলে (বিস্তারিত দেখুন, Barkat, A., Khandoker, M.S.H., Mahiyuddin, G., Ahmed, F.M., & Nurunnahar. (2019). Socio-economic Dimensions of Police Work in the Society: An Impact Analysis).।

৮ মোট হাওরের সংখ্যা ও হাওর অঞ্চলের জল-এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চিফ মনিটরিং অফিস থেকে। হিসেবের ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে (১) প্রতি ১০ একর হাওরে একটি করে ২০ জনের গ্রুপ হবে, (২) খানার সাইজ ৪.০৭ জন। হাওর অঞ্চলের মানুষকে হাওরের উপর তাদের যৌথমালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে শোভন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে যে হাওরাঞ্চলের মানুষের চরম দারিদ্র্যাবস্থার নিরসন হবে এবং একই সাথে দেশে হাওরের মাছ সরবরাহ বৃদ্ধিসহ জল-জলায় প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্ভব এসবই গবেষণায় সুপ্রমাণিত (দেখুন, Barkat, A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). A Study on Haor Governance and Haor Dweller's Rights in Bangladesh).।

সারণি ২: পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচির আওতায় সরকারি উদ্যোগে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচা ও পাকা রাস্তা এবং দেশের সকল বাঁধ নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দরিদ্র মানুষের সারা বছরের কর্মসংস্থান সম্ভাবনা ও সরকারের অনুমিত ব্যয়

গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঁচা ও পাকা রাস্তা এবং দেশের সব বাঁধ সারা বছর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	কর্মনিয়োজন		মোট মজুরি বছরে (কোটি টাকায়)
		পদ্ধতি	মোট কর্মীসংখ্যা	
গ্রাম ও ইউনিয়নের সকল কাঁচা ও পাকা রাস্তা	৩১৫,৫০০	প্রতি ১২ কিলোমিটারে ১০ জনের গ্রুপ (প্রধানত নারী)	২৬২,৯১৯	২২৭১.৬২
বাঁধ	১৬২৬১	প্রতি ১০ জনের দায়িত্বে ১ কিলোমিটার	১৬২,৬১০	১৪০৪.৯৫
সর্বমোট	-	-	৪২৫,৫২৯	৩৬৭৬.৫৭

হিসেব পদ্ধতি: মোট রাস্তার তথ্য নেওয়া হয়েছে স্থানীয় সরকারপ্রকৌশল বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে, আর বাঁধের তথ্য নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চিফ মনিটরিং অফিস থেকে। কর্মনিয়োজন পদ্ধতি ও মজুরিসংশ্লিষ্ট তথ্য নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল থেকে। মজুরির হার হিসেবের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি বিবেচনা করা হয়নি। মূল্যস্ফীতি বাড়লে মজুরির জন্য বরাদ্দও অনুরূপ হারে বাড়বে।

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে কোভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউন অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষকে ব্যাপকভাবে কর্মহীন করেছে। এসব মানুষের কাজ দরকার। নারী-পুরুষনির্বিশেষে এসব মানুষ কর্মবীর। মুনাফালোভী প্রাইভেট সেক্টর এসব মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি করতে পারবে না। দায়িত্বটা নিতে হবে সরকারকেই। আর সেক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনে যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছি, সে মোতাবেক টাকা ছাপানোর প্রয়োজন হলে ছাপতে অসুবিধা নেই। মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ অর্থনীতির সহজ পাঠই তো লেনদেন প্রবাহ সচল রাখা। এ প্রক্রিয়ায় মানুষ শ্রম দেবে; সৃষ্টি-পুনর্সৃষ্টি করবে অবকাঠামো, যে অবকাঠামো প্রচলিত অর্থের অর্থনৈতিক উন্নতিসহ মানুষের জীবনসমৃদ্ধির ভিত্তি শক্তিশালী করবে—বিনিময়ে সরকার ওই মানুষকে দেবে শ্রমের মূল্য। আর শ্রমজীবী মানুষ ওই মজুরি ব্যয় করবে—একের ব্যয় তো অন্যের আয়। বাস্তব অর্থনীতি তো প্রবাহ—লেনদেন প্রবাহ। এ প্রবাহ নিশ্চিত করতে যা করা লাগে সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। আর অন্যদিকে মানুষ কর্মে নিয়োজিত থাকলে তার জন্য তো বেকার ভাতাজাতীয় কোনো ব্যবস্থাও দরকার হবে না। নিঃসন্দেহে বেকার ভাতার চেয়ে শ্রমের মূল্য— শ্রমদাতা ও সরকার—দুই পক্ষের জন্যই সম্মানজনক।

৬. উপসংহার

অর্থনীতিতে 'প্রবাহ' ধারণাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে মূল্যসংকোচনমূলক-ব্যয়সংকোচনমূলক (deflationary) তিনটি কর্মপদ্ধতি অথবা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (state interventions)—(১) খরচ কমানো বা ব্যয় সংকোচন করা, (২) ঋণভার কমানো অথবা ঋণ পুনর্গঠন করা, (৩) ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে পুনর্বণ্টন, আর তারই পাশাপাশি একই সময়ে মূল্যস্ফীতিমূলক কর্মপদ্ধতি—(৪) প্রয়োজনে টাকা ছাপানোর যুক্তিযুক্ত-বৌদ্ধিক 'সুন্দর ভারসাম্যকরণটাই' হবে কোভিড-১৯-এর মহা-আঘাত থেকে সমাজ ও অর্থনীতিকে তুলনামূলক কম পীড়াদায়ক, তুলনামূলক মসৃণ পথে উত্তরণ ঘটানোর শ্রেষ্ঠ পথ।

আমাদের প্রস্তাবিত "শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট মডেল"-এ প্রস্তাবিত চার কর্মপদ্ধতিভিত্তিক সরকারি হস্তক্ষেপ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে প্রতিফলিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। সরকারের আয়ের উৎস (সম্পদের উৎস) ও ব্যয় খাতে বরাদ্দ/সম্পদের ব্যবহার নির্ধারণে উল্লিখিত চার কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ জরুরি। আমাদের প্রস্তাবিত মডেল–ব্যয়সংকোচনমূলক/মূল্যসংকোচনমূলক এবং মূল্যস্ফীতিমূলক কর্মপদ্ধতির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভারসাম্য স্থাপন করে প্রয়োগ করলে নিঃসন্দেহে তা একদিকে কোভিড-১৯-এ প্রভাব-অভিঘাতে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক মহাবিপর্যয় রোধে, আর অন্যদিকে আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

অর্থনৈতিক মহামন্দা ও কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণ এবং শোভন জীবনব্যবস্থা—শোভন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিনির্মিত আমাদের প্রস্তাবিত মডেলের চারটি মৌল উপাদান হলো মূল্যসংকোচনমূলক (deflationary অর্থাৎ যখন জিনিসপত্রের দাম কমবে) এবং মূল্যস্ফীতিমূলক (inflationary)—এই দুই সচেতন কর্মপদ্ধতির-হস্তক্ষেপমূলক কর্মসূচির (mechanism and intervention programmes) সমাহার। আমরা জোর দিয়ে বলেছি যে এই দুয়ের 'সুন্দর ভারসাম্যকরণই' হবে শ্রেষ্ঠ সমাধান; কারণ অন্য কোনো সমাধান নেই। এখানে সাবধান করা প্রয়োজন যে এসবে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি হবে—"উদ্ধার করলেন→ব্যর্থ হলেন→জেলে গেলেন" (bailed-failed-jailed) ধরনের। কারণ মনে রাখা জরুরি যে ১৯২৯-৩০-এর মহামন্দায় কিন্তু কোনো মূল্যস্ফীতি ঘটেনি—উল্টো জিনিসপত্তরের দাম কমেছিল, মজুরি বেড়েছিল পরপর তিন বছর ১০ শতাংশ হারে; ফলে যা হবার ঠিক তা-ই হয়েছিল—ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমে গিয়েছিল, ওদের ঋণের প্রকৃত মূল্য বেড়ে গিয়েছিল, ওরা কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছিল—ফলে শেষপর্যন্ত শুরু হয়েছিল 'মূল্যসংকোচন/মূল্যহ্রাস চক্র' (যাকে বলে deflationary cycle, currency crisis)। কোভিড-১৯-পরবর্তীকালে এটাই সম্ভবত হতে চলেছে বিশ্বের অনেক ধনী দেশে, যাদের জাতীয় ঋণভার বেশি (যেমন জাপান, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো বহু দেশে)। আবার অতিরিক্ত টাকা ছাপানোর ফলে হবে মূল্যস্ফীতি—জিনিসপত্তের দাম বাড়বে, শেষপর্যন্ত সৃষ্টি হবে 'মূল্যস্ফীতি চক্র' (যাকে বলে inflationary cycle)। মূল্যসংকোচন/হ্রাস চক্র এবং মূল্যস্ফীতি চক্র—উভয়ই খারাপ—খুব খারাপ। আর সে কারণেই আমাদের প্রস্তাবিত মডেলে আমরা সাবধান করে বলেছি যে এ দুয়ের সুন্দর ভারসাম্যকরণ করতে হবে। যোগ্যতা-দক্ষতা-জ্ঞানসমৃদ্ধতাসহ গভীর দেশপ্রেম ও নির্মোহ সাহস ব্যতীত এ কাজটি করা প্রায় অসম্ভবই।

নির্বাচিত তথ্যসূত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১। ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৯), *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*। ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বারকাত, আবুল (২০২০), *করোনা ভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র।* ঢাকা: মার্চ ৩০, ২০২০। Retrieved from https://www.hdrc-bd.com/coronavirus-19-shambhabbo-onishchoyota-o-koronio-kolpochitro-by-prof-abul-barkat-year-2020/

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., ও আহমেদ, জামালউদ্দিন (২০২০), *করোনা (কোভিড-১৯)-র মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা*। ঢাকা: জুন ০৮, ২০২০।

বারকাত, আবুল (২০২১), *করোনা ভাইরাস: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র*। বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি। খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ১১৫-১২৪।

Barkat, A., et. al. (2006). *Well-being status of graduated rural maintenance programme (RMP) women study.* Prepared for CARE Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Barkat. A., et. al. (2019). *Socio-economic dimensions of police work in the society: An impact analysis.* Prepared for Police Staff College Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). *A study on haor governance and haor dwellers' rights in Bangladesh.* Prepared for ALRD Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Bangladesh Bank. (2020). *Annual report 2019 (July 2018-June 2019).* Dhaka, Bangladesh: Author.

Chowdhury, A. U., Barkat, A., Williams, D. B. C., Baker, J., et. al. (2006). *Social and economic cost-benefit analysis of rural maintenance programme (RMP).* Prepared for CARE Bangladesh. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC).

Johns Hopkins & Nuclear Threat Initiative. (2019). *Global Health Security (GHS) index: Building collective action and accountability* (pp. 24–130). Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Health Security & NTI: Building a Safer World. October 2019.

Radermacher, F. J. (2004). *Global marshall plan: A planetary contract for a worldwide eco-social market economy.* Global Marshall Plan Initiative (Ed.), July 2004. Hamburg: Global Marshall Plan Initiative.

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ৪৯-৬৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কালোটাকা ও অর্থপাচার: বাংলাদেশে দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত*

১. বড়ই স্পর্শকাতর এবং স্বল্পগবেষিত বিষয় নিয়ে আমার প্রবন্ধ। বিষয় শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

২. 'কালোটাকা' (Black Money) ও 'অর্থ পাচার' (Money Laundering) উভয়েরই মূলে আছে 'দুর্নীতি' (Corruption)। কালোটাকার অর্থনীতি (Economics of Black Money) ও অর্থপাচারের অর্থনীতি (Economics of Money Laundering) উভয়ই 'দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি'র (Politcal Economy of Corruption) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদি তাই-ই হয়, তাহলে দুর্নীতির (Corruption) একটা কার্যকর সংজ্ঞা অথবা ধারণাকাঠামো বিনির্মাণ জরুরি (যদিও কাজটি জটিল)।

বড় পর্দায় দুর্নীতি বলতে আমরা সবাই বুঝি নীতিগর্হিত কিছু একটা অথবা বুঝি সেই প্রক্রিয়া অথবা কাজ (act অর্থে) যা বিশ্বাস বা আস্থা-লঙ্ঘন করে (violation of trust)। আর এই আস্থা-বিশ্বাস লঙ্ঘনের পেছনে নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো 'অনুপ্রেরক' (trigger/incentive) কাজ করে।

৩. দুর্নীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। দুর্নীতি যদি হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের অন্তঃজাত-অন্তর্নিহিত (inherent অর্থে) প্রাকৃতিক বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে দুর্নীতির উৎস-কারণ অনুসন্ধান অমূলক হবে। সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে অ্যাডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতাভিত্তিক ব্যবস্থা' (system of natural liberty) বিশ্বাসতত্ত্বে। যে বিশ্বাসতত্ত্ব বলে যে (১) 'প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করবে', 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও সামাজিক শৃঙ্খলা-সংহতি গড়ে উঠবে', (২) 'এক অদৃশ্য হাত বাজারব্যবস্থার মধ্যস্থতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে', (৩) 'সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাটা একাধারে প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয়', (৪) 'পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত'। অ্যাডাম স্মিথের এসব কথা ঠিক হলে দার্শনিক টমাস

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইলঃ barkatabul71@gmail.com

বেকন (১৫১২-১৬৬৭) অর্জনপ্রবণ-মুনাফাকেন্দ্রিক-ক্রয়-বিক্রয়প্রধান অর্থনীতি দেখে যে বললেন 'যেসব ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুসন্ধানে লিপ্ত তারা হলেন লোভী, মেষপালক আর রাখাল স্বভাবের ভদ্রলোক'—এ কথার কী হবে? কী হবে দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬), যিনি বললেন যে 'সম্পত্তির অধিকার (ব্যক্তিগত মালিকানা) কোনো প্রাকৃতিক অধিকার নয়?' কী হবে কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) উত্তরণশীল আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বের, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের, শোষণ-বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক স্বার্থসহ শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বের, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রাকৃতিক অবসানের তত্ত্বের, পুঁজিবাদে পণ্য উৎপাদনের সর্বজনীনতার তত্ত্বের, পণ্যের বিনিময়মূল্য নিরূপণে বিমূর্ত শ্রমের তত্ত্বের, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন তত্ত্বের? এসব বিশ্লেষণে না গিয়ে সরাসরি বলা সঙ্গত যে 'স্বার্থপরতা', 'নিজস্বার্থ' 'স্বস্বার্থ' চরিতার্থ করার প্রবণতা, অর্থপূজা হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের স্বভাবজাত নয় এবং নয় তা প্রাকৃতিক। উল্টো 'স্বার্থপরতা' হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো যৌথভাবনা, যৌথচিন্তা, যৌথ শ্রম, যৌথ উৎপাদন, যৌথসমাজ। সুতরাং দুর্নীতি হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের সহজাতও নয় এবং নয় তা প্রাকৃতিক।

৪. দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির উৎস কথা

'দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political economy of corruption) নিয়ে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান গভীর ভাবনা নেই বললেই চলে। দরিদ্র কৃষক সলিমুদ্দি-সখিনা-যদু-মধু তারা সবাই তাদের শ্রম-উৎপাদিত কৃষিপণ্য তুলনামূলক সস্তায় মধ্যস্বত্তভোগীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন—অর্থাৎ কৃষক দুর্নীতি করতে পারেন না, তার পণ্য নিয়ে দুর্নীতি করে মধ্যস্বত্তভোগীরা। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য গার্মেন্টস-টেক্সটাইলসহ সবধরনের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, যদি তারা শোষণভিত্তিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির কোনো কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হন।

রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের (নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগ) হেন প্রত্যঙ্গ নেই, যেখানে দুর্নীতি নেই। এতক্ষণ যা বললাম এসবের অর্থ এই-ই নয় যে দুর্নীতি সার্বজনীন (universal)। একটি দেশের কত শতাংশ মানুষ সরাসরি দুর্নীতি করেন এ ধরনের কোনো পরিসংখ্যান পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীতে সময়কালনির্বিশেষে একটি দেশও পাওয়া যাবে না যেখানে মোট অশিশু-জনসংখ্যার (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যায় শিশুদের বাদ দিয়ে, কারণ দুর্নীতিবিচারে তারা প্রযোজ্য নয়) ৫ শতাংশের বেশি দুর্নীতি করেন। তাহলে দুর্নীতি সার্বজনীন (corruption is universal)—এ কথা কোনো দিনই সত্যি ছিল না এবং কোনো দিনই সত্যি হবে না।

দুর্নীতি যে মানুষের স্বভাবজাত বিষয় নয়, নয় তা প্রাকৃতিক—এসবই নিরঙ্কুশ সত্য (absolute truth); অর্থাৎ দুর্নীতির উৎস খুঁজতে হবে মানুষ যে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোতে বাস করে সেখানে, অন্যত্র নয়।

দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ নিয়ে গুরুত্ববহ তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। দুর্নীতির সাধারণ সংজ্ঞা সবাই জানেন অথবা দুর্নীতি কী সবাই বোঝেন—এটা ধরে নিয়েই কালোটাকা ও অর্থ পাচার বিষয়ে যাবার আগে দুর্নীতি নিয়ে দু-একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি।

আমি এ দেশে দু ধরনের দুর্নীতি দেখি: *পেটি দুর্নীতি* (যা ছোট দুর্নীতি) আর *মহাদুর্নীতি* (বড় দুর্নীতি)। পেটি দুর্নীতি হলো: বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টিকারী সমাজে পেটের দায়ে কোনোমতে সংসার পরিচালনের

জন্য ব্যয় সংকুলানে "বাজারের অদৃশ্য হাতের কারসাজি" আয়ের এক পদ্ধতি (যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে ওই ব্যক্তিটিও মানসিক স্বস্তিতে নেই)। এসব আদৌ রেন্টসিকিং নয়। মহাদুর্নীতির তুলনায় পেটি দুর্নীতির পরিণাম সমাজ-অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক জীবনে সম্ভবত তেমন কোনো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে না। আসলে এসব পেটি দুর্নীতিকে উদ্বুদ্ধ করে বড় দুর্নীতিবাজরাই, যারাই আসল 'রেন্ট-সিকার'। এই সিস্টেমও তারাই সৃষ্টি করেছেন—দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি পুনঃসৃষ্টির উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে। আসলে বড় মাপের জাতীয় বিধ্বংসী দুর্নীতিবাজরা উপরতলার পরজীবী-বিত্তবান 'রেন্ট-সিকার'—এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ অন্যের বিত্ত-সম্পদ দখল, বেদখল, জবরদখল, হরণ, গ্রহণ, অধিগ্রহণসহ আত্মসাৎই তাদের মূল পেশা ও নেশা—লোভের লাভ এখানে বড় কথা। এসব 'রেন্ট-সিকার' কখনো উচ্চকণ্ঠে বলবেন না 'দুর্নীতি দূর হোক' আর সেটা 'রেন্ট-সিকার' হবার কারণেই। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের অনুপার্জিত-হরণকৃত বিত্তের সিস্টেমটাই ভেঙে পড়বে, আর সেই সাথে বিত্তের বৃহৎ অংশ কর-রাজস্বের প্রগ্রেসিভ নীতির মাধ্যমে হাতছাড়া হয়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং 'দুর্নীতি' নিয়ে বড় কথা বলে লাভ নেই। এ কথা বলেও লাভ নেই যে যেহেতু এই দেশে দুর্নীতি এখন একই সাথে অনুভূমিক (horizontal) ও উল্লম্বিক (vertical), সেহেতু অবস্থা খারাপ। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ভিত্তি-কারণ কাঠামোটা ভেঙেই দেখুন না দুর্নীতি কোথায় যায়!

৫. কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস ও পরিমাপ-পরিমাণ

অর্থনীতিবিদরা কালো অর্থনীতি বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের সমার্থক প্রত্যয় (category) ব্যবহার করে থাকেন। যেমন ভূগর্ভস্থ (subteranean or underground) অর্থনীতি, চোরাগুপ্তা-লুক্কায়িত (hidden) অর্থনীতি, ছায়াচ্ছন্ন (shadow) অর্থনীতি, জলতলস্থিত (submerged) অর্থনীতি, সমান্তরাল (parallel) অর্থনীতি, অনিয়মিত (irregular) অর্থনীতি, অনানুষ্ঠানিক (informal) অর্থনীতি, গোধূলি (grey) অর্থনীতি, দ্বিতীয় স্তরের (second line) অর্থনীতি ইত্যাদি। একই 'কালো অর্থনীতি' বোঝাতে যত ধরনের প্রত্যয়ই ব্যবহৃত হোক না কেন কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হলো সেসব লেনদেন (transactions), যা দেশের প্রচলিত নিয়মকানুন অনুযায়ী বিধিসাপেক্ষে নয়; অর্থাৎ যা অর্থনীতির সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সরকার যেসব নিয়মকানুন প্রচলন করেছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অথবা তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারিভাবে গৃহীত যেসব বিধিকে উপেক্ষা করে সেগুলো হলো প্রধানত শুল্ক ও কর বিধি, লাইসেন্সিং নিয়মকানুন, শ্রম স্টান্ডার্ড ইত্যাদি। কালো অর্থনীতিক কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকা—অবৈধ এবং সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়। কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মনুষ্য মূল্যবোধের ধার ধারে না এবং নৈতিকভাবে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

কালো অর্থনীতির বিপরীতে আমরা সাধারণত যে অর্থনীতির কথা বলি তা হলো বৈধ, প্রচলিত, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি। প্রচলিত (conventional) অর্থনীতিতে যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনদেনের প্রচলন আছে, তার তুলনায় কালো অর্থনীতির লেনদেনের কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। **কালো অর্থনীতির লেনদেন অনিয়ন্ত্রিত (unregulated), কালো অর্থনীতির লেনদেন করারোপিত নয় (untaxed) এবং কালো অর্থনীতির লেনদেন পরিমাপ করা হয় না (unmeasured)। কারণ ওইসব লেনদেন নথিভুক্ত নয় (working off the books)।**

আমার মতে, **কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল সূত্রটি এ রকম—অর্থ কালো হতে পারে দুটি শর্ত পূরণ করলে** (এসব দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্যও সমান প্রযোজ্য)—**প্রয়োজনীয় শর্ত**

(necessary condition) ও পর্যাপ্ত শর্ত (sufficient condition)। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হওয়ার মানে টাকা কালো হওয়ার সম্ভাবনাটি সৃষ্টি হওয়া মাত্র। বিভিন্ন ঐতিহাসিক অর্থনীতি ব্যবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি ব্যবস্থা 'পণ্য-অর্থ' সম্পর্কাধীন (money-commodity relations) কি-না তার ওপরই নির্ভর করছে অর্থ কালো হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থনীতি ব্যবস্থা পণ্য-অর্থ সম্পর্কাধীন হলে (যা সামাজিক শ্রমবিভাজনের অনিবার্য পরিণতি) যা-কিছু উৎপাদিত হবে তা পণ্য (commodity) হিসেবেই উৎপাদিত হবে এবং তা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হবে—অর্থ (money) । এক্ষেত্রে অর্থ কালো হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তটি পূরণ হয়ে যাবে, কারণ অর্থ পুঁজি হিসাবে পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম পালনের বাহন হয়ে যাবে মাত্র। পুঁজির এহেন ধর্মের অত্যন্ত প্রাঞ্জল বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন "*আমাকে ১০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি বিনিয়োগে সম্মত। ২০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি সক্রিয়তর। ৫০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি নিজের বিপদ ডেকে আনতেও কুণ্ঠিত হব না। ১০০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি সবধরনের মনুষ্য মূল্যবোধ বিসর্জনে সম্মত। আর যদি ৩০০ শতাংশ মুনাফা প্রাপ্তির আশা থাকে, তাহলে ফাঁসির রায়ের সম্ভাবনা জেনেও এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমি করব না*"।

'পণ্য-অর্থ' সম্পর্কের উপস্থিতি কালোটাকা উদ্ভবের সম্ভাবনাজনিত শর্তটি পূরণ করে মাত্র—সেটা পর্যাপ্ত (অনিবার্য) শর্ত নয়। কালোটাকা উদ্ভবের **পর্যাপ্ত শর্ত** হলো বিশেষ ধরনের উৎপাদনপদ্ধতির প্রাধান্যবিশিষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থা। আর তা হলো উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক এমন অর্থনীতি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন সার্বজনীন রূপ লাভ করে—পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিকাঠামো ও উপরিকাঠামো উভয়েই কালোটাকার (দুর্নীতিরও) উৎপত্তি ও বিকাশে পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং 'পণ্য-অর্থ' সম্পর্ক (কালোটাকার ও দুর্নীতির জন্মের প্রয়োজনীয় শর্ত) যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সর্বজনীনতা লাভ করে, সেই ব্যবস্থাটিই কালোটাকার ও দুর্নীতির উদ্ভব ও বিকাশের প্রধান গ্যারান্টিদাতা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কালোটাকা বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজির রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচারে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

কালো অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহ হলো: ড্রাগসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যের বাজার ড্রাগ ডলার, ডার্টি মানি, মাফিয়া মানি, অস্ত্রের বাজার, অর্থ পাচার, মানব পাচার (আসলে দাস শ্রম পাচার), সকল ধরনের অবৈধ ব্যবসায়িক চুক্তি, ছোট-বড় ব্যবসায়ের কমিশন দালালি, ঘুষ, মজুদদারি, কালোবাজারি, জুয়া-ক্যাসিনো, বিভিন্ন ধরনের মাস্তানি-চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, রাষ্ট্রের কর ও করবহির্ভূত আয় ক্ষেত্রসমূহকে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রের সাথে জড়িত সবাই অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্র। যেমন ড্রাগসহ বিভিন্ন মাদক উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিক ও তার দালাল-মাদক চোরাচালানকারী ও তার সাথে সম্পর্কিত সবাই এবং মাদক ব্যবসায়ী (যারা মাদক ভোক্তার সাথে বিভিন্ন স্তরে সম্পর্কিত)—এরা সবাই কালোটাকার মালিক। এদের সাথে আবার উপরিকাঠামোর অনেকেই বিভিন্নভাবে জড়িত থাকেন, যেমন রাষ্ট্র পরিচালক (প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, আমলা), আইনপ্রণেতা (পার্লামেন্ট ও সিনেট সদস্য), আইন রক্ষাকারী বাহিনী ও গোপন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি, দেশরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তি, রাজনীতিবিদদের অনেকে, বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি (যাদের ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড প্রধানত পরিচয় বৈধতার কারণেই), দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উর্ধ্বতন নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রের কর ও শুল্ক আহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ, টেলিযোগাযোগ ও পরিবহন খাতের অনেকে। সুতরাং একভাবে বলা যায় যে শাসক শ্রেণি (নিঃসন্দেহে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ নন) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কালোটাকার এবং দুর্নীতির

জন্মদাতা। আর এটাও একটা বড় কারণ যে কেন 'গণতন্ত্র-মুক্ত' জোনে (democracy free zone) বসবাস তাদের এত পছন্দ, কেন তারা গণতন্ত্র (democracy) চান 'demos' (জনগণ)-কে বাদ দিয়ে?

কালোটাকা—কোটিপতিদের পুঁজির আদিসঞ্চয়নেরও (primitive accumulation of capital) মাধ্যম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে অবৈধ পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে শত-কোটিপতি হবার পাঁচটি প্রধান পথ (সবই অবৈধ) হলো নিম্নরূপ:

(১) সরকারি তহবিল, স্টোর ও পতিত সম্পত্তি আত্মসাৎ, তহবিল তছরুপ ও জোরপূর্বক দখল, এবং আমলাদের পক্ষ থেকে পরিতোষণ।

(২) চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, মানবপাচার ব্যবসা, অর্থ পাচার ব্যবসা, মজুদদারি, কালোবাজারি, বিদেশি মুদ্রার অবৈধ ব্যবসা, আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিং, রপ্তানিতে আন্ডার ইনভয়েসিং ইত্যাদি ব্যবসার সাথে সম্পর্ক।

(৩) জাতীয়করণকৃত অথবা সরকারি এবং বেসরকারি কমার্শিয়াল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত বিশাল পরিমাণের ঋণ আত্মসাৎ ও তা পরিশোধ না করা।

(৪) রাষ্ট্রের সহায়তায় বিদেশি অর্থায়নে কোটি-কোটি ডলার প্রকল্পের (মেগা প্রকল্পসহ) কমিশন এজেন্সি, বিভিন্ন ক্রয়কাজের দালালি।

(৫) পারমিট লাইসেন্স হস্তান্তর, নিজের পক্ষে আইন প্রয়োগ ও পণ্য-দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়।

উল্লিখিত পাঁচটি প্রধান পথ-পদ্ধতির ঘনীভূত প্রকাশ-প্রত্যয় "রেন্টসিকিং" বা "লুটতরাজ" অর্থাৎ নিজে সম্পদ সৃষ্টি না করে অন্যের সৃষ্ট সম্পদ দখলই আমাদের দেশে শত-হাজার কোটিপতি হওয়ার প্রধান পদ্ধতি। এই অর্থে 'শত-কোটিপতি' ও 'কালোটাকার মালিক'—সমার্থক ধারণামাত্র।

কালোটাকার **উৎপত্তি উৎসকে** পরস্পরসম্পর্কিত **দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়**। প্রথমটি—**"বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকা"**, যা সাধারণ কালো আয় সৃষ্টি করে, আর দ্বিতীয়টি—**"অবৈধ খাত-উদ্ভূত কালোটাকা"** যা চক্রবৃদ্ধি হারে কালো আয়ের জন্ম দেয়।

অর্থনীতির বৈধ (আইনি) খাতের কর্মকাণ্ডে যখন কর-শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়, তখনই সৃষ্টি হয় "বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকা"। আমাদের দেশে বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকার জন্মক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

(১) ইনডেন্টিং, আমদানি, রপ্তানি, নির্মাণ শিল্পের কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট প্রকৃত আয়, মনুষ্যশক্তি রপ্তানি, মানব পাচারের ব্যবসা, চোরাচালান, কালোবাজারি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, জুয়ার আসর-ক্যাসিনো, ব্যবসায়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মূল্যের কারসাজি, তহবিল তছরুপ, ট্রাভেল এজেন্সি, প্রাইভেট হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবসা, প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়), মিডিয়া, ফিল্ম প্রডাকশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-উদ্ভূত অত্যুচ্চ রিটার্ন;

(২) আইনজ্ঞ, প্রাইভেট চিকিৎসক, উপদেষ্টা-পরামর্শদাতা, ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের ব্যতিক্রমী অত্যুচ্চ পেশাগত ফি;

(৩) জমির (কৃষি, অকৃষি, জলা, জঙ্গল) ব্যবসা, ফ্ল্যাটের ব্যবসা, শেয়ারবাজারে সুপার ক্যাপিটাল গেইন ইত্যাদি।

আমাদের দেশে (সম্ভবত বহু দেশেই) অর্থনীতির বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে যেভাবে কালোটাকা সৃষ্টি হয় তার বহু রকমভেদ আছে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিতে অবৈধ আন্ডার ইনভয়েসিং আর আমদানিতে অবৈধ ওভার ইনভয়েসিং করে একদিকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া যায়, অন্যদিকে পুঁজি পাচারও (অবৈধ) করা যায়।

ঘুষ, চোরাচালান, কালোবাজারি, অর্থপাচার—এসব অর্থনীতির বৈধ কোনো খাত নয়। এসব **দুই দিক থেকে অবৈধ:** প্রথমত, খাতটি নিজেই আইনগতভাবে অবৈধ, দ্বিতীয়ত, এই খাতে যা উৎপন্ন হয়, লেনদেন হয় পুরোটাই অবৈধ। অবৈধ খাতে কালোটাকা সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টি হয় যেসব ক্ষেত্রে তার মধ্যে আছে বৈদেশিক মুদ্রার বেআইনি লেনদেন, অর্থপাচার, চোরাচালানি, ভেজাল ও নকল দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, গোপন কারখানা স্থাপন, ওজন ও মাপে কম দেওয়া, পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায় নিচু মানের নির্মাণকাজ, সিকিউরিটিজ মার্কেটে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, রেজিস্ট্রেশন ফি ফাঁকি দেওয়ার জন্য সম্পদের (জমি, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি) দাম কম দেখানো, ঘুষ, চোরাচালান, মানব পাচার, ব্যবসায়ে সিন্ডিকেট গঠন করে মূল্য নিয়ে কারসাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, অবৈধ জুয়ার আসর (ক্যাসিনো ইত্যাদি), তহবিল তছরুপ, অবৈধ কমিশন প্রাপ্তি, স্বজনপ্রীতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাগ পাওয়া এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের পক্ষে কোনো নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘুষ প্রদান করেন। অথবা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা রাজনীতিবিদ ও তদবিরকারীদের মধ্যস্থতায় নিজেদের বেআইনি-নীতিগর্হিত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আমলাদের প্রভাবান্বিত করেন। এ হলো অর্থবিত্ত দিয়ে (ঘুষ দিয়ে) অথবা প্রভাব খাটিয়ে রেন্ট-সিকারদের দ্বারা 'নিয়ন্ত্রকসংস্থা কবজাকরণ' (regulatory capture)। রেন্টসিকার-লুটেরাদের প্রাধান্যের আমলে উল্লিখিত যোগসূত্র সমগ্র কালোটাকার সেক্টরের রক্ষাকবজ হিসেবেই কাজ করে।

কালোটাকার বিমূর্ত উৎসসমূহ যেমন একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত তেমনি সকল উৎসের ওপর কর্তৃত্ব করছে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিসহ রেন্টসিকিং ব্যবস্থা, যা আবার সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি-পুঁজি ও আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির বিকাশেরই ফল, তারই স্থানীয় এজেন্ট। সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি যা চায় তা হলো পৃথিবীর যেখানে যত উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হবে তা পুনর্ব্যবহার উপযোগী করার (recycle) নিঃশর্ত অধিকার। আর এ কাজটি যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যের ওপর প্রযোজ্য তেমনই কালোটাকার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে মোট কালোটাকার পরিমাণ কত তা কারো জানা নেই।

বাংলাদেশে কালোটাকার বিস্তৃতি পরিমাপের জন্য আমি এমন একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি, যেখানে গবেষণা ব্যয় তুলনামূলক কম এবং যার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে মোটামুটিভাবে প্রবণতাসূচক ধারণা পাওয়া যাবে এবং কালোটাকার সম্ভাব্য পরিমাণটাও নিরূপণ করা যাবে (পদ্ধতিগত বিষয়াদি সঠিক হলে)।

বাংলাদেশে কালোটাকার বিস্তৃতি পরিমাপের জন্য আমাদের পদ্ধতিকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সম্মিলন বলা যেতে পারে। এ পদ্ধতির সাহায্যে কালোটাকা উদ্ভবের বৈধ ও অবৈধ খাত এবং খাতভুক্ত সব আইটেমের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। বৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত প্রতিটি খাতের ক্ষেত্রে আমরা সর্বশেষ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের (একটি অর্থবছরের হিসেব করেছি; কোভিড-১৯-এর কারণে ২০১৯-২০-এর হিসেব করিনি) জন্য যা নির্ণয় করতে চেয়েছি, তা হলো "সরকার রাজস্ব আয় বাবদ যে অর্থ পেয়েছে সেটা সম্ভাব্য যা পাওয়া উচিত ছিল (কালোটাকার প্রচলন না থাকলে) তার কতটুকু/কত শতাংশ"। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরকারের রাজস্ব আয়ের সকল খাতেই কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে, সুতরাং ওইসব খাত থেকে কালোটাকা সৃষ্টি হয়। সরকারের রাজস্ব আয়ের খাতসমূহের সাথে যারা জড়িত, তারা সবাই 'বৈধ খাতে কর্মরত'। কিন্তু কালোটাকা অবৈধ খাত থেকেও সৃষ্টি হয়। যেমন চোরাচালান, কালোবাজারি, ঘুষ, অর্থপাচার, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, খুন-মাস্তানি-রাহাজানি, জোরপূর্বক অন্যের জমি-সম্পত্তি দখল, মানবপাচার, মাদক ব্যবসা, সিন্ডিকেট ও অন্যান্য অনেক। অবৈধ খাত-উদ্ভূত কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয়ে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি।

'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' উভয় পদ্ধতির প্রয়োগে আমরা প্রথমেই কয়েকটি 'হার' নির্ধারণ করতে চেয়েছি, যে হারসমূহকে জাতীয়ভিত্তিক তথ্যের সাথে সম্মিলন করে খাতভিত্তিক কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

বাংলাদেশে কালোটাকার বিস্তৃতি পরিমাপে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য শেষপর্যন্ত কালোটাকার বিভিন্ন উৎস ভিত্তিক যে সকল হার নিরূপিত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ (সারণি ১ দেখুন):

(১) সরকার যে আয়কর পেয়ে থাকেন (ব্যক্তিগত পর্যায়ের আয়কর ও কর্পোরেট আয়কর) তা সম্ভাব্য প্রাপ্তির (যা পাওয়া সম্ভব অথবা প্রকৃত করযোগ্য আয়ের হিসেবে যে কর সরকারের পাওয়া উচিত ছিল) ২৫ শতাংশের ঊর্ধ্বে নয় (অর্থাৎ আয়ের এ উৎসে সরকার যা পাওয়ার কথা তার ৭৫ শতাংশ পান না)। সরকারি রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন উৎসের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তিসম্ভাব্য প্রাপ্তির ২০ থেকে ৫০ শতাংশ। এ হার ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক, শিল্প ও ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ, মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ, আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ, স্ট্যাম্প, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, টোল, রেজিস্ট্রেশন ফি, মাদক শুল্ক, সেবাবাবদ প্রাপ্তি ও অবাণিজ্যিক বিক্রয়—প্রতিটি ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ।

(২) চোরাচালান-উদ্ভূত কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয়ের ভিত্তি হলো জ্ঞানাভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত, যা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার যে পরিমাণ অর্থের চোরাচালান ধরতে-জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন (ধৃত-ঘোষিত চোরাচালান) তা মোট (প্রকৃত) চোরাচালানের মাত্র ২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক জব্দকৃত চোরাচালানের পরিমাণ (বিদেশ থেকে যা এসেছে এবং দেশ থেকে যা গিয়েছে) ১৮৩০ কোটি টাকা; এবং

(৩) ঘুষ-উদ্ভূত কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ১৫৯ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে মুনাফার হার ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি আমানতের কার্যকর সুদের হারের সমান (৮ শতাংশ) এবং উক্ত মুনাফার ৫০ শতাংশ ঘুষ। এ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে মোট ঘুষের পরিমাণ হবে জিডিপির ৪ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ১ দেখুন)।

আমাদের হিসেবে বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা (সারণি ২), যা ওই বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির, ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা, সারণি ৩ দেখুন) এক-তৃতীয়াংশের (৩৩.৩৩ শতাংশ) সমপরিমাণ।

সারণি ২: বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস অনুযায়ী কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড (সরকার ব্যবহার করে)	কালোটাকা সৃষ্টির উৎস/খাত	উৎস/খাতে সরকারের প্রকৃত প্রাপ্তি (কোটি টাকা)	উৎস/খাতে কালোটাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট সৃষ্ট কালোটাকার শতাংশ (%)
	ক. বৈধ খাত: সরকারের রাজস্ব (কর-শুল্ক ও অন্যান্য) আহরণের খাত			
	ক ১. কর ও শুল্ক থেকে প্রাপ্তির খাত			
১০০	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর	১০০,৭১৯	৩,০২,১৫৭	৩৫.৯
৩০০	মূল্য সংযোজন কর	১১০,৫৫৫	১,১০,৫৫৫	১৩.১
৪০০	আমদানি শুল্ক	৩২,৫৫৩	৪৮,৪৩০	৫.৮
৫০০	রপ্তানি শুল্ক	৩৬	৩৬	০.০০৪
৬০০	আবগারি শুল্ক	২,০৯০	৮,৩৬০	১.০
৭০০	সম্পূরক শুল্ক	৪৮,৭৬৬	৭৩,১৪৯	৮.৭
৯০০	অন্যান্য কর	১,৪৮২	১,৪৮২	০.২
	মোট – জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত করসমূহ	**২৯৬,২০১**	**৫,৪৪,১৬৯**	**৬৪.৭**
১০০০ ১১০০ ১২০০ ১৩০০	**মোট – জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত করসমূহ** (কোড ১০০০ = মাদক শুল্ক, ১১০০ = যানবাহন কর, ১২০০ = ভূমি রাজস্ব, ১৩০০ = স্ট্যাম্প বিক্রয় ও সারচার্জ)	৯,৭২৭	২৪,৪০১	২.৯
	ক ২. কর-শুল্ক ব্যতীত প্রাপ্তি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত) (কোড ১৫০০ = লভ্যাংশ ও মুনাফা, ১৬০০ = সুদ, ১৮০০ = প্রশাসনিক ফি, ১৯০০ = জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, ২০০০ = সেবা বাবদ প্রাপ্তি, ২১০০ = ভাড়া ও ইজারা, ২২০০ = টোল, ২৩০০ = অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, ২৬০০ = কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি) (বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি ও মূলধন রাজস্ব বাদ দেওয়া হয়েছে)	৩৩,১১৬	১৭,৬৭০	২.১
	সর্বমোট রাজস্ব	**৩৩৯,০৪৪**	**৫,৮৬,২৪০**	**৬৯.৭**
	খ. অবৈধ খাত			
	ঘুষ	-	১,০০,৯৭৯	১২.০
	চোরাচালান	-	৯১,৫০০	১০.৯
	অন্যান্য	-	৬২,৭০০	৭.৫
	মোট অবৈধ খাতে (কালোটাকা)	-	২,৫৫,১৭৯	৩০.৩
	সর্বমোট কালোটাকা	-	**৮,৪১,৪১৯**	**১০০**

নোট: পূর্ণসংখ্যায় আনার কারণে শতাংশের যোগফল একটু হেরফের হতে পারে (উৎস: *বারকাত, আবুল*, ২০২০, *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, পৃ. ৪৯০-৪৯১)।

আমার হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সৃষ্ট মোট ৮,৪১,৪১৯ কোটি টাকা কালোটাকার মধ্যে ৬৯.৭ শতাংশ এসেছে অর্থনীতির বৈধ খাতের অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে আর বাদবাকি ৩০.৩ শতাংশ এসেছে সেসব খাত-ক্ষেত্র থেকে যেগুলো আইনগতভাবেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (যেমন ঘুষ, চোরাচালান, অন্যান্য)। সবচেয়ে বেশি কালোটাকা সৃষ্টি হয়েছে 'আয়কর, মুনাফার ওপর কর এবং মূলধন কর' ফাঁকি থেকে (মোট কালোটাকার ৩৫.৯ শতাংশ), এরপরে ক্রমানুসারে আছে মূল্য সংযোজন কর (বা ভ্যাট ফাঁকি থেকে, মোট কালোটাকার ১৩.১ শতাংশ), ঘুষ (মোট কালোটাকার ১২ শতাংশ), চোরাচালান (মোট কালোটাকার ১০.৯ শতাংশ), সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি (মোট কালোটাকার ৮.৭ শতাংশ), অন্যান্য অবৈধ খাত (মোট কালোটাকার ৭.৫ শতাংশ), আমদানি শুল্ক ফাঁকি (মোট কালোটাকার ৫.৮ শতাংশ)।

কালোটাকার উৎসভিত্তিক ব্যবচ্ছেদের পরে পুরোটা জোড়া লাগানো গেলে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে যে আমাদের হিসেবের কালোটাকার পরিমাণগতভাবে দ্বিতীয় বড় উৎস **'ঘুষ'** আসলে দ্বিতীয় উৎস নয়—তা নিঃসন্দেহে প্রথম ও একক বৃহৎ উৎস। আর দ্বিতীয় উৎস সে যে-ই হোক না কেন—'ঘুষের' বহু পেছনে থাকবে। কারণ, পরিমাণের দিক থেকে কালোটাকার সবচেয়ে বড় উৎস আয়, মুনাফার ওপর কর এবং মূলধনের ওপর কর ফাঁকি দিতে অনেক ঘুষ দিতে হয়—ঘুষ দিতে হয় ঘাটে ঘাটে এবং ঘুষের 'রেট' মোটামুটি ফিক্স করা আছে। একই কথা আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর উৎস (মাদক, যানবাহন, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয়), কর-শুল্ক ব্যতীত প্রাপ্তি খাত, চোরাচালানের (সীমান্ত এবং অন্য অনেক জায়গায়) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব খাতে কর-শুল্ক ফাঁকি দিতে আর চোরাচালানে কী পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় তার স্ট্যান্ডার্ড রেট আমাদের জানা নেই। তবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট খাত-ক্ষেত্র বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায় যে **১০০** টাকার সমপরিমাণ কর বা শুল্ক ফাঁকি দিতে এবং চোরাচালান করতে ২০ টাকা ঘুষ দিতে হয় (কারো কারো ধারণায় এটা সর্বনিম্ন রেট), সেক্ষেত্রে আমাদের সারণিতে প্রদেয় ঘুষের হিসাবের (১ লক্ষ ৯৭৯ কোটি টাকা) সাথে আরো কমপক্ষে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা (৫,৬৫,৬৬৭ কোটি টাকার ২০ শতাংশ) যোগ করতে হবে, আর যোগফল হবে ২,১৪,১১২ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ঘুষের প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়াবে এই ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১১২ কোটি টাকা, যা দেশে ওই বছরে সৃষ্ট মোট কালোটাকার ২৫.৫ শতাংশ (১২ শতাংশ নয়)। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো শুধু 'অর্থ পূজা' নয় 'ঘুষ পূজা'। আর ঘুষ পূজার কারণে ঘুষখোর পূজা। এসব তো এখন খালি চোখে দেখতে কোনো বড় বিদ্যা লাগে না—চারপাশে তাকালেই দেখা যায়, উঁচু ফ্ল্যাটের দিকে তাকালে দেখা যায়, শহরে প্রাইভেট গাড়ির নমুনা দেখলে দেখা যায়, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে দেখা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্বর্ণের বাজারে দেখা যায়, ডলারের বাজারে দেখা যায়, কানাডার বেগমপাড়াসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুর-যুক্তরাজ্য-ভারতের বিভিন্ন পাড়াতেও দেখা যায়, হাইওয়ের পাশে জমি-জলাতে "ক্রয়সূত্রে 'আবদুল' সাহেবের মালিকানা"র বিরাট সাইনবোর্ডে দেখা যায়, গণমাধ্যমের মালিকানা থেকে দেখা যায়, মাছবাজারে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণিতে উড়োজাহাজে বিদেশ ভ্রমণের বাহার-বাহাদুরি থেকে দেখা যায়, এয়ারপোর্টে ভিআইপি লাউঞ্জের মানুষগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ট্রেন-লঞ্চ-স্টিমারের প্রথম শ্রেণিতে দেখা যায়, বিদেশে চিকিৎসা দেখলে দেখা যায়, বিদেশে নিজখরচে লেখাপড়া দেখলে দেখা যায়, বিয়ের বাজারে দেখা যায়, চাকরির বাজারে আমাদের সন্তানদের আবেদনপত্রের সংখ্যা ও উদ্দেশ্য থেকে দেখা যায়, আত্মীয়স্বজন-পরিচিতজনদের মধ্যে চাকরিবাকরির তদবিরের প্যাটার্ন থেকে দেখা যায়, এমনকি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বিশেষ অতিথি-প্রধান অতিথি-

সম্মানীত অতিথির তালিকা থেকেও দেখা যায়। আর এসব থেকে কালোটাকা নিয়ে আমাদের তত্ত্ব, তথ্য, বাস্তব জীবন—সবই তো মেলে। তাহলে তো কালোটাকা নিয়ে আমাদের হিসেবপত্তর এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি—প্রবণতা হিসেবে নির্ভুল।

কালোটাকার রাজনৈতিক-অর্থনীতি অভিজ্ঞান নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক দৃঢ় উপসংহারে পৌঁছানোর আগে আরো একটা হিসেবের বিষয় বলা খুবই জরুরি। হিসেবটি হলো একটি দেশে ৪০-৫০ বছর ধরে কী পরিমাণ কালোটাকা তৈরি হয়েছে তার হিসাবপত্তর। অর্থাৎ নিরন্তর গতিতে কালোটাকা (black money in dynamics)। **নিরন্তর গতিতে কালোটাকার হিসেবপত্তর আগে কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিগত ৪৭ বছরের জন্য (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) প্রত্যেক বছরে সৃষ্ট কালোটাকার হিসেবপত্তর করেছি। আমাদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা, যা ওই সময়কালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির; ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত, যার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা) ৩৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ৩ দেখুন)।**

সারণি ৩: বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়)**			
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	জিডিপির ২০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ২৫% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
১৯৭২-৭৩	৪,৯৮৫	৫৪,৪০৫	১০,৮৮১	১৩,৬০১	১৬,৩২১	১৮,১১৭
১৯৭৩-৭৪	৭,৫৭৫	৮০,১৬৯	১৬,০৩৪	২০,০৪২	২৪,০৫১	২৬,৬৯৬
১৯৭৪-৭৫	১২,৫৭৪	৭৭,২৯৩	১৫,৪৫৯	১৯,৩২৩	২৩,১৮৮	২৫,৭৩৯
১৯৭৫-৭৬	১০,৭৪৬	৬০,৩৫৯	১২,০৭২	১৫,০৯০	১৮,১০৮	২০,১০০
১৯৭৬-৭৭	১০,৫৩৬	৫৭,০০৯	১১,৪০২	১৪,২৫২	১৭,১০৩	১৮,৯৮৪
১৯৭৭-৭৮	১৩,০২৯	৭২,৬৯৮	১৪,৫৪০	১৮,১৭৪	২১,৮০৯	২৪,২০৮
১৯৭৮-৭৯	১৪,৪৭৭	৭৭,৮৩৩	১৫,৫৬৭	১৯,৪৫৮	২৩,৩৫০	২৫,৯১৯
১৯৭৯-৮০	১৭,২৪৫	৯৭,৯৭৮	১৯,৫৯৬	২৪,৪৯৫	২৯,৩৯৩	৩২,৬২৭
১৯৮০-৮১	১৯,৫৯৬	৯২,৪৫৮	১৮,৪৯২	২৩,১১৪	২৭,৭৩৭	৩০,৭৮৮
১৯৮১-৮২	২৬,৫১৪	১০০,৪৯৬	২০,০৯৯	২৫,১২৪	৩০,১৪৯	৩৩,৪৬৫
১৯৮২-৮৩	২৮,৮৪২	৯৯,০০৪	১৯,৮০১	২৪,৭৫১	২৯,৭০১	৩২,৯৬৮
১৯৮৩-৮৪	৩৪,৯৯২	১১৬,৮২১	২৩,৩৬৪	২৯,২০৫	৩৫,০৪৬	৩৮,৯০২
১৯৮৪-৮৫	৪১,৬৯৬	১২৫,২৬৭	২৫,০৫৩	৩১,৩১৭	৩৭,৫৮০	৪১,৭১৪
১৯৮৫-৮৬	৪৬,৬২৩	১২৯,৪২৫	২৫,৮৮৫	৩২,৩৫৬	৩৮,৮২৮	৪৩,০৯৯
১৯৮৬-৮৭	৫৩,৯২০	১৪৬,৩০০	২৯,২৬০	৩৬,৫৭৫	৪৩,৮৯০	৪৮,৭১৮
১৯৮৭-৮৮	৫৯,৭১৪	১৫৯,৪৪৫	৩১,৮৮৯	৩৯,৮৬১	৪৭,৮৩৩	৫৩,০৯৫
১৯৮৮-৮৯	৬৫,৯৬০	১৭১,৪৩৮	৩৪,২৮৮	৪২,৮৬০	৫১,৪৩২	৫৭,০৮৯
১৯৮৯-৯০	১০০,৩২৯	২৭৩,২৭৯	৫৪,৬৫৬	৬৮,৩২০	৮১,৯৮৪	৯১,০০২

সারণি ৩ চলমান ...

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়)**			
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	জিডিপির ২০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ২৫% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
১৯৯০-৯১	১১০,৫১৮	২৫৯,৮৪৪	৫১,৯৬৯	৬৪,৯৬১	৭৭,৯৫৩	৮৬,৫২৮
১৯৯১-৯২	১১৯,৫৪২	২৫৭,৮৯৮	৫১,৫৮০	৬৪,৪৭৪	৭৭,৩৬৯	৮৫,৮৮০
১৯৯২-৯৩	১২৫,৩৭০	২৬৫,০২৭	৫৩,০০৫	৬৬,২৫৭	৭৯,৫০৮	৮৮,২৫৪
১৯৯৩-৯৪	১৩৫,৪১২	২৮৩,৪০৪	৫৬,৬৮১	৭০,৮৫১	৮৫,০২১	৯৪,৩৭৪
১৯৯৪-৯৫	১৫২,৫১৮	৩২০,৪০২	৬৪,০৮০	৮০,১০১	৯৬,১২১	১০৬,৬৯৪
১৯৯৫-৯৬	১৬৬,৩২৪	৩৩৫,৫৬৩	৬৭,১১৩	৮৩,৮৯১	১০০,৬৬৯	১১১,৭৪৩
১৯৯৬-৯৭	১৮০,৭০১	৩৪৮,৬৬৪	৬৯,৭৩৩	৮৭,১৬৬	১০৪,৫৯৯	১১৬,১০৫
১৯৯৭-৯৮	২০০,১৭৭	৩৬৪,৪৮৩	৭২,৮৯৭	৯১,১২১	১০৯,৩৪৫	১২১,৩৭৩
১৯৯৮-৯৯	২১৯,৬৯৭	৩৮১,৮২৩	৭৬,৩৬৫	৯৫,৪৫৬	১১৪,৫৪৭	১২৭,১৪৭
১৯৯৯-০০	২৩৭,০৮৬	৩৯১,৭৮৬	৭৮,৩৫৭	৯৭,৯৪৭	১১৭,৫৩৬	১৩০,৪৬৫
২০০০-০১	২৫৩,৫৪৬	৩৭৭,০৮৮	৭৫,৪১৮	৯৪,২৭২	১১৩,১২৬	১২৫,৫৭০
২০০১-০২	২৭৩,২০১	৩৯৯,৯৪৯	৭৯,৯৯০	৯৯,৯৮৭	১১৯,৯৮৫	১৩৩,১৮৩
২০০২-০৩	৩০০,৫৮০	৪৪০,০৩০	৮৮,০০৬	১১০,০০৮	১৩২,০০৯	১৪৬,৫৩০
২০০৩-০৪	৩৩২,৯৭৩	৪৭৫,০১৬	৯৫,০০৩	১১৮,৭৫৪	১৪২,৫০৫	১৫৮,১৮০
২০০৪-০৫	৩৭০,৭০৭	৫০৬,৯৩১	১০১,৩৮৬	১২৬,৭৩৩	১৫২,০৭৯	১৬৮,৮০৮
২০০৫-০৬	৪৮২,৩৩৭	৬০৩,৪৯৬	১২০,৬৯৯	১৫০,৮৭৪	১৮১,০৪৯	২০০,৯৬৪
২০০৬-০৭	৫৪৯,৮০০	৬৬৮,৯৭৯	১৩৩,৭৯৬	১৬৭,২৪৫	২০০,৬৯৪	২২২,৭৭০
২০০৭-০৮	৬২৮,৬৮২	৭৬৯,৯৭৪	১৫৩,৯৯৫	১৯২,৪৯৪	২৩০,৯৯২	২৫৬,৪০১
২০০৮-০৯	৭০৫,০৭২	৮৬১,১১৪	১৭২,২২৩	২১৫,২৭৮	২৫৮,৩৩৪	২৮৬,৭৫১
২০০৯-১০	৭৯৭,৫৩৯	৯৬৮,৬৭৮	১৯৩,৭৩৬	২৪২,১৬৯	২৯০,৬০৩	৩২২,৫৭০
২০১০-১১	৯১৫,৮২৯	১,০৮০,৬০৯	২১৬,১২২	২৭০,১৫২	৩২৪,১৮৩	৩৫৯,৮৪৩
২০১১-১২	১,০৫৫,২০৪	১,১১৯,৪১১	২২৩,৮৮২	২৭৯,৮৫৩	৩৩৫,৮২৩	৩৭২,৭৬৪
২০১২-১৩	১,১৯৮,৯২৩	১,২৬০,৩২৯	২৫২,০৬৬	৩১৫,০৮২	৩৭৮,০৯৯	৪১৯,৬৮৯
২০১৩-১৪	১,৩৪৩,৬৭৪	১,৪৫২,৭৬৫	২৯০,৫৫৩	৩৬৩,১৯১	৪৩৫,৮৩০	৪৮৩,৭৭১
২০১৪-১৫	১,৫১৫,৮০২	১,৬৩৯,৮১৮	৩২৭,৯৬৪	৪০৯,৯৫৪	৪৯১,৯৪৫	৫৪৬,০৫৯
২০১৫-১৬	১,৭৩২,৮৬৪	১,৮৬০,৪২১	৩৭২,০৮৪	৪৬৫,১০৫	৫৫৮,১২৬	৬১৯,৫২০
২০১৬-১৭	১,৯৭৫,৮১৭	২,০৯৮,০৮৭	৪১৯,৬১৭	৫২৪,৫২২	৬২৯,৪২৬	৬৯৮,৬৬৩
২০১৭-১৮	২,২৫০,৪৮১	২,৩০৩,১৬৯	৪৬০,৬৩৪	৫৭৫,৭৯২	৬৯০,৯৫১	৭৬৬,৯৫৫
২০১৮-১৯	২,৫২৪,৪৮৪	২,৫২৪,৪৮৪	৫০৪,৮৯৭	৬৩১,১২১	৭৫৭,৩৪৫	৮৪০,৬৫৩
মোট	**২১,৪২৪,২১৪**	**২৬,৬১০,৯২১**	**৫,৩২২,১৮৪**	**৬,৬৫২,৭৩০**	**৭,৯৮৩,২৭৬**	**৮,৮৬১,৪৩৭**

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক বিনির্মিত (দেখুন, বারকাত, আবুল, ২০২০, *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, পৃ. ৪৯৪-৪৯৬)।। নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য যেসব উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ: (১) Bangladesh Bank (2020b). Time series data since 1972 (downloaded from: https://www.bb.org.bd/econdata/index.php, accessed on 03 August 2020) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে

জিডিপির তথ্য; (২) Bangladesh Bureau of Statistics (1991). Statistical Yearbook of Bangladesh 1990 p. 506 থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (৩) Bangladesh Bureau of Statistics (1988). Statistical Yearbook of Bangladesh 1987 (p. 498) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৪-৮৫ পর্যন্ত অর্থবছরে বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (৪) Bangladesh Bureau of Statistics. (1982). Statistical Pocket Book of Bangladesh 1980 (p. 389) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮০-৮১ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য (১৯৮০-৮১-এর তথ্য 'প্রভিশনাল' বা সাময়িক হিসেব); (৫) Bangladesh Bureau of Statistics. (1980). Statistical Pocket Book of Bangladesh 1979 (p. 377) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (পৃ. ৫০) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সময়কালের তথ্য।

* ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৪.০৩ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল: ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে দাঁড়ায়: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৪.০৩ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৪,৪০৫ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি নিরূপণ করা হয়েছে।

** প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত। হিসেবের বিস্তারিত পদ্ধতি এ অধ্যায়েই দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এখন থেকে তিন দশক আগে এই গ্রন্থের লেখক বাংলাদেশে কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতি ও পরিমাপের প্রয়াস নিয়েছিলেন, যা ছিল এ দেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথমদিকের প্রয়াস। প্রথমদিকের পদ্ধতিতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দেখুন: বারকাত, আবুল (১৯৯১), কালো অর্থনীতি ও কালো অর্থ—উদ্ভবের শর্ত, বিস্তৃতি পরিমাপের অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশে তার পরিমাপ। [*রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল*, জুন-ডিসেম্বর, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩০-৫৩; [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র]; Barkat, A. (1992). The context of black money and its measurement। এর কিছু আগে বাংলাদেশে কালোটাকার পরিমাণ পরিমাপের প্রয়াস নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাদরেল রেজা, তবে তিনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কোনো ব্যবস্থা বিশ্লেষণের দিকে যাননি (দেখুন, Reza, S. (1989). The Black Economy in Bangladesh: Preliminary Observations)।

বাংলাদেশে সমগ্রক দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোতে কালোটাকার উদ্ভব ও বিকাশের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বলা যায়: বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কালোটাকার মালিকশ্রেণি—রেন্টসিকার-লুটেরা-পরজীবী-অনুৎপাদনশীল-নিকৃষ্ট পুঁজির মালিকেরা যে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পুষ্ট হচ্ছেন—এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কালোটাকার বিগত ৪৬ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯) ইতিহাস থেকে এটাও প্রক্ষেপণ সম্ভব যে সবকিছু যেমন চলছে, তেমনই চলতে থাকলে কালোটাকার মালিকেরা যে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম ও ইচ্ছুক—এমন ভাবনা অলীক বৈ কিছু নয়। সবকিছু বিচারে কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তুসহ কালোটাকার মালিকদের এহেন প্রভাব-প্রতাপ ইতিমধ্যে যেসব মারাত্মক 'স্বাভাবিক অঘটন' ঘটিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) তারা সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকাঠামোকেই এমন বিকৃত করে ছেড়েছে, যা বজায় রেখে শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক সমাজ—শোভন সমাজব্যবস্থা গড়া অসম্ভব;

(২) কালোটাকার ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি সর্বত্র, যে কারণে এখন অর্থপূজা সর্বজনীনতা পেয়েছে, এখন 'অর্থপূজার' ওপরে আর কোনো পূজা নেই;

(৩) অতীতে দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল, সেটি আর নেই। অতীতে সরকার

ও ক্ষমতার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেটি বিনষ্ট হয়েছে। অতীতে সরকার-এর (government) হাতে ক্ষমতা (power) ছিল—এখন নেই; এখন সরকার সরকারের জায়গায় আছেন, তবে ক্ষমতাহীন; ক্ষমতা রাজনীতি থেকে অভিবাসিত হয়েছে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কালোটাকার মালিক-রেন্ট সিকার-লুটেরা-পরজীবী-অনুৎপাদনশীল নিকৃষ্ট পুঁজির হাতে (power has migrated from politics to rent seeking economics);

(৪) কালোটাকার মালিক গোষ্ঠী/শ্রেণি 'গণতন্ত্রমুক্ত জোনের বাসিন্দা' (resides in the 'democracy free' zone) এবং গণতন্ত্রকে তারা ভোটের খেলা বানিয়ে ছেড়েছেন-ছাড়বেন, যেখানে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা বা প্রয়োজন কোনোটাই থাকবে না;

(৫) যেভাবে চলছে, সেভাবে চলতে থাকলে—বাংলাদেশে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে ফ্যাসিস্ট সরকার, ইসলাম ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। আর অবস্থা পরিবর্তিত হলে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক মৌলিক পরিবর্তন, যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানুষের—শোভন সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(৬) কালোটাকার বিস্তৃতি সমাজ অর্থনীতিতে বৈষম্য বাড়িয়েছে-বাড়াচ্ছে-বাড়াবে, ফলে উত্তরোত্তর অধিক হারে মানুষ বহুমুখী বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে বাধ্য;

৬. অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অর্থ পাচার (Money Laundering)—'দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির'ই অন্তঃস্থ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার মানে অর্থ পাচার হলো দুর্নীতি-নীতিহীন বিষয়। অর্থ পাচার একই সাথে কালোটাকা (black money) আবার কালোটাকা নয়। যে কালোটাকা পাচার হয়, তা নিঃসন্দেহে 'দুর্নীতিগ্রস্ত-অর্থপাচার"। যেমন যে অর্থের ওপর কোনো কর দেওয়া হয়নি (untaxed) অথবা যে অর্থের লেনদেন নথিভুক্ত নয় (working off the books) সে অর্থপাচার নিঃসন্দেহে 'দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থপাচার'। কিন্তু যে অর্থের ওপর কর দেওয়া হয়েছে (taxed) এবং যে অর্থ নথিভুক্ত-খাতাপত্রে আছে—সে অর্থ দেশের বাইরে চলে গেলে (অথবা উল্টোটা) তা 'দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থপাচার'; কিন্তু কালোটাকার পাচার নয়। যেমন কেউ যদি ইতিমধ্যে কর দেওয়া সঞ্চিত অর্থ নিয়ে চিকিৎসা করাতে কলকাতা-দিল্লি-ভেলর-ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর যান, তা পাচার; কিন্তু কালোটাকার পাচার নয়। মানুষ এসব করতে বাধ্য হন—কারণ একদিকে দেশে ওই চিকিৎসার সুযোগ নেই, আর অন্যদিকে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী কেউই বছরে ৫ হাজার ডলারের বেশি বিদেশে নিয়ে যেতে পারেন না; নিজ অর্থায়নে বিদেশে শিক্ষার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য।

অর্থ পাচার আবার একমুখী নয় (single direction)। দেশের অর্থ যখন বিদেশে পাচার হয়, যাকে বলে বহির্মুখী অর্থ পাচার (out bound money)– উভয়মুখী তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কালোটাকা (ওপরের চিকিৎসা ও শিক্ষাসম্পর্কিত ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ বাদে)। কিন্তু যখন তা অন্তর্মুখী অর্থাৎ পাচার হয়ে বিদেশ থেকে স্বদেশে আসে, তখন তা কালোটাকা হতেও পারে না-ও হতে পারে। যেমন পাচারকৃত কালোটাকা বিদেশে ভ্রমণ করে ধুয়ে-মুছে **(money laundering-এর laundering শব্দটি 'লন্ড্রি' থেকে এসেছে; 'লন্ড্রির' কাজ ময়লা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করা)** যখন স্বদেশে ফেরে, তখন তা 'ধৌতকৃত অর্থ' হলেও তার উৎস কালোটাকা (**এ হলো কয়লার মতো—যত ধুতে থাকুন না কেন ময়লা যাবে না**)। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত একজন বাংলাদেশি শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যখন হুন্ডি-হাওয়ালা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে দেশে অর্থ পাঠান, সেটা সংজ্ঞাগতভাবে অর্থ পাচার হলেও তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনেকটা 'মহৎ উদ্দেশ্যের

দুর্নীতি'র মতো ('noble cause corruption'—হিটলারের ইহুদি নিধন থেকে রক্ষা করতে কেউ কেউ গেস্টাপোদের ঘুষ দিত) অর্থাৎ তা দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ পাচার নয়। এসব হলো প্রচলিত অর্থের 'খারাপ'-এর মধ্যে ভালো-মন্দ বিবেচনা। এসবই হলো অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশেষ দিক। এখন আসা যাক 'দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ পাচার' অর্থাৎ সাধারণ্যে যে অর্থ পাচারকে যৌক্তিক কারণেই নিন্দনীয় বলা হয়, ঘৃণা করা হয়, উন্নয়নে 'ঋণাত্মক' বিষয় হিসেবে মনে করা হয়—সেই অর্থপাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে।

অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতি—কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এবং যা আবার বড় পর্দার "দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির" অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্থপাচার বা 'মানি লন্ডারিং' বলতে সাধারণভাবে অবৈধ মুদ্রা পাচার বোঝায়। **আমার মতে, মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ পথ-পদ্ধতি-পন্থা-উপায়ে আহরিত অর্থ-সম্পদের অবৈধ হস্তান্তর বা রূপান্তর।** এর আগে কালোটাকার উদ্ভব-সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে কালোটাকা বা black money প্রধানত দুভাবে—দুটি বড় খাতে সৃষ্টি হয়—*প্রথমটা* হলো সেসব খাত যা খাত হিসেবে বৈধ, কিন্তু ওই খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড করা সম্ভব; যেমন সরকারের কর-রাজস্ব ও কর-রাজস্ববহির্ভূত সকল আয়ের খাত (যেমন—ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক, আমদানি-রপ্তানি, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি, যা সারণি ২-এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে)। এসব বৈধ খাতে যে পরিমাণ কর-রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়, সেটাই কালোটাকা। এরপর *দ্বিতীয়টা* হলো সেসব খাত, যা জন্মসূত্রেই বেআইনি সুতরাং অবৈধ। যেমন ঘুষ, চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, মানব পাচার ইত্যাদি। আর উল্লিখিত দুই বড় পদ্ধতিতে যেসব কালোটাকা সৃষ্টি হয় (অবশ্য 'সৃষ্টি' কথাটা সঠিক নয়, কারণ এসব হলো 'অনাসৃষ্টি') তা যদি ধুয়ে-মুছে সাদা করার (বা laundry করা অর্থাৎ ধৌতকরণ) চেষ্টায় পাচার বা অবৈধ পন্থায় স্থানান্তরিত হয় বা অভিবাসিত হয়, সেটাই অর্থ পাচার (migrated black money বলা যায়; এটা migrate out হতে পারে, migrate out হয়ে পড়ে পুরো/একাংশ migrate in হতে পারে)।

সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা বলছেন যে এখন পৃথিবীতে বছরে অর্থ পাচার বা মানি লন্ডারিং-এর পরিমাণ আনুমানিক ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (অথবা ২ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার) অর্থাৎ ১৬৬ লক্ষ কোটি টাকা, যা বৈশ্বিক জিডিপির ৫ শতাংশের সমপরিমাণ। **অর্থপাচার বা মানি লন্ডারিং-এ পাচারকৃত অর্থকে তিনটি পর্যায় পেরুতে হয়। প্রথম পর্যায়—জমাকরণ (placement), দ্বিতীয় পর্যায়—স্তর বিন্যাস (layering), তৃতীয় পর্যায়—একীভূতকরণ বা ছেঁকে তোলা (integration)।** অর্থ পাচারকারী প্রথমে তার নগদ অর্থ (প্রধানত বিদেশি মুদ্রায়) পৃথিবীর কোনো না কোনো বড় ব্যাংকে জমা করেন, তারপরে জমাকৃত অর্থ ১০০-১৫০টি ছোট ছোট ব্যাংকে এবং/অথবা মানি চেঞ্জার হাউজে ছড়িয়ে দেন, তারপরে লাটাই গুটিয়ে সব একীভূত করেন। ঘটনাটা ঘটে এভাবে: অর্থপাচারকারী প্রথমে কোনো না কোনো বড় ব্যাংকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য (ধরুন বড়জোর ১-২ ঘণ্টা) অর্থ জমা করেন (placement); এই জমা করার ১-২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি তার অর্থ পৃথিবীর ছোটখাটো ১০০-১৫০টি ব্যাংক এবং/অথবা মানি চেঞ্জার হাউজে স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দেন—যাকে বলে layering (পৃথিবীতে এ ধরনের ব্যাংক, মানি চেঞ্জার হাউজ অনেক আছে—কিছু আছে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে, কিছু আছে ল্যাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে, কিছু আছে আফ্রিকায়—যাকে বলে 'ট্যাক্স হ্যাভেন'); এরপর তৃতীয় পর্যায়ে ওই সব ছড়িয়ে দেওয়া অর্থ টেনে একত্রিত করা হয়, যাকে বলে (integration)। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় নেওয়া (অর্থাৎ placement এবং placement থেকে layering)। একবার স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলেই 'লন্ড্রি'র কাজ হয়ে যায়—অর্থাৎ নোংরা-দুর্গন্ধযুক্ত-পাচার করা অর্থ ধুয়ে-মুছে সাদা হয়ে যায় (এ হলো দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা পাচারকৃত অর্থকে সুগন্ধীকরণ প্রক্রিয়া)। গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে

বড় মাপের পাচারকৃত অর্থের প্রধান উৎস তিনটি, যার মধ্যে আছে—কর-শুল্ক ফাঁকি (মোট পাচারকৃত অর্থের ৬৫ শতাংশ), বিভিন্ন ধরনের ক্রাইম বা অপরাধ (মোট পাচারকৃত অর্থের ৩০ শতাংশ), তারপরেই আছে 'ঘুষ' (মোট পাচারকৃত অর্থের ৫ শতাংশ)। তবে স্থান-কাল এবং অর্থের পরিমাণভেদে এ অনুপাত একই রকম নয়। যেমন মেক্সিকো থেকে অর্থ পাচারের বড় অংশই 'ক্রাইম-ড্রাগ ক্রাইম'; নাইজেরিয়া থেকে পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ 'কর-শুল্ক ফাঁকি'; আর চীন থেকে পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ 'ঘুষ'। পাচারকৃত অর্থ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সাদা করার পরে (কিছু অংশ আগেও হতে পারে) ওই অর্থ প্রধানত তিন-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়: আনুমানিক ৩০ শতাংশ আইনিভাবে বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়, ২৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করা হয়, ২৫ শতাংশ ঘুষ দেওয়া হয়, ২০ শতাংশ বিলাসী জীবন যাপনের কাজে ব্যবহার করা হয় (যেমন দামি ভিলা-দালানকোঠা কেনা, জমি কেনা, দামি গাড়ি কেনা, হিরা-মণিমুক্তো-সোনাদানা কেনা, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলা, প্রথম শ্রেণিতে দেশভ্রমণ করা ইত্যাদি)।

আমাদের দেশে বছরে কী পরিমাণ অর্থ পাচার হয়? এ নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো তথ্যনির্ভর ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা নেই। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট (২০১৯) অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী বার্ষিক অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে বৈশ্বিক জিডিপির ৫ শতাংশের সমপরিমাণ। তবে দেশভিত্তিক বিস্তরণটা (range variation) অনেক, জিডিপির ১ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত। **অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত নিদেনপক্ষে সেসব দেশের ক্যাটেগরিতে পড়ে, যাদের অর্থ পাচারের পরিমাণ জিডিপির ২.৫-৩.৫ শতাংশের মধ্যে। আমরা যদি নিচের দিকের গড় ধরি (অর্থাৎ জিডিপির ৩ শতাংশ) সেক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭৫,৭৩৪ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালোটাকার (৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ এবং একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। আমাদের হিসেবে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশে মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা।**

৭. বিদ্যমান আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোতে দুর্নীতি রোধ, কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধার-উদ্দিষ্ট প্রধান সুপারিশ

দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতিটাই এমন যে রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরানিয়ন্ত্রিত আর্থরাজনৈতিক কাঠামোতে দুর্নীতি উচ্ছেদ আর কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধারে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। তবে এ প্রসঙ্গে দু'টো কাজ করা সম্ভবত সম্ভব। তা হলো:

প্রথমত: "দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচার" সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বাধীন কমিশন ("Independent Commission on Corruption, Black Money and Money Laundering") গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচারসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া এবং অনুসন্ধান-গবেষণাফল প্রতি তিন মাস অন্তর দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা। একই সাথে কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা। প্রস্তাবিত এই স্বাধীন কমিশন পরিচালনের প্রধান নীতি-দর্শন (principle philosophy) হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের "সংবিধানের প্রাধান্য"– ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদ: *"(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের*

অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।" প্রস্তাবিত এ কমিশন যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু কমিশন তার কাজের জন্য সরাসরি জনগণের কাছেই জবাবদিহি করবে (প্রয়োজনে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে রিপোর্ট করবে)। মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে প্রস্তাবিত এ কমিশন গঠিত হবে, যার মধ্যে ১ জন প্রধান কমিশনার (নারী অথবা পুরুষ) ও ৮ জন কমিশনার (৪ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ)। কমিশন তার কর্ম সম্পাদনে মোট ১০০ জন গবেষক-গবেষণা সহকারী নিযুক্ত করবে। প্রধান কমিশনারসহ সকল কমিশনার নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রের প্রধান; নিযুক্তিকাল হবে ৩-৫ বছর; কমিশনারদের যে কেউ যেকোনো সময় ইস্তফা দিতে পারবেন (ইস্তফার কারণ উল্লেখ অথবা উল্লেখ না করে); এবং নিযুক্তিকালে ছেড়ে চলে যেতে বলার দায়-দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। কমিশনের সদস্য হতে পারবেন শুধু তারা, যারা স্ব-গুণাবলি, দেশপ্রেম ও জ্ঞানসমৃদ্ধতার কারণে জনসাধারণ্যে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কমিশনে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির কোনো ব্যক্তি (তিনি ওই ক্যাটেগরিতে বর্তমানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত যেটাই হোক না কেন) কমিশনার (কমিশন সদস্য) হতে পারবেন না: আমলা, সামরিক বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, (পেশাগত) ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, রাজনৈতিক দলের সদস্য, গণমাধ্যমের মালিক। রাষ্ট্র কমিশনকে এককালীন ১০০ কোটি টাকার ৩ বছরের বাজেট অগ্রিম দেবে (প্রধান কমিশনার রাষ্ট্রের সাথে বাজেটে স্বাক্ষর করবেন), কমিশন প্রতি ৩ মাস অন্তর কমিশনের আয়-ব্যয় জনসম্মুখে উপস্থাপন করবে; গঠনের ৩ মাসের মধ্যে রাষ্ট্র কমিশনের জন্য বহুতল স্থায়ী কমিশন ভবনের ব্যবস্থা করবে; রাষ্ট্র কমিশনে কর্মরত সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। প্রস্তাবিত এ কমিশন স্বাধীন, বিধায় কমিশনের সাথে বর্তমান দুর্নীতি দমন কমিশনের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে স্বাধীন এই কমিশন প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে বলতে পারবে। দুর্নীতির কারণে, কালোটাকার মালিক হবার কারণে, অর্থ পাচার করার কারণে প্রস্তাবিত এই কমিশন কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না, শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষণপূর্বক রাষ্ট্রপতি এবং/অথবা প্রধান বিচারপতির বরাবর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত: এখন থেকে প্রস্তুতি নিলে আগামী অর্থবছরে (২০২১-২২) মাত্র ৪০ হাজার কোটি টাকা কালোটাকা এবং ৫৫ হাজার কোটি টাকা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার সম্ভব। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে এই ধারা উত্তরোত্তর জোরদার করতে হবে। এ কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য যাদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে, তাদের মধ্যে রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সম্পর্কিত জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটি-কমিশন, (প্যারিসভিত্তিক) ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট প্রণেতাদের সংস্থা (তবে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণের পরে), প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সংসদের সকল স্থায়ী কমিটি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রজাতন্ত্রের মহা হিসাব নিরীক্ষক, দেশের আইনশৃঙ্খলা প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সংশ্লিষ্ট অফিস, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ৬৫-৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশের ভূমি আইন বাস্তবায়নের সমস্যা নিরূপণে রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ: একটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

আবুল বারকাত*
আসমার ওসমান**

সারসংক্ষেপ *'ভূমি' (land) বলতে আমরা বুঝি, জমি– কৃষি ও অকৃষি, জলা (water-bodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ 'ভূমি' শুধু কৃষি জমি নয়; 'ভূমি' মানে কৃষি জমি, অকৃষি জমি, জলা-জঙ্গল-বন। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক তো বটেই, একইসাথে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতারও পরিমাপক। বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন পথরেখা বা মডেলে ভূমি অন্যতম প্রধান উপাদান। ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পেছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিমূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তা অনুপস্থিত। প্রায়োগিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো দরিদ্রবান্ধব নয়, নয় জনকল্যাণমুখী। প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত এবং প্রায়োগিক সমস্যা তৈরি করে তীব্র ভূমি বিরোধ। আইনি বাস্তবায়নের বিষয়টি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে 'বাদ পড়া' জনগোষ্ঠীকে 'অন্তর্ভুক্ত' করা সম্ভব হয়। সমাধান-যাত্রায় সুফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজন নিবিড় গবেষণা—যা ভূমি আইনের সমস্যাগুলোর মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করবে, যা সমাধানের জ্ঞানভিত্তিক নৈতিক কাঠামো প্রণয়ন এবং রূপায়ণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কিন্তু, এ ধরনের গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি কী ধরনের, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে গবেষণাফলাফল দেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোর কোন স্তরের মানুষকে কতটুকু সুফল এনে দেবে। দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ভূমিসংশ্লিষ্ট সরাসরি জীবিকা যাদের—কৃষি-জল-বন—তাদের উন্নয়ন যদি অভীষ্ট ধরি, তাহলে গবেষণাতাত্ত্বিক কোন কাঠামো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে তুলনামূলক অধিক কার্যকর হবে—সেটি আলোচনা করা হয়েছে এখানে। পাঁচটি নমুনা আইন, যার সাথে কৃষক-দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানষের প্রকৃত, অধিকারভিত্তিক উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক-বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy)-ভিত্তিক বিশ্লেষণ সঠিকতার কোন*

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

** এমএসএস (অর্থনীতি): গবেষণা পরামর্শক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার

মাত্রায় ফলাফল দেয়, তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। ভূমি আইন এবং সেই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক-অর্থনীতি"ভিত্তিক হাতিয়ার (tool) ব্যবহার একটি নবতর সংযোজন এতদ্‌সংক্রান্ত ডিসকোর্সে। বিশেষ করে আমরা এখানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' (operational definition) নির্ধারণ করেছি, সেটির যেমন তাত্ত্বিক একটি গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি একইসাথে ওই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিও এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা, যা সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে, সহায়তা করবে।

১. প্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য

জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক ভূমি। ভূমি'র উপর অধিকার অর্থনৈতিক তো বটেই, একইসাথে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতারও পরিমাপক। জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে না ভূমির পরিমাণ– বাড়ছে ভূমির মালিকানা নিয়ে প্রতিযোগিতা। ভূমিকেন্দ্রিক সহিংসতা, ফাটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে নিয়তই। বাড়ছে ভূমিহীন, বলপূর্বক অভিবাসন, দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা। ভূমির উপর জনগণের পূর্ণ-অধিকার (মালিকানা-অভিগম্যতা-ব্যবহার ও তার ন্যায্য শর্তাবলী) এ দেশের 'প্রকৃত উন্নয়ন'-এর পূর্বশর্ত। বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন পথরেখা বা মডেলে ভূমি অন্যতম প্রধান উপাদান। স্মর্তব্য, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য একখণ্ড ভূমি অমূল্য সম্পদ। কৃষকের জীবন মানেই জমি এবং কৃষিই এ দেশের ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ খানার আয়ের উৎস। জলাজীবী, বনজীবী মানুষের কাছেও ভূমি-ই একমাত্র অবলম্বন। অথচ, জীবনের প্রত্যুষেই দেখতে হয় তাদের একমাত্র অবলম্বন-আশ্রয়– সেই ভূমি অন্যের দখলে; সেখানে তারা শুধু নীরব, অসহায় দর্শকমাত্র। সেখানে কোনো সুন্দর স্বপ্ন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই; আছে কেবল আইনি দুঃশাসন, বিভ্রান্তি, নানান অপকৌশল এবং এসবের অনাকাঙ্ক্ষিত অপপ্রয়োগ।

এটি অনস্বীকার্য যে ভূমিই দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ, নারীর একমাত্র আশ্রয়। জন্মসূত্রেই তারা মাটির মানুষ, মাঠের মানুষ। জীবনের প্রাপ্তি, পূর্ণতা ভূমিকেন্দ্রিক। ভূমিই তাদের মহার্ঘ্য সম্পদ, একমাত্র অবলম্বন। মনে রাখতে হবে, ভূমির অধিকারবঞ্চিত এইসব মানুষই আমাদের প্রতিটি সূর্যোদয়ের, সূর্যাস্তের সাক্ষী; তাদের ভূমিকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার প্রাত্যহিক অনুসন্ধানেই ফুটে ওঠে আমাদের এই প্রিয় দেশ, সমাজের প্রকৃত ছবি। কিন্তু, তারা একে একে হারিয়েছেন ভূমির মালিকানা, এমনকি চাষাবাদের অধিকারও। ভূমির সব অধিকার হারিয়ে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ ও নারী হারিয়েছেন তাদের শক্তি ও সৌন্দর্য। তাদের চলমান জীবন ও ভূমির অন্তর্গত সম্পর্কটি আমাদের বারংবার মনে করিয়ে দেয় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে তাদের প্রকৃত অবস্থান; প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় ভূমির অধিকারহারা মানুষগুলোর আর্থসামাজিক জীবনের অন্তর্লীন বৈপরীত্যকে। এই সার্বিক অবস্থা একটি প্রশ্ন আমাদের অহর্নিশ ভাবিয়ে তোলে; ভূমির অধিকারহারা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর জীবনে কবে বইবে সুবাতাস: ভূমি হবে দরিদ্র সাধারণ মানুষের বিস্তৃত জীবনের উজ্জ্বল, আলোকময় ক্ষেত্র? তাই প্রশ্ন জাগে, কবে হবে এই সাধারণ মানুষগুলোর জীবনে শঙ্খভোর?

ভূমির অধিকার নিয়ে এই বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পেছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলাসংশ্লিষ্ট যত আইন আছে,

১ 'ভূমি' (land) বলতে আমরা বুঝি, জমি—কৃষি ও অকৃষি, জলা (water-bodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ 'ভূমি' শুধু কৃষি জমি নয়; 'ভূমি' মানে কৃষি জমি, অকৃষি জমি, জলা-জঙ্গল-বন।

তার ওপর নিবিড় এক গবেষণায়[২] দেখা যায় যে বাংলাদেশে ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উভয়ই এখনো ঔপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। সংশ্লিষ্ট আইনগুলো কোনো বিবেচনাতেই দরিদ্রবান্ধব নয়। প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো আদৌ যথাযথ নয়। অনেক আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনই নেই, কোনো কোনো আইন আবার একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ী উন্নয়ন; সর্বোপরি দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে প্রতিফলিত নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করেনি। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিমূলক যে আইনি কাঠামো প্রয়োজন তা অনুপস্থিত। প্রায়োগিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো দরিদ্রবান্ধব নয়, জনকল্যাণমুখী। প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত এবং প্রায়োগিক সমস্যা তৈরি করে তীব্র ভূমি বিরোধ। ভূমি আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য একটি প্রায়োগিক কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আইনি বাস্তবায়নের বিষয়টি এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে 'বাদ পড়া' জনগোষ্ঠীকে 'অন্তর্ভুক্ত' করা সম্ভব হয়।

সমাধান-যাত্রায় সুফল লাভের জন্য প্রয়োজন নিবিড় গবেষণা, যা ভূমি আইনের সমস্যাগুলোর মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করবে; যা সমাধানের জ্ঞানভিত্তিক নৈতিক কাঠামো প্রণয়ন এবং রূপায়ণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কিন্তু, এ ধরনের গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি কী ধরনের, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে গবেষণা-ফলাফল দেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোর কোন স্তরের মানুষকে কতটুকু সুফল এনে দেবে। **দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ভূমিসংশ্লিষ্ট সরাসরি জীবিকা যাদের—কৃষি-জল-বন—তাদের উন্নয়ন যদি অভীষ্ট ধরি, তাহলে গবেষণাতাত্ত্বিক কোন কাঠামো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে তুলনামূলক অধিক কার্যকর হবে—সেটি আলোচনা করা হয়েছে এখানে। রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ সঠিকতার কোন মাত্রায় ফলাফল দেয়, তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।**

২. ভূমি আইন বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ভূমি এবং আইন এই দুইয়েই রয়েছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি। একটি রাষ্ট্রে—তা সে যে চরিত্রেরই হোক না কেন—ক্ষমতাকাঠামো নির্ণায়ক হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে। আর এই উপাদানগুলো আবর্তিত হয় সম্পদকে কেন্দ্র করে। প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকেই, আর সেই পথেই রাজনীতি—যা ক্ষমতাকাঠামো ঠিক করে—ঠিক করে ভূমির উপর প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মালিকানা এবং অধিকার কার থাকবে, কার থাকবে না। আবার, ভূমি যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সম্পদ, তাই সসীম এই সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যও তুলনামূলক বিচারে বেশি। আবার, ভূমির উপর অধিকার-মালিকানা-দখল যেহেতু ক্ষমতার পতাকাও ওড়ায় সগর্বে—তারও একটি মূল্য আছে, যা টাকার অংকে হিসেবে করা দুরূহ হলেও তা যে মূল্যবান—সেটি বলবার অপেক্ষা রাখে না। এ তো গেল ভূমির দিকটা। একই সাথে

---

২ দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী (২০০৯-২০১৩) পরিচালিত এই গবেষণা কাজটি বাংলাদেশের কৃষি-ভূমি-জলা-বনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও সংশ্লিষ্ট মেমো-সার্কুলার-বিধিমালার 'অধিকারভিত্তিক' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংবিধানের মৌলিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন প্রণয়নভিত্তিক ১৩ খণ্ডের দলিল। এই গবেষণার ব্যাপকতা, বহুমাত্রিকতা এবং পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনন্যতা থেকে বলা যেতে পারে- সম্ভবত এটাই উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের প্রথম গবেষণা দলিল। বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভূমিসংক্রান্ত আইন এবং নীতি। ভূমি আইনের রাজনৈতিক দিক অতি জোরালোভাবেই প্রকাশিত। রাজনীতি যেহেতু ক্ষমতার একটি হাতিয়ার, তাই এই হাতিয়ার ব্যবহার করে ভূমি-সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা সবসময়ই দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে আইন, বেশির ভাগ সময়ই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক-সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। আইন রাজনীতির গতিমুখ ঠিক করতে সক্ষম নয়, বরঞ্চ রাজনীতিই নির্ধারণ করে আইন কেমন হবে বা আইন কেমন হবে না।

অর্থাৎ, এখানে বিষয় মোটা দাগে ছয়টি:
— ভূমির রাজনীতি;
— ভূমির অর্থনীতি;
— আইনের রাজনীতি;
— আইনের অর্থনীতি;
— আইন বাস্তবায়নের রাজনীতি; এবং
— আইন বাস্তবায়নের অর্থনীতি।

কিন্তু এগুলোর একে-অন্যের সাথে রয়েছে নানামুখী, নানামাত্রিক, নানান মাত্রার নানান সম্পর্ক। ভূমির রাজনীতির সাথে কখনো মেলে আইনের রাজনীতি। আবার, আইনের অর্থনীতির সাথে মেলে ভূমির অর্থনীতি। এমন পারমুটেশন-কম্বিনেশনের অংক—তত্ত্বেই ঘটে। বাস্তব জীবনে এগুলো আলাদা হয়ে থাকে না, আলাদা করাও যায় না। যদি 'ভূমি আইন বাস্তবায়ন'কে একটি একক প্রপঞ্চও ধরে নিই, তাহলেও এটির রাজনীতিকে, এর অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত করা যাবে না।

এখানেই আসে রাজনৈতিক অর্থনীতি। এটি পরিষ্কার করে বলা ভালো যে 'ভূমি আইনের রাজনীতি'র সাথে ' ভূমি আইনের অর্থনীতি'কে যুক্ত করলে, তা কোনো অর্থেই 'ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি' হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, 'অর্থনীতি + রাজনীতি' ≠ রাজনৈতিক অর্থনীতি'।

আবার, অর্থনীতি বলতেই যেন আমরা 'চাহিদা', 'জোগান' এবং 'মুদ্রা'-এর অতি সরলীকরণে পড়ে না যাই। আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে অর্থনীতির বিস্তার প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক। বড়জোর, সরলীকরণের চেষ্টা করলে আমরা একে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়াদির সাথে মেলাতে পারি—যার ব্যাপ্তিও বিস্তৃত-বহুমাত্রিক। বিশেষায়িতকরণ (specialisation)-এর চক্করে আমরা বুঁদ হয়ে থাকি 'খুপড়িভুক্ত' (compertmentalised-এর বাংলা যদি ধরি 'কামরাভুক্ত', তবে আমাদের সচরাচর বিচরণ এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে—বড়জোর অপরিসর এক 'খুপড়ি'ঘরে) দৃষ্টিভঙ্গিতে—আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে।

এ কথা মনে রাখা চাই যে বৃহৎ পরিসরে, বড়-পর্দায় দেখা ব্যতীত গভীরে-অতিগভীরে প্রোথিত কোনো সমস্যা কিংবা বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ কখনোই উন্মোচিত হয় না। আবারও মনে করাই যে, রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে মেলালেই তা রাজনৈতিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে না; বরঞ্চ এটি অতি শক্তিশালী এক বিশ্লেষণ কৌশল—যা বহিরঙ্গের মধ্যে থেকেও বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় নেমেছি, অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক অর্থনীতি হতে পারে শক্তিশালী এক হাতিয়ার।

রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা কী বুঝি—সেটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এ দেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা বুঝতে কেন আমরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে চাই—সেটিই পরিষ্কার করতে চাই।

রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি যে শোষিতের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তটুকু শাসক (না'কি শোষক?) যে প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবস্থাপনা করে এবং সর্বোপরি আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি সেই পথ-পদ্ধতিটিই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যা ব্যবহার করে শাসক কায়েম রাখে শাসনব্যবস্থা।

আমাদের প্রেক্ষিতে (শুধু আমাদের বলি কেন, বিশ্বের নানান প্রান্তে—নানান চেহারায়, নানান মাত্রায় একই বিষয় বিদ্যমান), ভূমিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত প্রাপ্তি (কোনো অর্থেই শুধু ফসল নয়) তার উদ্বৃত্ত কীভাবে শাসক শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মসাৎ কওে, তা তাত্ত্বিকভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতির উপজীব্য একটি বিষয়। বলা ভালো, রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি 'ক্ল্যাসিক' উদাহরণ এটি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে 'আইন' আসছে কোথা থেকে? উত্তরটা সরল। যদিও তার পূর্বাপর মোটেও সরল নয়। আমাদের অনুধ্যানে 'আইন' এখানে হাতিয়ার মাত্র, যা পূর্বেই উল্লিখিত শাসক শ্রেণির পক্ষে আত্মসাৎ প্রক্রিয়াকে সচল রাখে—একটি শ্রেণিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে। অর্থাৎ, আইন এবং তার বাস্তবায়ন (বাস্তবায়ন নিজেও কিন্তু একটি আইনি বিষয়) এমন এক 'জাদুকরি' (মন্দ জাদু বলাই ভালো) হাতিয়ার হিসেবে কাজ কওে, যা শাসিত বা শোষিত শ্রেণির ভূমিনির্ভর অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু রীতিমতো ঘটা করে শাসক বা শোষকের আত্মসাৎ উপযোগী করে তার পাতে তুলে দেয়। এখানে উৎপাদন পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক কৌশল যাই থাকুক না কেন—দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র বা জমিদারি, সমাজতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ, অথবা এসবের মিশ্র কোনো হাইব্রিড—আইন এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির 'সুফল' (পড়তে হবে, আত্মসাৎকৃত অন্যায্য উদ্বৃত্ত) কোনো একটি 'শ্রেণি'ই পায়, সবাই পায় না—আইন এবং তার বাস্তবায়ন কাজ করে অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে, শাসক বা শোষকের স্বার্থ রক্ষাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

যতক্ষণ না, শাসক এবং শাসিত একই সত্তা হচ্ছেন অর্থাৎ, "শাসক = শাসিত" না হচ্ছেন, অথবা নিদেনপক্ষে 'প্রায়' সমান (শাসক ≅ শাসিত) না হচ্ছেন; ততক্ষণ পর্যন্ত আইন এবং তার বাস্তবায়ন শুধু শাসক বা শোষক শ্রেণির হয়েই বিরাজমান থাকবে—আইনের দেবী থেমিসের সাধ্য নেই যে নিজের চোখ বেঁধে সবাইকে একই দাঁড়িপাল্লায় মাপবেন; শাসিক বা শোষিত শ্রেণি ওজনে বরাবরই কম পাবেন, কিংবা পাবেনই না আদৌ, অথবা পেলেও শাসক বা শোষকের ছড়িয়ে দেওয়া খুদকুঁড়োটুকু পেয়েই খুশি থাকতে হবে—যাকে আবার অনেকেই 'ট্রিকেলডাউন ইফেক্ট' বলে, তার সুফল ভেবে আত্মতৃপ্ত থাকতে চান।

এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো: যেখানে 'শাসক = শাসিত' হওয়াটাই আদর্শ অবস্থা, যেখানে আমরা কেন শাসন এবং শাসিতের 'প্রায় সমান (≅)' অবস্থার কথাও বললাম? এর উত্তর একটু পর দেব। তবে, এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায়, আর সব ক্ষেত্রের মতোই, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন ঐতিহাসিকভাবেই এমন করেই হয়ে আসছে যেন 'শাসিত' কখনোই 'শাসক'-এর সমান তো দূরের কথা কাছাকাছিও হয়ে উঠতে না পারেন। বরঞ্চ আইন এবং আইনের বাস্তবায়ন এমনভাবেই হয় যেন ওই উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাৎ করতে শাসকের কোনোই বেগ না পেতে হয়; কোনো দিক থেকে কোনো রকম বাধা আসবার সব সম্ভাবনাকেই রুদ্ধ করা হয়। বড়জোর 'সিভিল সোসাইটি'র নাম দিয়ে এক-আধটু রঙিন আশার পতাকা সামনে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয় শাসকের দিক থেকেই—তাতে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই ইন্ধনই থাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সব 'বড় বড় নীতিনির্ধারক'দের দিক থেকে।

৩. ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ: উপযোগিতা প্রশ্ন

একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং সে প্রশ্ন যৌক্তিকও বটে যে—আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে এসেই থাকি যে ভূমি আইন শুধু শাসকের পক্ষেই যাবে এবং তা শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের নামে আত্মসাতেই ব্যবহৃত হবে, তাহলে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কী হবে? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট উত্তর। উত্তরগুলো কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা যায়। যথা—

ক জ্ঞানচর্চা একটি নির্মোহ প্রক্রিয়া। এখানে পক্ষ-বিপক্ষনির্বিশেষে নতুন তথ্য, নতুন বিশ্লেষণ, নতুন চর্চা ঘটাটাই স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ চর্চা। এই জ্ঞানচর্চার ফল, তাৎক্ষণিকে কে পেল, সেটি বিবেচনা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য নয়।

খ পদ্ধতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণ কৌশল নানান ধরনের হয়। গবেষণার ফলাফল, বিশেষ করে সামাজিক গবেষণা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে, কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপরও নির্ভরশীল। গবেষণা ফলাফল, তা যে যতই শক্ত অনুমিত ধারণার (Assumption অর্থে) ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াক না কেন—তার গুণগতমান এবং নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিকতার ওপরও নির্ভর করে। সেই বিবেচনায়, ভূমি আইন এবং সেই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক-অর্থনীতি"ভিত্তিক হাতিয়ার ব্যবহার একটি নবতর সংযোজন এতদ্সংক্রান্ত ডিসকোর্সে। বিশেষ করে, আমরা এখানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' (operational definition) নির্ধারণ করেছি সেটির যেমন তাত্ত্বিক একটি গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি একইসাথে ওই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিও এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা, যা সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে, সহায়তা করবে।

গ কাগজে-কলমে গবেষণার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করি। তারপরও গবেষণাফলাফলের ব্যবহারিক দিকটিও আমরা বিবেচনায় নিই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, বিশেষ করে তা যদি আমাদের বিদ্যমান সমাজকাঠামোরা নিচতলার মানুষের, অধিকারহীনতা-দরিদ্র-বঞ্চনা লাঘবে একটু হলেও শক্তি জোগায় তাহলে সেই গবেষণা এবং গবেষণা ফলাফলের প্রচারণাকে আমরা নৈতিক অবস্থান থেকেই সমর্থন করি। ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজগঠনে এটা গবেষকের দায়বদ্ধতাও বটে।

৪. নমুনা ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ

এ কথা আমাদের জানাই ছিল—বাংলাদেশের ভূমি আইন দরিদ্র বান্ধব নয়; নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীর ভূমি অধিকার রক্ষায় কার্যকর। জমি-জলা-জঙ্গলে যাদের অধিকার নিশ্চিত হবার কথা ছিল সর্বাগ্রে, সেই কৃষক-জলাজীবী-বনজীবী মানুষ এই পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্যজন—সর্বাথেই অপাঙ্ক্তেয়, কৌলীন্যহীন। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো—কোথাও তাদের ঠাঁই নেই, বরঞ্চ তাদের উৎপাদনের 'উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাতের 'কারেন্ট জাল' বেছানো সর্বত্র—জাল ছিঁড়ে বেরোনোর কোনোই উপায় নেই। ভূমি আইনের সমস্যা অগুনতি। আইনে রয়েছে অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, সাংঘর্ষিকতা। আর অন্যান্য গবেষণা—যার অনেকটাই এই গ্রন্থের লেখকদেরই করা—এটা নিশ্চিত করেই দিয়েছে যে: আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিমূলক যে আইনি কাঠামো প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে অনুপস্থিত।

আমরা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র লেন্সে এ দেশের কয়েকটি ভূমি-আইন—যার সাথে কৃষক-দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানষের প্রকৃত, অধিকারভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক—বিশ্লেষণ করেছি, খুঁজে বের করেছি সেগুলোর বাস্তবায়ন সমস্যা, বের করতে চেয়েছি উত্তরণের পথপন্থা।

আর যদি খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের প্রসঙ্গগুলো টানি—তাহলে, এটি নগ্নভাবেই দৃশ্যমান যে এই অতি জরুরি বিষয়সমূহ আইনগুলোতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত নয়। আর এটাও বলা ভালো যে আইনের এসব দুর্বলতা কিন্তু কোনো 'মানবিক ভুল' (human error) নয়—এটি ইচ্ছাকৃত, দূরভিসন্ধিমূলক এবং এমনভাবেই করা, যেন সকল নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে শাসিত সমাজের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু বিনা বাধায় আত্মসাৎ করা যায় ।

ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা বোঝার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি ৫টি বিষয়:

১) কৃষি খাস জমি;
২) অকৃষি খাস জমি;
৩) জলমহাল;
৪) অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল; এবং
৫) ভূমি ব্যবহার।

এই পাঁচটি বিষয়কে বেছে নেবার পেছনে প্রধানতম কারণটি হলো এই বিষয়গুলোর সাথে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর অধিকার এবং উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। এ দেশে কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ও জলা কৃষিজীবী দরিদ্র এবং ভূমিহীন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের নেতিবাচক প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্ষমতাহীন মানুষ। ভূমির ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করা এই শ্রেণির প্রকৃত উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদে তো বটেই, দীর্ঘ মেয়াদে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিষয়সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ৫টি আইনি দলিলের[৩] বাস্তবায়ন অবস্থার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১) কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭;
২) অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫;
৩) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯;
৪) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭; এবং
৫) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১।

---

৩ একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিষয়-সংশ্লিষ্ট এই আইনি দলিলগুলোর নাম-ই গবেষণা শুরুর আগেই এই বিষয়গুলোর প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলার (আমাদের দৃঢ় সন্দেহ, এই অবহেলা ইচ্ছেকৃত এবং মন্দ উদ্দেশ্যে) কারণ পরিষ্কার করে দেয়। ভূমিসংক্রান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ ৫টি বিষয়—যার সাথে কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন নিবিড়ভাবে জড়িত—এর মধ্যে ৪টি বিষয়েই কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন নেই, নীতিগুলোও বেশ পুরানো। শুধু অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিষয়ে রয়েছে একটি আইন, যার কোনো বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। এদেশে অগুণীত আইন, অথচ এই বিষয়ে আইন এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই দেখিয়ে দেয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে (যে দৃষ্টিতে কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বই যেন ধরা পরে না) যা শুধু হতাশা ও ক্ষোভেরই জন্ম দেয়।

আমরা অনুসন্ধান করেছি ভূমি আইন/নীতির বাস্তবায়ন সমস্যা। নিবিড়ভাবে অনসুন্ধান করেছি—বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো কী কী, কীভাবে তৈরি হয়েছে এই বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো (প্রক্রিয়া, দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান), সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী (বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী) এতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং আইনের ব্যত্যয়গুলো ঘটছে কোন মাত্রায়। যে দুটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা হলো: (১) অধিকারভিত্তিক ভাবনা; এবং (২) কৃষি-জলা-বনজীবী মানুষ, নারী, দরিদ্র, আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর 'চোখ দিয়ে দেখা' (অন্তত দেখবার চেষ্টা করেছি)।

আমরা প্রতিটি আইনের আইনি অবস্থার পাশাপাশি বাস্তবায়ন অবস্থার একটি স্কোরিং করেছি, যেন একনজরে আইনটির অবস্থা কেমন—সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পরিস্ফুট হয় কোথায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আইনি অবস্থার স্কোরিং করা হয়েছে ৪টি নির্দেশক ব্যবহার করে; যেগুলো হলো—(১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব। আইনের বাস্তবায়ন অবস্থার স্কোরিং করা হয়েছে ৮টি নির্দেশক ব্যবহার করে; যেগুলো হলো: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। এই স্কোরিংটি করা হয়েছে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে।[৪]

বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৫.৩৪ শতাংশ খাস জমি, যার পরিমাণ ১২ লক্ষ একর। বাংলাদেশে অকৃষি খাস জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য—মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ একর। সবকটি মেট্রোপলিটন এলাকা, পৌর এলাকা এবং থানা সদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাস জমিও অকৃষি খাস জমি এবং ওইসব এলাকার বাইরে কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সমস্ত জমি অকৃষি খাস জমি হিসেবে বিবেচিত (অনুচ্ছেদ ২, অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫)। সরকারি সব জমিই খাস জমি নয়। খাস জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন; সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মালিকানাধীন জমি খাস জমি নাও হতে পারে। খাস জমির প্রধান উৎসগুলো হলো: পয়োস্তি জমি[৫], নতুন সৃষ্ট চর

---

৪ বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজন-ভুক্তভোগীদের সাথে ভূমি আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা পূর্বনির্ধারিত কয়েকটি নির্দেশকের আইনি এবং তার বাস্তবায়ন অবস্থাকে '০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং করতে অনুরোধ করেছিলাম– যেখানে '০' নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ দশা, অন্যদিকে '৫' মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। এই স্কোরিং-প্রক্রিয়ায় সবাই যে সব নির্দেশকের সাপেক্ষে স্কোরিং করেছেন এমন নয়– যিনি যে বিষয়ে ভালো জানেন, তিনি শুধুমাত্র ঐ নির্দেশকের জন্যই স্কোরিং করেছেন। প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে আমরা যখন প্রতিটি নির্দেশকের জন্য গড় স্কোর বের করেছি: মোট স্কোরকে (যারা যারা যে নির্দেশকের জন্য স্কোরিং করেছেন, সেই স্কোরসমূহের যোগ) ভাগ করা হয়েছে ওই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যতজন স্কোরিং করেছেন সেই সংখ্যা দিয়ে। এক-এক নির্দেশকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ভিন্ন। এরপর সবশেষে সব নির্দেশকের গড় স্কোরকে নির্দেশকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে কোনো নির্দিষ্ট আইনের অবস্থার স্কোর বের করা হয়েছে। বিস্তারিত গবেষণা-পদ্ধতির জন্য দেখুন বারকাত, আ., সোহ্‌রাওয়ার্দী, গা. মো., ওসমান,আ., ও ইসলাম, মো. অ. (২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: *বাংলাদেশে খাস জমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

৫ 'পয়োস্ত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো—সংযুক্ত বা একত্রভূত হওয়া, যাকে আইনি ভাষায় 'পয়োস্তি' বলে। কোনো জমি সাগর বা নদীর গতিপথের পরিবর্তনের কারণে কিংবা নদীর পানি সরে যাওয়ার ফলে জেগে উঠলে অথবা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমি পুনরায় ভেসে উঠলে তাকে পয়োস্তি বলা হয়। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

জমি[৬], সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি[৭], বাতিল মালিকানার জমি, নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত সরকারের জমি, রেজিস্টার ৮-এ উল্লেখিত কয়েক ধরনের জমি[৮], বিভিন্ন সরকারি এবং আধা-সরকারি সংঘের অব্যবহৃত পুকুর (বারকাত, জামান এবং রায়হান, ২০০৯)। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, এবং জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যায়ন যত হচ্ছে, ততই কমছে আবাদী জমির পরিমাণ; হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা। তাই কৃষি খাস জমির ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাস জমি দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার কথা—খাস জমি, বিশেষত কৃষি খাস জমি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার। কিন্তু কৃষি খাস জমির কেবল ১১.৫ শতাংশ কার্যকরভাবে তাদের হাতে আছে; বাকি ৮৮.৫ শতাংশই ক্ষমতাশালী ভূমিগ্রাসীদের অবৈধ দখলে (Barkat, Suhrawardy & Rahman, 2019)। লেখচিত্র ১-এ বাংলাদেশে খাস জমির অবস্থা দেখানো আছে।

লেখচিত্র ১: বাংলাদেশে খাস জমির অবস্থা

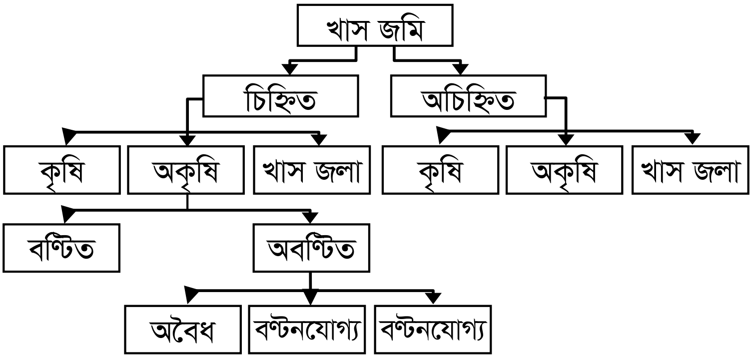

সূত্র: বারকাত, জামান এবং রায়হান (২০০৯)

খাস জমি, যা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য—তা তারা পান না, পেলেও ধরে রাখতে পারেন না। এ সংশ্লিষ্ট আইনি দলিল খাস জমিতে, তা সে কৃষি কিংবা অকৃষি থেকে, 'অধিকারহীন'-এর অধিকার নিশ্চিত করে না মোটেও। আইন বাস্তবায়ন—অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা, বন্দোবস্ত এবং ধরে রাখবার (retention)

---

৬ 'নতুন সৃষ্ট চর জমি' হলো—নদীবাহিত পলি ও কাদা আঁকাবাকা চলার পথে নদীগর্ভে জমাট বেঁধে নদীর মোহনায় বা সঙ্গমস্থলে নতুন চরের সৃষ্টি করে অথবা অবস্থিত ভূমির আয়তন বৃদ্ধি করে। ১৯২০ সালের অ্যালুভিয়াল ল্যান্ডস অ্যাক্টে চরের জমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এটাতে বলা হয়েছে যে: চরের জমি বলতে এমন জমিকে বোঝাবে, যা ১৮২৫ সালের বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যান্ড ডিলুভিয়ন রেগুলেশন, ১৮৪৭ সালের বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যান্ড ডিলুভিয়ন অ্যাক্ট অথবা ১৮৬৮ সালের বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টে বর্ণিত উপায়ে সাগর অথবা নদীতে জেগে উঠেছে এবং এটি "Reformation In Situ" (স্বস্থানে পয়োস্তি) মতবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

৭ 'সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি' হলো—ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি সিলিংয়ের ৬০ (ষাট) বিঘার বেশি জমি কৃষি জমি অর্জন করে, তাহলে সেটা ভূমি সিলিং নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত জমি হিসেবে গণ্য হবে এবং ওই অতিরিক্ত জমি সরকারের কাছে অর্পিত হবে।

৮ ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কর্মসূচি ১৯৮৭ অনুযায়ী অনেক ধরনের খাস জমির মধ্যে 'রেজিস্টার বা নিবন্ধনগ্রন্থ-৮ এর তিনটি অংশের খাস জমিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যথা—১) নিবন্ধনগ্রন্থ ৮-এর ২য় অংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি (বন্দোবস্তের উপযোগী); ২) নিবন্ধনগ্রন্থ ৮-এর ১ম অংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি (অবাধ অধিকারসহ) যেগুলোর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়েছে; এবং ৩) নিবন্ধনগ্রন্থ ৮-এর ৫ম অংশের অন্তর্ভুক্ত কৃষি (সংস্কারকৃত) জমি।

উপায়—এমনভাবেই হয় যে, সেখানে দরিদ্র-ভূমিহীন মানুষের কার্যকর কোনো অংশগ্রহণ থাকে না; বলা ভালো, থাকতে দেওয়া হয় না। যারা বন্দোবস্ত পানও কপালগুণে, তাদের সেই বহু আরাধ্য জমিটুকুর দখল বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়েও অনুপস্থিত একটি কার্যকরী নির্দেশনা। এ ছাড়া শ্রেণিকাঠামোর গড়নটিই এমন যে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমিটুকু ধরে রাখারও কোনো উপায় খুঁজে পান না শ্রেণিকাঠামোর মইয়ের 'নিচের ধাপের' মানুষ। আইন ও তার ব্যবস্থাপনা কাঠামোটাই এমন যে খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহকগণ (যারা শাসক/শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই করেন মূলত) পুরো প্রক্রিয়াটিকেই করে তোলে স্বেচ্ছাচারমূলক—যেখানে স্পষ্ট হয়ে থাকে অধিকার, ক্ষমতা, এবং দায়িত্বের ভারসাম্যহীনতা। ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে যারা বরাদ্দ পান, তাদের জন্যও ওই বরাদ্দপ্রাপ্ত খাস জমি অধিকারে রাখার ন্যূনতম কোনো ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। খাস জমি—কৃষি এবং অকৃষি দুই ক্ষেত্রেই—ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই শাসক শ্রেণির দ্বারা (by) এবং শাসক শ্রেণির জন্যই (for)।

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কৃষি খাস জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দুই যুগ আগে প্রবর্তিত একটি নীতিমালার (কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭) মাধ্যমে কৃষি খাস জমির বণ্টন, বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। কালের পরিক্রমায় নীতিমালাটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয়বিধ সীমাবদ্ধতা হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। 'অধিকার' মানদণ্ডে নীতিমালার বেশ কিছু নীতি ভালো। কিন্তু 'মন্দ' নীতিগুলোর বাস্তবায়নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এ সবচেয়ে খারাপ দশা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অসামর্থ্য'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ২.৩)। তারপর, মন্দ অবস্থার নীরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে যৌথভাবে 'অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা' ও 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব'—এই দুইটি নির্দেশক (উভয়ের স্কোর: ৩.৪)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) নির্দেশকটি। লেখচিত্র ২-এ বিষয়টি একনজরে দেখা যাচ্ছে। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.২।

লেখচিত্র ২: স্কোরিং – 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর আইনি সমস্যা

('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.২

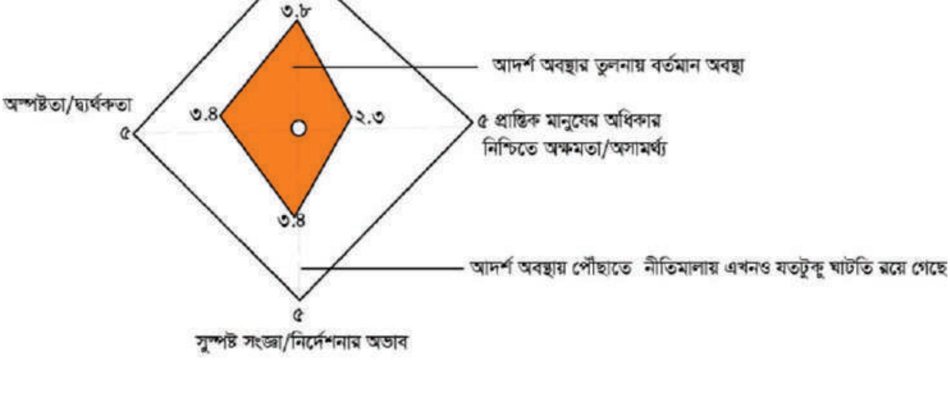

অন্যদিকে 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে—'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি'—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ০.৯। এর পরের অবস্থানের নির্দেশকটি হলো 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব' (স্কোর, ১.১)। কাছাকাছি রকম মন্দ অবস্থায় আছে 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন', 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/ দপ্তর' এবং 'সমন্বয়হীনতা'—এই তিনটি নির্দেশক, যাদের প্রতিটিরই স্কোর ১.২। বাকি তিনটি নির্দেশকের অবস্থাও ভালো নয় মোটেও: 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি' (স্কোর ১.৯), 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর ১.৮) এবং 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন'—এই নির্দেশকের স্কোর ১.৭। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ১.৪, অর্থাৎ মন্দ দশা, যা সন্তোষজনক নয়। লেখচিত্র ৩-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো অছে।

লেখচিত্র ৩: স্কোরিং – 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
("০" থেকে "৫"-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ১.৪

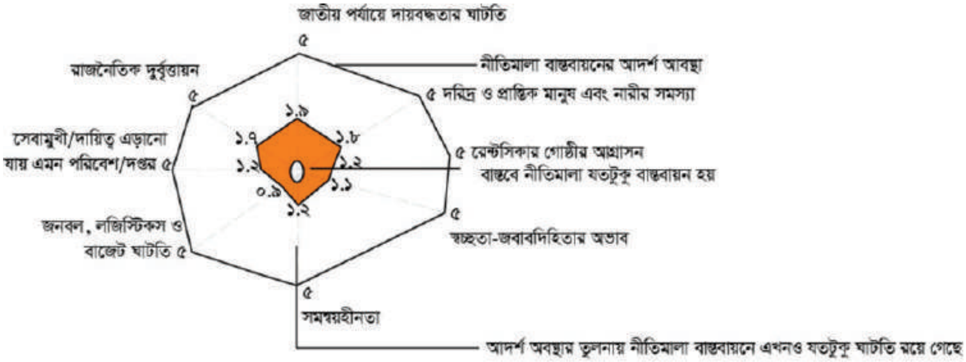

অকৃষি খাস জমিসম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনটি হচ্ছে 'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'। আড়াই দশকের পুরোনো এই নীতিমালার যেমন নীতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যবহারিক সমস্যাও। এ নীতিমালার অন্তর্নিহিত সমস্যাই অকৃষি খাস জমি বিতরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধা। সামাজিক বৈষম্য প্রশমিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি মূল উদ্দেশ্য হলেও প্রক্রিয়াগত অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে অকৃষি খাস জমির বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনা ব্যাপক সমালোচিত একটি বিষয়।

'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসামর্থ্য'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ২.২)। মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ৩.৩। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে বাকি দুটি নির্দেশক, 'সাংঘর্ষিকতা' ও 'অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা' (উভয়ের ক্ষেত্রেই স্কোর: ৩.৪)। লেখচিত্র-৪ এ বিষয়টি একনজরে দেখানো হলো। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.১।

লেখচিত্র ৪: স্কোরিং —'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.১

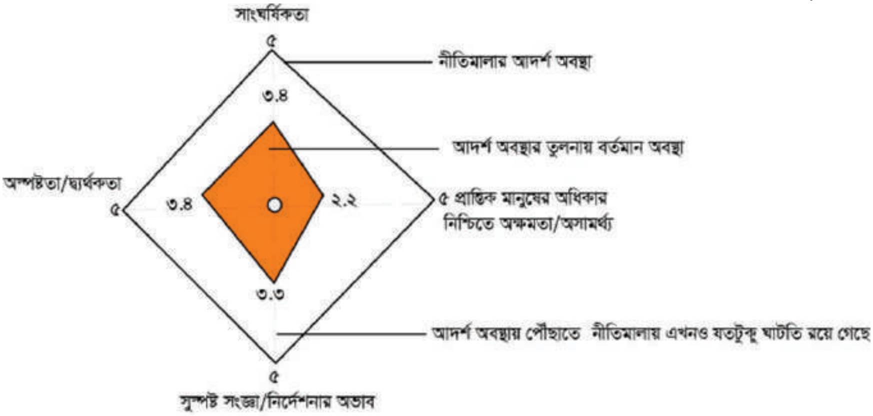

অন্যদিকে, 'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' ও 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন'—নির্দেশক দুটি, উভয়েরই স্কোর ০.৮। এর পরের অবস্থানের নির্দেশকটি হলো 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর' (স্কোর: ০.৯)। কাছাকাছি মন্দ অবস্থায় আছে 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব', 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি' এবং 'সমন্বয়হীনতা' নির্দেশকগুলো (প্রত্যেকেরই স্কোর ১.১)। সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা নির্দেশক 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা'-এর অবস্থাও ভালো নয় মোটেও; স্কোর: ১.৭। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ১.১, অর্থাৎ, মন্দ অবস্থা, যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। লেখচিত্র ৫-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: স্কোরিং—'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ১.১

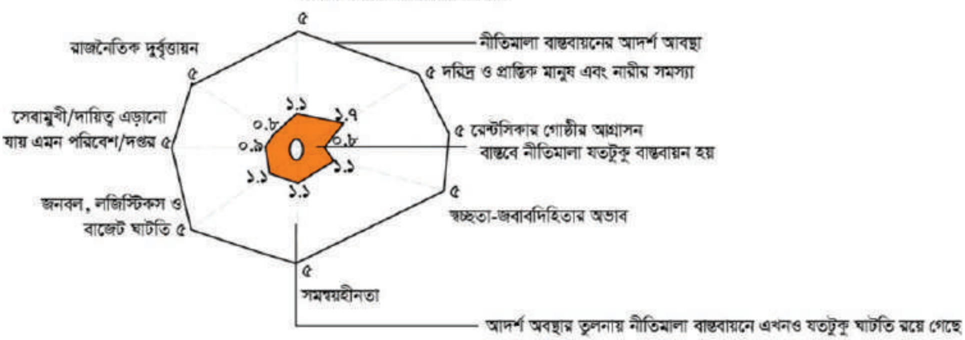

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' অনুযায়ী, জলমহাল হলো সেইসব জলাশয় যা বছরের একটি সময় বা সারাবছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দিঘি, খাল, নদী, সাগর নামে পরিচিত। জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুর্সীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুর্সীমা থাকবে না। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে জলমহালের সংখ্যা হলো: ২০ একরের ঊর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা ২,৪৯৭টি; ২০ একরের নিচে জলমহালের সংখ্যা ৩২,৮৪২টি। "জল যার জলা তার"—এই ন্যায্য নীতির কোনো বাস্তবায়নই দেখা যায় না সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। এ দেশের প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের জীবন জলকেন্দ্রিক, অথচ এর দুই-তৃতীয়াংশ বাস করতে বাধ্য হন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে—যার শুরুটা হয় মন্দ আইন এবং সেই মন্দ আইনের মন্দতর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। জলমহালসংশ্লিষ্ট আইনি দলিলকে আপাতদৃষ্টিতে মৎসজীবীদের জন্য অনুকূল মনে হতে পারে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন—যা আইনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এমনই, যে তা অতি 'সতর্ক'ভাবে এই মৎস্যজীবীদের 'বহিঃস্থ' করে রাখে। প্রবেশ করে 'মৎস্যজীবী' পরিচয়ে 'ক্ষমতাশালী মৎস্যজীবী'রা—তারাই শাসক, তারাই লুটেরা। নারী? সে তো পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্য—ক্ষমতাহীনের মধ্যে আরও ক্ষমতাহীন। এ দেশে ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে এখন মাত্র ১০ শতাংশ এ পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। জল-জলাসমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্যজীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব, যদি দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে "জাল যার, জলা তার"। এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টিসংক্রান্ত দারিদ্র্য (income-food-nutrition poverty) দূর হতে পারে যথেষ্ট মাত্রায়। এসবই মৎস্য খাতের ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত ৪৩ লক্ষ হেক্টর জলাভূমি ও ৭১০ কিলোমিটার উপকূল। বছরে আনুমানিক প্রায় ১৭-১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মৎস্য রপ্তানি থেকে আয় বৃদ্ধি পেলেও মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা একচুলও কমেনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও যে দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস নাও পেতে পারে, এ দেশের মৎস্য খাত তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এই সমীকরণ পরিবর্তন সম্ভব, যখন মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে আর সেই সাথে মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য কমবে। বিষয়টি জল-জলায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মালিকানা ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। প্রকৃত অর্থেই, এটি জলা সংস্কারের (aquarian reform) বিষয় (বারকাত, ২০১৬)।

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-তে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসামর্থ্য'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ৩.১)। তারপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশক (স্কোর: ৩.৩)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) ও 'অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা' (স্কোর: ৩.৮) —এই দুটি নির্দেশক। লেখচিত্র ৬-এ বিষয়টি একনজরে দেখা হলো। এই নীতিটির ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.৫।

লেখচিত্র ৬: স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর আইনি সমস্যা

('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.৫

অন্যদিকে, 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে—'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' (স্কোর: ০.৬) ও 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' (স্কোর: ০.৭) —এই দুটি নির্দেশক। এর পরের অবস্থানে রয়েছে 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি' নির্দেশকদ্বয় (উভয়েরই স্কোর ০.৮)। কাছাকাছি খারাপ অবস্থানে রয়েছে 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর' ও 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব'—এই দুইটি স্কোর এবং এদের প্রত্যেকের স্কোর ০.৯। বাকি দুটি নির্দেশক 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি' ও 'সমন্বয়হীনতা'-এর অবস্থাও ভালো নয় মোটেই, স্কোর ১.১। নীতিটির বাস্তবায়নের গড় স্কোর ০.৯, অর্থাৎ অত্যন্ত মন্দ অবস্থা। লেখচিত্র ৭-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৭: স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা

('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৯

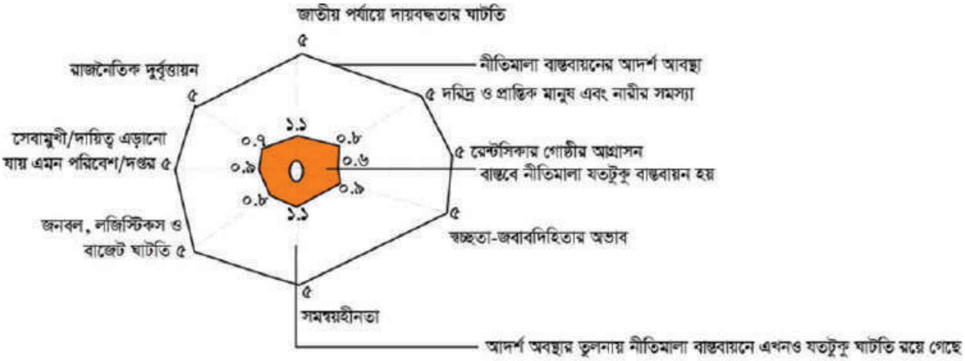

"অধিগ্রহণ' হলো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ। অন্যদিকে 'হুকুমদখল' হলো ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার সাময়িকভাবে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ। আমাদের এই দেশে— যেখানে জনঘনত্ব অত্যধিক এবং কৃষি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত সামাজিক-মইয়ের নিচের দিকের মানুষের জন্য—স্বভাবতই, 'অধিগ্রহণ' এবং 'হুকুমদখল' ভূমি ডিসকোর্সে অতীব দরকারি। এ জন্য আইন আছে । কিন্তু এই আইনে উল্লেখই হয়নি 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ'- এর মতো দরকারি সব শব্দের সংজ্ঞা। অন্তর্ভুক্ত হয়নি 'পুনঃবন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'আর্থসামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' ইত্যাদির মতো বিষয়। ক্ষতিপূরণ মানেই আর্থিক (financial), অ-আর্থিক (non-financial) ক্ষতির বিষয়ে এই আইন নিশ্চুপ। অধিগ্রহণের ফলে যে ব্যক্তি স্থানান্তরে বাধ্য হন, সেই স্থানান্তরের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর ব্যত্যয় ঘটানোই যেন রীতি। ধনীরা ক্ষতিপূরণ পান দ্রুত, দরিদ্রদের ঘুরতে হয় দিনের পর দিন—তারপরও যদি কিছু পান, তার পরিমাণও হয় নগণ্য। হুকুমদখলের ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেসব মানদণ্ড ক্ষমতাসীনের পক্ষেই যায় শুধু। বিশেষ করে ওই জমির মালিক যদি হন দরিদ্র-প্রান্তিক-নারী-আদিবাসী-প্রতিবন্ধী তবে তো তার কণ্ঠ অশ্রুতই থেকে যায়।

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-তে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ১.৯)। তারপর মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা/অসামর্থ্য'— এই নির্দেশকটি (স্কোর: ২.২)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) এবং 'অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা' (স্কোর: ৩.২)-এ দুটি নির্দেশক। লেখচিত্র ৮-এ বিষয়টি একনজরে দেখা যাচ্ছে। এই আইনের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২.৮।

লেখচিত্র ৮: স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর আইনি সমস্যা

('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ২.৮

অন্যদিকে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০০৭'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' এবং 'সমন্বয়হীনতা' এই দুটি নির্দেশক, দুটির স্কোরই ০.৬। কাছাকাছি রকম মন্দ অবস্থায় আছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' (স্কোর ০.৮) এবং 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর ০.৭)-এ দুটি নির্দেশক। বাকি ১২টি নির্দেশকের অবস্থাও মোটেও ভালো

নয়: 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'সেবাবিমুখী/ দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন দপ্তর' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি'-এই তিনটি নির্দেশকেরই স্কোর ১.১। 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব' এই নির্দেশকটির স্কোর ০.৯। আইন বাস্তবায়নের গড় স্কোর মাত্র ০.৮, অর্থাৎ অতি মন্দ অবস্থা। লেখচিত্র ৯-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৯: স্কোরিং— 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৮

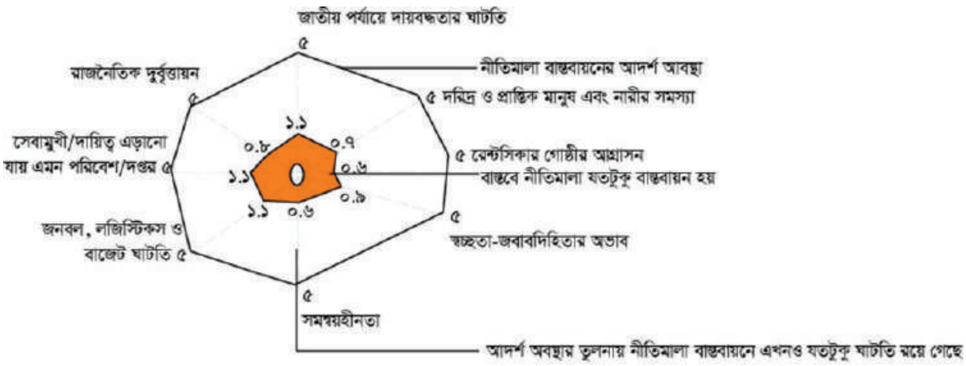

এককভাবে ভূমির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে কৃষি ভূমির ব্যবহার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি; আর কৃষি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ হেক্টর, এর মধ্যে চাষযোগ্য জমি মাত্র ৮০ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর (মোট ভূমির প্রায় ৫৫.৩৮%)। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পোন্নয়নের ফলে এ দেশের কৃষি ভূমি প্রতিনিয়ত কমছে। প্রতিবছর নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমি। এ ছাড়া বাড়তি জনসংখ্যার জন্য বাড়ছে আবাসন খাতে কৃষি জমির ব্যবহার। বছরে শুধু নতুন ঘর-বাড়ি নির্মিত হচ্ছে প্রায় ৭১২ হেক্টর জমিতে। নির্মাণকাজে প্রতিবছর ৩ হাজার হেক্টর জমি চিরস্থায়ীভাবে কৃষির অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন গড়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের ২৬৮ হেক্টর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে এখনো অব্যাহত (Barkat, Suhrawardy & Osman, 2015)। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, বাণিজ্যিক কারণেও প্রতিদিন গড়ে ২৮০ হেক্টর কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। জলাশয় ভরাটের কারণে প্রতিদিন কৃষি জমি কমছে ৯৬ বিঘা। তামাক চাষের কারণে প্রতিদিন ৯ হাজার একর কৃষি জমি উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে। কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমান এ ধারা বর্তমানে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কৃষি জমি অ-কৃষি খাতে চলে যাওয়ায় প্রতিবছর ৪০ হাজারের বেশি প্রান্তিক চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন (Barkat, Suhrawardy & Ghosh, 2011)। এভাবে কৃষিজমি কমতে থাকলে ভবিষ্যতে দেশে একদিকে যেমন ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়বে, একই সাথে শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতে গ্রামের মানুষের সংখ্যা বেড়ে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশে খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। ফলে খাদ্য উৎপাদনসহ জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যেই

আবহমানকালের সুজলা–সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার চিরচেনা সেইরূপ আজ প্রায় বিলুপ্তের পথে (Barkat et al., 2014)। আমাদের এই দেশে জমি ব্যবহার হয় যার-যার ইচ্ছেমতো—না, বলা ভালো যে কাজটি হয় শাসকের ইচ্ছেমতো। ফলে কমে কৃষি জমি, কমে জলা, বাড়ে ভূমিহীন কৃষক-জলাজীবী মানুষ। বাড়ে দারিদ্র্য, বাড়ে প্রান্তিকতা। পরিবেশ অমূল্য। অথচ আমাদের ভূমির ব্যবহার—অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে—এমনভাবেই হচ্ছে যে পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে ভোগ করতে হবে পরম্পরায়। আইনি দলিল একটা আছে বটে, কিন্তু তা কাগজেই। রাষ্ট্রের যেখানে দায়িত্ব ছিল তার জনগণের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং অধিকার নিশ্চিত করা—সেখানে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হবার 'রকেট গতির প্রতিযোগিতা'য় প্রতিনিয়ত ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে বর্তমানসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব' নির্দেশককে (স্কোর: ০.৯)। এরপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অসামর্থ্য' নির্দেশকটি (স্কোর: ১.২)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা ও 'অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা'—এই দু'টি নির্দেশক (উভয়ের স্কোর: ৩.৫)। লেখচিত্র ১০-এ বিষয়টি একনজরে দেখানো হয়েছে। এই নীতির ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২.৩।

লেখচিত্র ১০: স্কোরিং – 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০= সবচেয়ে মন্দ, ৫= সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ২.৩

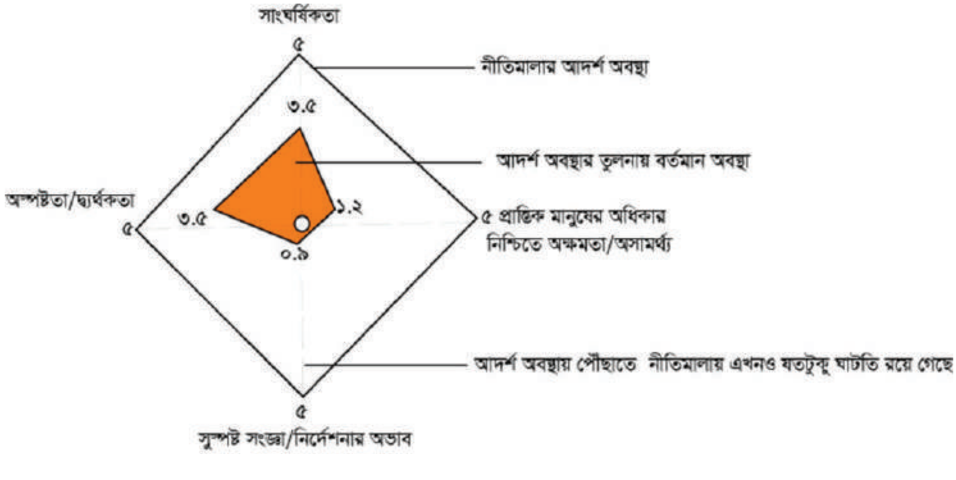

অন্যদিকে, 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে— 'সমন্বয়হীনতা'—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ০.৩। এর পরের অবস্থানে রয়েছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' ও 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' নির্দেশক দুটি (উভয়ের স্কোর ০.৭)। কাছাকাছি মন্দ অবস্থায় থাকা পরবর্তী দুটি নির্দেশক হলো: 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর, ০.৮) এবং 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব' (স্কোর, ০.৮)। বাকি তিনটি নির্দেশক যথাক্রমে 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/ দপ্তর' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি'-এর

অবস্থাও বেশ মন্দের দিকেই, যাদের প্রতিটির স্কোর ১-এর কম (০.৯)। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ০.৮, অর্থাৎ, অত্যন্ত মন্দ—যা গবেষণাধীন সব আইন বা নীতির বাস্তবায়নের গড় স্কোরের (১.০) চেয়েও কম। লেখচিত্র ১১-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ১১: স্কোরিং —'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৮

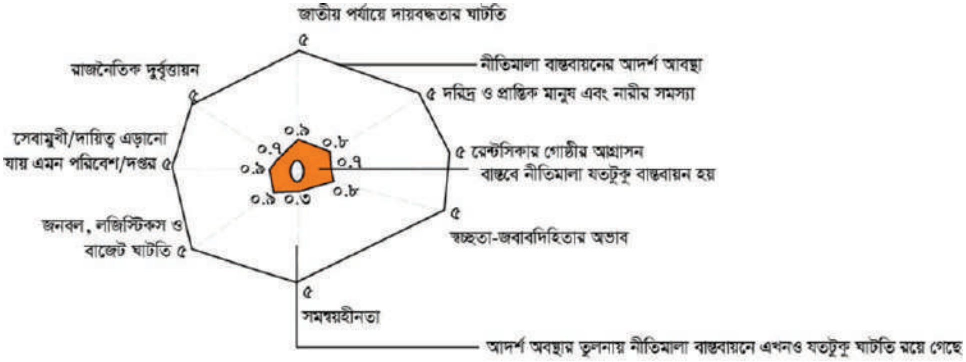

৫টি আইন/নীতিতেই যেমন রয়েছে সমস্যা, তেমনি প্রতিটিতেই বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট। তুলনামূলক বিচারে আইন/নীতিতে সমস্যা এবং বাস্তবায়ন সমস্যা, এই দুই বিচারেই সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত হলো: জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১। সমস্যাগ্রস্ততার বিচারে দ্বিতীয় আইনটি হলো 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭'। লেখচিত্র ১২-এ এই ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং এর বাস্তবায়ন সমস্যার একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখচিত্র ১২: ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং বাস্তবায়ন সমস্যার তুলনামূলক চিত্র
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

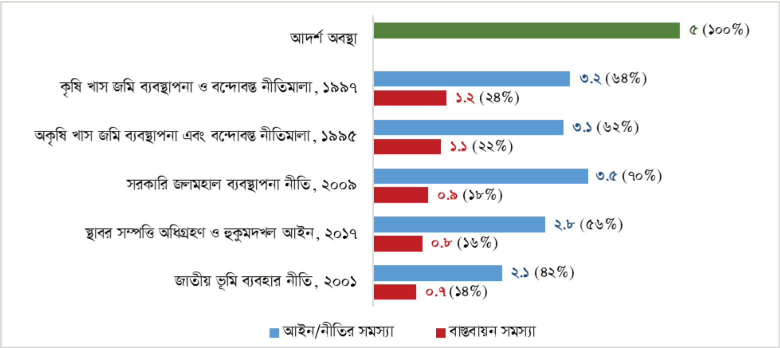

নোট: আদর্শ স্কোর ৫, অর্থাৎ ১০০%; আইনি সমস্যা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার ক্ষেত্রে বন্ধনীর ভেতরের অংকটি আদর্শ অবস্থা, অর্থাৎ ১০০% এর মধ্যে শতকরা কত ভাগ অর্জিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে, স্কোরিং অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সমস্যার ক্ষেত্রগুলো হলো রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং সমন্বয়হীনতা। আইন বাস্তবায়নের সমস্যার ক্ষেত্রে ৫টি আইনের গড় স্কোর মাত্র ০.৯, যেখানে আদর্শ অবস্থায় পৌছাতে হলে পেতে হবে ৫ (সারণি ১)।

সারণি ১: স্কোরিং—আইন বাস্তবায়নের আদর্শ অবস্থা থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের দূরত্ব
(‘০’ থেকে ‘৫’-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

আইন/নীতি	জাতীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি	দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা	রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন	রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন	সেবাবিমুখী/ দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/ দপ্তর	স্বচ্ছতা-জবাব-দিহিতার অভাব	জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি	সমন্বয়-হীনতা	**গড় স্কোর**
কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭	১.৫	১.৭	১.৬	১.১	১.২	০.৯	০.৮	১.২	**১.২**
অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫	১.১	১.৭	০.৮	০.৮	০.৯	১.১	১.১	১.১	**১.১**
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	১.১	০.৮	০.৭	০.৬	০.৯	০.৯	০.৮	১.১	**০.৯**
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭	১.১	০.৮	০.৭	০.৬	১.১	০.৯	১.১	০.৬	**০.৮**
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১	০.৯	০.৮	০.৬	০.৬	০.৯	০.৮	০.৯	০.১	**০.৭**
গড় স্কোর	**১.১**	**১.২**	**০.৯**	**০.৭**	**১.০**	**০.৯**	**০.৯**	**০.৮**	**০.৯**

উপরুল্লিখিত ৫টি ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনি দলিলের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং রাজনৈতিক-অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ আমাদের এমন একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত করে যে: অর্থাৎ, ভূমি আইন বাস্তবায়নের যে ধারা

ও পদ্ধতি, তা আমরা যে দরিদ্র ও অ-ক্ষমতা উৎপাদনকারী এবং পুনরুৎপাদনকারী একটি অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশলের কথা বলছি, সেটাকেই পোক্ত করে—রাজনীতি সেখানে শোষকের পক্ষের একটি অস্ত্রমাত্র, আর কিছু নয়। ক্ষমতায়, যে-যে নীতি নিয়েই আসুন না কেন, তা বরাবরই একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতেই তৎপর; বাকিদের স্বার্থ ঠিক ততটুকু রক্ষা করা হয়, যতটুকু না করলে শাসিত শ্রেণি ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তটুকু উৎপাদনের ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলবে। **অর্থাৎ, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি—চিরে দেখছি এর ভেতর-বাহির, তখন এটি দৃশ্যমানভাবেই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অর্থনীতির এক 'প্র্যাক্টিকাল ক্লাস'।**

৫. গবেষণা-ফলাফলভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহ

আমরা কয়েকটি 'স্থির' (অন্তত, আজকের এবং নিকট ভবিষ্যতে আমাদের দেশ কিংবা তুলনীয় অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে) সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি—

ক। ভূমি, আইন, এবং আইনের বাস্তবায়ন পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিষয়—যা আমাদের জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের এক অন্যতম চালিকাশক্তি।

খ। রাষ্ট্র-অনুসৃত উৎপাদনপদ্ধতি কিংবা অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে ভূমি-আইন একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা শাসকের পক্ষে শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু আত্মসাতের পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয় মাত্র।

গ। আইন মন্দ, নানান দোষে দুষ্ট—নানান 'ভদ্র মোড়কে' শোষক বা শাসকের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই লাগে। তদুপরি আইনের বাস্তবায়ন মন্দতর—আইনের যেটুকু আপাতদৃষ্টিতে ভালো, সেটুকুও শাসিতের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে না; বলা ভালো, করতে দেওয়া হয় না।

ঘ। ভূমি, ভূমি-আইন এবং ভূমি আইনের বাস্তবায়ন কীভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের সাথে জড়িত এবং তার জীবনের গতি-প্রকৃতিকে গভীরভাবে-প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তার বিশ্লেষণ একমাত্রিক নয়—বহুমাত্রিক। এই বিশ্লেষণে, বিশেষ করে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যাটির গভীরে (root cause) যেতে হলে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political Economy) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার (tool)। **এটি পরিষ্কার যে, ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদের আত্মসাৎ-প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেবার এক অন্যতম ক্রীড়নক হলো ভূমিসংক্রান্ত আইনকানুন—রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রায়োগিক সংজ্ঞাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাই, যেকোনো বিচারেই, ভূমি আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র লেন্স—সর্বোতভাবেই কার্যকর এক লেন্স। ভূমিবিষয়ক আইনের মধ্যে কয়েকটি নমুনা (sample) বিশ্লেষণের এই পথ-পদ্ধতি আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেছে যে, ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল একটি বাস্তবানুগ এবং প্রয়োগপযোগী প্রকৃত-টেকসই-অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন রূপকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়নকেই সহযোগিতা করে।**

৬. উপসংহার

আদর্শ চাওয়াটি হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি, যেখানে 'শাসক' আর 'শাসিত' হয়ে উঠবেন একটি একক সত্তা। অর্থাৎ, আদর্শ অবস্থাটি হচ্ছে এমন—যেখানে 'শাসক = শাসিত'। কিন্তু আমরা তা সে যে নামে যে বর্তমান যে রাষ্ট্রব্যবস্থা– তা সে যে নামে যে পদ্ধতিতেই পরিচালিত হোক না কেন—কোনোভাবেই এমন একটা অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে দেবে না যেখানে 'শাসক = শাসিত' এমন সমীকরণ সত্য হয়ে উঠবে। এমতাবস্থাকে যদি আপাতত সত্যি বলে মেনে নিই, বাস্তবতা হিসেবে

স্বীকার করে নিই—তাহলে আমরা একটি 'প্রায় সমান (≅)' অবস্থার দিকেই যেতে চাইব; যদিও আমরা খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত আছি যে 'প্রায় সমান' অবস্থা কোনো প্রকৃত সমাধান দেবে না। তারপরও, যখন নিকট বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলাই যায় যে 'সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব' তৈরির মতো কোনো ভ্রূণাবস্থাও কোথাও বিরাজ করে না—সে রকম একটা সময়ে এবং অবস্থানে আমরা সচেতনভাবেই 'শাসক' এবং 'শাসিত' এই দুই সত্তাকে 'প্রায় সমান' কীভাবে করা যায়—সেই পথনির্দেশের সন্ধান করেছি। অর্থাৎ, আমাদের এই গবেষণা ততটুকুই করতে পারে—যেখানে ওই তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকাঠামো এমন একটি অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে, যেখানে 'শাসক ≅ শাসিত'।

আমরা এটি জানি, 'প্রায় সমান' অবস্থায় নেবার মতো আমাদের গবেষণা-উদ্ভূত এসব সুপারিশমালা তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি'র কার্যক্রমের সাথেই তুলনা করবেন অনেকে। সে তারা করতেই পারেন। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে বলতে পারা যায় যে—আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি কোনো ভিন্ন প্রপঞ্চ নয়। আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যেখান থেকে বলা যায় যে 'ভূমি আইনের সমস্যা' কোনো 'আইনি সমস্যা' নয়—এটি সব বিচারেই রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। আমরা এইটুকুই শুধু ভিন্ন, যখন বলা যায় যে 'খুপড়িভুক্ত' দৃষ্টি এবং গবেষণা দিয়ে ভূমি আইনের সমস্যার আইনি বিশ্লেষণ করা সম্ভব বটে, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন-অধিকারমুখী কোনো বাস্তব ফলাফল তাতে অর্জিত হবে না।

এটুকু আমাদের জানা আছে, 'নয়া-উদারবাদ'-এর 'মহা-ফাঁদ' পেতে রাখা বর্তমান যে বিশ্ব, সেখানে যিনি দুর্বল, ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে যার অবস্থান, আইন ছাড়া আর তার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আমরা জানি, আইনের প্রয়োগ-অধপ্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সবচেয়ে নিষ্ঠুরভাবে ঘটানো হয় এই 'বহিঃস্থ' মানুষের ক্ষেত্রেই। রেন্ট-সিকার, দুর্বৃত্ত প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল রাখে, ন্যায্য হিস্যা হারায় বাকিরা। তারপরও আইনি দলিলে যা বলা আছে, যা করবার কথা বলা আছে কাগুজে দলিলে—তার যথাযথ প্রয়োগ হলে, তা অন্তত মন্দের ভালো হতে পারে। ভূমি বিষয়ে সব আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য ও একটি কাঠামোর মধ্যে এনে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার নিশ্চিত করে, জনসম্পৃক্ত একটি বাস্তবায়ন-পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং মাঠপর্যায়ে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর মধ্যে দিয়ে অন্তত, যাত্রা শুরু করতে পারে 'শাসিত'কে 'শাসক'-এর 'প্রায় সমান' করে তুলবার বন্ধুর রাস্তায়। অন্যথা, দরিদ্র মানুষ, কৃষক-জলাজীবী-বনজীবী, অভিবাসীসহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীর ভূমি অধিকার—তথা ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করবার দিকে এগোনোই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে না 'বাদপড়া' জনগোষ্ঠীকে শোভন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করবার দীর্ঘ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়া।

আমরা অনুধাবন করতে পারি, আদর্শ অবস্থান থেকে আইনের অবস্থান অনেক দূরে, আবার সেই অবস্থান থেকেও বাস্তবায়ন অবস্থার দূরত্ব অনেক—রেন্ট-সিকার পরিবেষ্টিত, দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ভূমির ওপর কৃষিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের মালিকানা (শুধু অভিগম্যতা বা access নয়) নিশ্চিত করা। অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন এবং এর যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর জীবনে কোনো ন্যূনতম ইতিবাচক পরিবর্তনেরও টেকসই সমাধান সম্ভব না। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। আইনি সংস্কার এবং তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া ভূমি-সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন— বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৌলিক সংস্কার। যদিও আমরা ভালো করেই জানি, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয়

উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, শাসনব্যবস্থায় আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলেও 'শাসক' কখনোই 'শাসিত'-এর সমান হয়ে উঠবেন না; বড়জোর তারা হয়ে উঠতে পারেন 'প্রায় সমান'। ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান চাইলে বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরোমাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আইন বাস্তবায়নে জরুরি। আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন অসম্ভব।

তথ্যপঞ্জি

এএলআরডি (২০১৯), *জমি-জমার কথা*। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

কজ্‌লোভ, গ. আ. (সম্পা.). (১৯৬৮), *রাজনৈতিক অর্থনীতি: পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা* (মূল গ্রন্থ রুশ ভাষায়)। মস্কো: মিস্‌ল প্রকাশনা।

কজ্‌লোভ, গ. আ. (সম্পা.). (১৯৮০), *অর্থশাস্ত্র: পুঁজিবাদ*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

কেল্লে, ভ., ও কোভালসন, ম. (১৯৭৫), *মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫), *অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭), *কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০১), *জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৯), *সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১। ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৭), *স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

দেবনাথ, এন. সি. (২০০০). *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., সেনগুপ্ত, সুভাষ. কুমার., এবং রহমান, ওবায়দুর (বাংলা অনুবাদ, ২০০৯), *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল (২০১৬), *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০১৬খ), বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। *অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা*। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগের আঞ্চলিক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা। রাজশাহী: জুলাই ১৬, ২০১৬।

বারকাত, আবুল (২০১৯গ), *উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে।* ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (১৯৮৪). "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান"। সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ঢাকা: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র।

বারকাত, আবুল (২০০৪). "বাংলাদেশের রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক চালচিত্র: কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী-২০০৪*, পৃ. ৩-৩৮, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বারকাত, আবুল (২০০৫), *দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন প্রসঙ্গ: বড় কাঠামোয় বিশ্লেষণ জরুরি*। বাংলাদেশ কনজুমার সোসাইটি। ঢাকা: আগস্ট ২, ২০০৫।

বারকাত, আবুল, জামান, শফিক উজ, এবং রায়হান, সেলিম (২০০৯), *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার।* ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল., গা. মো. সোহ্‌রাওয়ার্দী., ওসমান, আ., ও ইসলাম, মো. অ. (প্রকাশিতব্য: ২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: *বাংলাদেশে খাস জমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল, ও সোহ্‌রাওয়ার্দী, গা. মো. (২০১৯), *বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., হক, কাজী এবাদুল., আহমেদ, এ. কে. এম. জহির., উল্লাহ, মো. রহমত., হেলাল-উজ-জামান, এ. কে. এম., চৌধুরী, টি. আই. এম. নুরুননবী., আহমেদ, কাওসার., সেনগুপ্ত, সুভাস কুমার., ওসমান, আসমার (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)।* ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

মার্কস, কার্ল (১৯৮৩), *অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে।* মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

রহমান, মোঃ. আনিসুর (২০০৮), বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার। হুদা, শামসুল (সম্পা.), *দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে ভূমি, কৃষি ও জলা সংস্কার অপরিহার্য* (পৃ. ৯-১৬)। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

Abdullah, A. (1976). “Land Reform and Agrarian Change in Bangladesh”, *The Bangladesh Development Studies,* Vol. 4, No-1, January.

Barkat, A., & Roy, P. K. (2004). *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage*. Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori.

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Ghosh, P. S. (2011). *Commercialization of Agricultural Land and Water Bodies and Disempowerment of Poor in Bangladesh.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

Barkat, A. et al. (2014). *Land Laws in Bangladesh: A Right-based Analysis and Suggested Changes* (in 22 vol.). Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) & Manusher Jonno Foundation (MJF).

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Osman, A. (2015). *Increasing Commercialisation of Agricultural Land and Contract Farming in Bangladesh.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

Barkat, A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). Khas Land: The Denial of Access. In A. Barkat (Ed.), *Bangladesh Land Status Report 2017: Land grabbing in a rent-seeking society.* Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.

Blaug, M. (1997). *Economic theory in retrospect* (5th Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Charles, G. and Rist, C. (1948). A History of Economic Doctrine (2nd ed.). London: George G. Harrap & Co Ltd.

Chowdhury, A. M., Hakim, A., and Rashid, S.A. (1997). "Historical Overview of the Land System in Bangladesh". Land. vol. 3, no. 3. Philippines, Manila: Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development

Dale, P., Mahoney, R., and McLaren, R. (2007). Land Markets and the Modern Economy. UK: RICS.

Deane, P. (1989). *The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political Economy.* Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University

Herrera, A. (2016). *Access to Khas Land in Bangladesh: Discussion on the Opportunities and Challenges for Landless People, And Recommendations for Development Practitioners.* Essay on Development Policy, NADEL MAS-Cycle 2014-16.

Hossain, T. (1995). *Land Rights in Bangladesh: Problems of Management. Dhaka: The University Press Limited.*

Kozlov, G. A., (Ed.). (1977). *Political economy: Socialism*. Moscow: Progress Publishers.

Nikitin, P. I. (1983). *The fundamentals of political economy,* (J. Sayer, trans.). Moscow: Progress Publishers.

Raihan, S., Fatehin, S., and Haque, I. (2009). *Access to Land and Other Natural Resources by the Rural poor: The Case of Bangladesh. Dhaka: SANEM.*

Roll, E. (1992). *A history of economic thought.* London: Faber and Faber Limited.

Ryndina, M. N., Chernikov, G. P., & Khudokormov, G. N. (1980). *Fundamentals of political economy.* Moscow: Progress Publishers.

Ryndina, E. A. (1978). *Political economy of capitalism.* Moscow: Progress Publishers.

Siddique, K. (1997). Land Management in South Asia: A Comparative Study. Dhaka: The University Press Limited.

Sobhan, R. (1993). *Agrarian reform and social transformation: Preconditions for development.* Dhaka: The University Press Limited.

Yusuf, A. (Eds.) (2011). Agriculture of Bangladesh—Capitalistic or Semi-Feudalistic (In Bangla). Dhaka: Pathok Shamabesh.

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ৯১-১২০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বঙ্গবন্ধু-দর্শন: তত্ত্ব, প্রয়োগ ও সম্ভাবনা

আবুল বারকাত*

১. ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত। শিরোনাম হলো "বঙ্গবন্ধু-দর্শনঃ তত্ত্ব, প্রয়োগ ও সম্ভাবনা" (Philosophy of Bangabandhu: Theory, application and possibilities)। স্বচ্ছতার খাতিরে বলে রাখা দরকার যে এর আগেও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্লাটফর্মে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "মূল প্রবন্ধ" উপস্থাপন করেছিলাম, যার শিরোনাম ছিল "বঙ্গবন্ধু-দর্শন": তত্ত্ব, প্রয়োগ ও "উচ্ছেদিত সম্ভাবনা"। এ নিয়ে বলেছিলাম ২০১৯ সালে খুলনা ও দিনাজপুরে আঞ্চলিক সেমিনারে আর পরে ২০২০ সালে কুষ্টিয়া ও রাজশাহীর আঞ্চলিক সেমিনারে। এসব সেমিনারে সুধীজন আমাকে যেসব চিন্তা উদ্রেগকারী প্রশ্ন করেছিলেন, উপরি হিসেবে সেসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দেবার প্রয়াসটাও আজকের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতায় থাকবে। তার আগে শুরুতেই উত্থাপিত প্রশ্নগুলো বলে নেওয়া সমীচীন। প্রশ্নগুলো এ রকম:

(১) বঙ্গবন্ধু দার্শনিক ছিলেন কি'না? (এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দিয়েছি)।

(২) "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বলতে আমি যা বুঝি ও বুঝায়, সেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন দর্শনের যে অধীনস্থক্রম দেখায়—কাঠামোটা কত দূর যৌক্তিক? (এ প্রশ্নেরও সম্ভাব্য উত্তর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দিয়েছি)।

(৩) "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অবিচ্ছেদ্য সুপ্ত সম্ভাবনা নির্মূল করতেই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়—আমার এ বক্তব্যটি কতদূর সঠিক? (সম্ভবত নির্মোহ ইতিহাসকেই আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন কার্যকরণ দিয়ে আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি)।

(৪) ১৯৭২-৭৫ কালপর্বে বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনায় যা করেছিলেন, তা'কি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর বিশেষত তাঁর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শনকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রতিফলিত করে কি? (আমার উত্তর ইতিবাচক, যা তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলার চেষ্টা করেছি)।

---

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

(৫) বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন এবং বঙ্গবন্ধু-দর্শন যদি বাস্তবে প্রয়োগ হতো সেক্ষেত্রে দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিগত যে রূপান্তর হিসেবপত্তর করে দেখানোর চেষ্টা করেছি তা বাস্তবে হতো কি'না? (এ প্রশ্নে আমার উত্তরটা যথেষ্ট নির্দেশনামূলক-ইঙ্গিতবহ। হুবহু হিসেবপত্তর কেমন হতো তা বলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ হতো স্বল্পবৈষম্যপূর্ণ আলোকিত মানুষের এক সমাজ। এসবই চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলেছি)।

(৬) ১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে যে ধরনের উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী—সেখানে বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক উন্নয়ন দর্শনের ছোটখাটো প্রয়োগ সম্ভব কি'না? (প্রশ্নটা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরটা এ রকম—"চেষ্টা করতে অসুবিধা কোথায়"; সমাজদেহে অনেক ধরনের ইতিবাচক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তুলনামূলক ভালো ফল দিতে পারে। বিষয়টি "উপসংহারিক" বক্তব্যে উপস্থাপন করেছি)।

আজকের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতায় থাকছে পরস্পরসম্পর্কিত পাঁচটি অনুচ্ছেদ। 'ভূমিকা'র পরের অনুচ্ছেদসমূহ যথাক্রমে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—সারকথা ও বিনির্মাণপ্রক্রিয়া (২য় অনুচ্ছেদ), "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফল (৩য় অনুচ্ছেদ), "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজকাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনটা কেমন হতো (৪র্থ অনুচ্ছেদ)?" এবং "উপসংহার" (৫ম অনুচ্ছেদ)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলতে চেষ্টা করেছি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বলতে আমি কী বুঝি এবং ঐ দর্শন কীভাবে, কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে, কোন রাজনৈতিক ভাবনাপ্রক্রিয়ায় বিনির্মিত হলো। তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলতে চেষ্টা করেছি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" যদি তত্ত্ব-কাঠামো হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রয়োগ হলো কীভাবে এবং প্রয়োগফলই বা কী—যদিও ঐতিহাসিকভাবেই প্রয়োগটা ছিল প্রারম্ভিক স্তরের এবং ক্ষণস্থায়ী। আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে দেখাতে চেয়েছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি কিন্তু যদি তা হতো, তাহলে তার প্রভাব-অভিঘাতটা আমাদের সমাজকাঠামোর ওপর কেমন হতে পারতো, এবং এ অনুচ্ছেদেই বুঝতে ও বুঝাতে চেয়েছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে আমরা হারিয়েছি কল্পনাতীত সম্ভাবনা ("unimaginable lost possibilities") অথবা বলা চলে নির্মূল-উচ্ছেদ ('eradication' অর্থে) করা হয়েছে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রায়োগিক সম্ভাবনা এবং একইসাথে বলতে চেষ্টা করেছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অন্তঃস্থিত ঐ সুপ্ত সম্ভাবনা নির্মূল-উচ্ছেদের কারণেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ—"উপসংহার"-এ বলার চেষ্টা করেছি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন' বাস্তবায়নের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোটিই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে; সৃষ্টি হয়েছে নিও-লিবারেল মুক্তবাজার দর্শনের আওতায় লুটেরা-পরজীবী পুঁজিবাদ, যা বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করে চলেছে।

উপসংহারে এ কথাও বলার চেষ্টা করেছি যে এমনকি লুটেরা-পরজীবী পুঁজিবাদী প্রতিকূল কাঠামোর মধ্যেও "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অবিচ্ছেদ্য অন্তত ৩টি সুনির্দিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন বিবেচনা করা যেতে পারে: (১) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, (২) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, (৩) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'কৃষি-সমবায়' গঠন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি বিগত ১০-১৫ বছরে ইতোমধ্যে কয়েক দফা লিখেছি, বক্তব্য দিয়েছি। আর সবশেষে ২০১৫ সালে "বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের

সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে” শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি (প্রকাশক: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। আজকের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত প্রবন্ধটির ভাবনা-ভিত্তি হিসেবে উল্লিখিত গ্রন্থসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার বক্তৃতা-লেখনিসমূহকে ধরে নিলে অত্যুক্তি হবে না।

২. “বঙ্গবন্ধু-দর্শন”—সারকথা ও বিনির্মাণপ্রক্রিয়া

“বঙ্গবন্ধু-দর্শন” হলো জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি (world view), জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ ভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতি ভাবনার যৌথরূপ। তবে ‘বঙ্গবন্ধু-দর্শন’—এসবের সাধারণ পাটিগাণিতিক যোগফল নয়, নয় তা বিচ্ছিন্ন। “বঙ্গবন্ধু-দর্শন” হলো এসবের পরস্পরসম্পর্কিত এক সমগ্রক রূপ (holistic form)।

সবার ওপরে জনগণ (supremacy of people); জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস; জনগণ এবং কেবল জনগণই হতে পারে প্রজাতন্ত্রের মালিক, যা হবে মর্মগতভাবে শোষিতের গণতন্ত্রব্যবস্থা; জনগণ এবং কেবল জনগণই সার্বভৌম, অন্য কেউ নন; জনগণ এবং কেবল জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে– এসবই বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শনের মূলভিত্তি। জনগণের স্বার্থ বিশেষত দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থ ছিল তাঁর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

“জনগণ-বোধ”ই বঙ্গবন্ধু-দর্শনের ভিত্তিকথা। আর সে কারণেই দেশপ্রেমের যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি ভালোবাসার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি আস্থার যত ধরন আছে; মহানুভবতার যত রূপ আছে; ন্যায় প্রতিষ্ঠার যত সংগ্রামী রূপ আছে– এত বহুমুখী বিরল বৈশিষ্ট্য যে একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল–তিনিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসবই বঙ্গবন্ধুর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ ভাবনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতি ভাবনা ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। এসবই বঙ্গবন্ধুকে করেছে “দেশজ উন্নয়নদর্শনের” (home grown development philosophy) উদ্ভাবক, স্রষ্টা, বিনির্মাতা।

সামন্ত-সেনাশাসিত আধা ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান কাঠামোতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি এ দেশের মানুষের সুদীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল। তা এ দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা-ধনী-নির্ধননির্বিশেষে সকলের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফসল। আর মুক্ত ও স্বাধীন হবার আমাদের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি যে ব্যক্তি, যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জনগণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে তাঁর সারাজীবনে কখনও কোনো ধরনের আপোষ ব্যতীতই বাস্তবে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন—তিনিই বঙ্গবন্ধু—জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই ১৯৭১-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করলাম। যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানিসহ (এ সংখ্যাটি আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[১]) ব্যাপক মানবিক ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে আমরা অর্জন করলাম স্বাধীনতা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু শুধু একটি ‘দর্শন’ই বিনির্মাণ করেননি তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐ দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগও করেছেন। আবার একই সাথে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁরই বিনির্মিত দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ দর্শনকে উত্তরোত্তর শাণিত করেছেন।

---

১ আমার এ হিসেবের পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য দেখুন: বারকাত আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ৫৫-৫৭।।

একথা নির্দ্বিধায় সত্য যে, "হাজারো ষড়যন্ত্রের" মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দিলেন স্বাধীনতা। "হাজারো ষড়যন্ত্র" কথাটি বলার আমার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণ আছে, যা হয়তো বা তরুণ প্রজন্মসহ এদেশের অধিকাংশ মানুষের এখনও পর্যন্ত অজানা। ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এ রকম: ২১ মার্চ ১৯৭১ সকাল—মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রাক্তন কর্মকর্তা তৎকালীন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাক্-ধারণা ছিল এ রকম– *"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বুঝেছে যে বাঙালিরা পিছু হটবে না। ওরা বুঝেছে এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে কোনো পথেই কোনো পদ্ধতিতেই আর ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত মারফত প্রেরিত প্রস্তাব অনুরূপই হবে"*। তা-ই হলো। জোসেফ ফারল্যান্ড আসলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে মার্কিন সরকারের প্রস্তাবটি পেশ করলেন। তিনি বললেন, *"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত, এমনকি তারা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে এক শর্তে, শর্তটি হলো: চট্টগ্রাম থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা দিতে হবে"*। প্রস্তাবটি বঙ্গবন্ধু শোনামাত্র শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি, জোসেফ ফারল্যান্ডকে মুখের ওপর বলেছিলেন *"মিস্টার ফারল্যান্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়া ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে ছিলেন তাও আমি জানি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আমার দেশকে পাকিস্তানি শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। হতেও পারে না"*[২]।

মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা তো অর্জিত হলো। কিন্তু আসলে কী চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন? গড়তে চেয়েছিলেন কোন বাংলাদেশ? আমার মতে, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁরই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়নদর্শনের ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে, যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা; যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী; যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত; যে বাংলাদেশে মানবমুক্তি (liberty অর্থে) নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা; যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ; যে বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ; যে বাংলাদেশে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল-জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আলোকিত মানুষের দেশ।

কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন *"আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ব "*।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতিদর্শন গণমানুষের স্বার্থ-কল্যাণ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেরই ফসল। বঙ্গবন্ধুর প্রগতি দর্শনের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রতিফলন হয়েছে ১৯৭২-এর সংবিধানের

---

[২] বিস্তারিত দেখুন, মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ২৭৬-২৭৭।

প্রস্তাবনায়, যেখানে বলা হয়েছে *"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"* এ কথা বলার পর বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতিদর্শনের স্পষ্টতা নিয়ে আর কোনো কথা না বললেও চলে।

নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হলো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন। এ ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তাঁর গভীর দেশপ্রেম, বিরল প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ; আর সংবিধান রচিত হয়ে গেল ৪ নভেম্বর ১৯৭২-এ—অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল। ইতিহাসে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত কম সময়ের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল; তাও আবার যেনতেন সংবিধান নয়—জনগণের শক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আস্থা-বিশ্বাসনির্ভর দেশজ উন্নয়ন নিশ্চিত করার দর্শনগত ভিত্তির সংবিধান। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা নিরসনসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি ও বিকাশউদ্দিষ্ট চার স্তম্ভভিত্তিক (সংবিধানের মূলনীতি) বিরল এক সংবিধান। স্তম্ভ চারটি হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা কেমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম, তা স্বল্প কথায় বোঝাবার জন্য সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। ১৯৭২-এর সংবিধানে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ***"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগে ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে"***। আর সংবিধানের ১০নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, ***"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"***।[৩] বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই সহজেই বোঝা যাবে যে আসলে কেমন বাংলাদেশ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ, যা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ—যেখানে তিনি বলেছিলেন, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই, মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই; শোষণহীন-বঞ্চনামুক্ত-বৈষম্যহীন সমাজ চাই, সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ চাই; উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন গরিব দুঃখী-আর্ত মানুষের 'ন্যায্য হিস্যার' কথা:

---

৩ অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতাদখলকারী অবৈধ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে প্রথমবার এবং ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয়বার ঘোষণা দিয়ে এ অনুচ্ছেদটি সংবিধান থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ প্রণয়ন করেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট ২৯ আগস্ট ২০০৫-এ পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে স্পষ্ট রায় দিলো যে "পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক, বে-আইনি, অবৈধ, বাতিল এবং ঐতিহাসিক অপরিণামদর্শী"। রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক [বিস্তারিত দেখুন, সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী সম্পাদিত The Bangladesh Law Times, The Constitution (Fifth Amendment) Act's Case Citation: 14 BLT (Special Issues), 2006, পৃ: ২৪০-২৪২]।

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে (*সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১*)

২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)

৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯/১, ২*)

৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক, খ*)

৭. মেহনতি মানুষকে– কৃষক ও শ্রমিককে– এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান (*অনুচ্ছেদ ১৪*)

৮. জীবনযাত্রার বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লবসহ গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধন (*অনুচ্ছেদ ১৬*)

৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (*অনুচ্ছেদ ১০*)

১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)

১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)

১২. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)

১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*)

১৪. আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। ...স্থানীয় সরকার (সংসদে আইন পাশ সাপেক্ষে) যে সকল দায়িত্ব পালন করিবেন তার অন্তর্ভুক্ত হইবে: প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য; জন শৃংখলা রক্ষা; জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫৯)

১৫. (সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১.২)।

মোদ্দাকথা হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৫১ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানসকাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিকঠাকই শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী তিন-চার বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত-লণ্ডভণ্ড বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিল।

এতক্ষণ যা বললাম তার সারবস্তু এ রকম: সুদীর্ঘ ৩৮ বছরে (১৯৩৭-১৯৭৫) লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন-বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, যারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং এবং এ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি-উন্নয়ন দর্শন (বঙ্গবন্ধুর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন (প্রগতি) দর্শনে নিঃসন্দেহে ভূমিকা রেখেছিল সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের মিথস্ক্রিয়া। এসব পরিবর্তনের অন্যতম হলো ১৯১৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব–রুশ বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবপরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুতলয়ে আর্থ-সামাজিক মৌলিক পরিবর্তন (যে সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১৫-২০-এর কোঠায়); সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা; ১৯২৯-৩৩ সালে মহামন্দায় (great depression) আর্থসামাজিক সিস্টেম হিসেবে পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক পতন-লক্ষণসমূহ যা শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গিয়ে ঠেকলো (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১০ বছর থেকে ২৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাব এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমাজতন্ত্রের স্নায়ুযুদ্ধ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে উপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় এবং এ আন্দোলনে ভারতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে); ১৯৪০-৫০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনা বিপ্লব, চীনের অগ্রযাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ থেকে ৪০ বছর); ১৯৬০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যেমন ল্যাতিন আমেরিকায় বিশেষত পানামা, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, কিউবার বিপ্লব ও বিপ্লবী চেগুয়েভারা হত্যা (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছর); ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলন (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪৪ থেকে ৫০ বছর); দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত শাসনের আওতায় শোষণ-নির্যাতনসহ বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৭ বছর থেকে ৫০ বছর)।

ছক ১: বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, আর্থসামাজিক উন্নয়নদর্শন– যোগসূত্র এবং মূলনীতি-ভিত্তিসমূহ

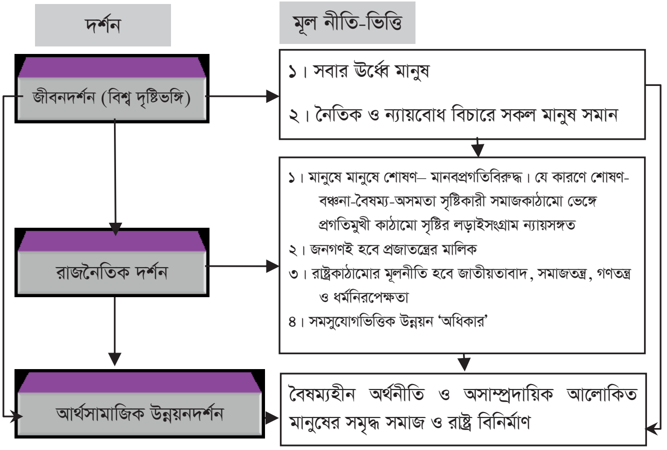

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত দর্শনের মূর্ত রূপই হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের গণ-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কী এমন হলো যে ওই জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কী? আমার মতে, কারণটি এ রকম: বঙ্গবন্ধু যেদিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে, ঠিক তখন থেকেই ইতোপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরও দ্রুতলয়ে আরও বেশি শক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শনবিরোধী তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক-তাহের উদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র;[৪] জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনাসদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র; ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র[৫]; দুর্নীতি[৬], সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আলশামসসহ জামায়াতে ইসলাম ষড়যন্ত্র; মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেয়ার সফল যড়যন্ত্র; খাদ্যগুদাম লুট, মজুতদারিসহ[৭] খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-এর আওতায় সবচে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ[৮] (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিল আমরা সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে

---

৪ মোশতাক-ঠাকুর-চাষীসহ সমজাতীয় ষড়যন্ত্রকারীরা হয় ইতিহাসজ্ঞানে কাঁচা ছিলেন অথবা জ্ঞানপাপী ছিলেন অথবা জাস্ট বেঈমান চরিত্রের অমানুষ ছিলেন অথবা একই সাথে সবগুলো। এখানে বাংলার ইতিহাসের কিয়দংশ স্মরণ করা সমীচীন হবে। ১৭৫৭ সাল– ভারতবর্ষের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে উপনিবেশবাদী ইংরেজরা (১৭৫৭ সালের ২৯ জুন) মীর জাফরকে বাংলার নবাব পদে বসালেন। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু ইংরেজদের হাতেই রয়ে গেল। মীর জাফরের অযোগ্যতা-অদক্ষতার কারণে তারই জামাতা মীর কাসিম হলেন বাংলার নবাব। তবে মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মচারীরা যখন ব্যক্তিগতভাবে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দাবি করে বসল, তখন মীর কাসিম আপত্তি জানালেন। এ নিয়ে নবাবের সাথে বিরোধ শেষপর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হলো। মীর কাসিমের দুই ঘনিষ্ঠ–নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের সাথে হাত মিলালো। আর মীর কাসিম পলাতক হয়ে ১৭৭৭ সালে অজ্ঞাত অবস্থায় মারা গেলেন।

৫ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন "উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনও বনেদি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব-রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।" বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে দেশ উল্টোপথে পরিচালিত হয়েছে। ফলে আমার মতে, অবস্থাটা এখন এরকম– দেশ চালায় rent-seeker-রা আর শাসন-প্রশাসনযন্ত্রের আমলারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ rent-seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা; রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুই এখন rent-seeker-দের কথায় ওঠাবসা করে। আর এসবের ফলে জনগণের সাথে সরকারের নৈকট্য নয় দূরত্ব বেড়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

৬ পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "...বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ"।

৭ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ।... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারী ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি , তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে– তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা হয় শুরু থেকেই। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র।

৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক

পারব না)—এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। প্রকৃত সত্য হলো—বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চিত করা হলো। সৃষ্টি করা হলো এমনই অস্থিতিশীল ও জটিল পরিস্থিতি, যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করলেও কেউ সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়াবে না। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কাজটি দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করে ফেলল– ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে[৯]। এই একই খুনিচক্র ১৯৭৫-এর ৩

পরিবেশসহ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রীতিমতো নির্মোহ গবেষণা করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ-নীতি-দর্শন তারা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হয়েছিল। যার অন্যতম (১) বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, (২) বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (National Liberation Movement)-এর সমর্থক, যেখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতন্ত্রের পক্ষের প্রাথমিক ধাপ, (৩) বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ২১ মার্চ পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব "বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা দিলে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেবে"টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, (৪) বঙ্গবন্ধু কঠিন শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান নেবার বিপক্ষে ছিলেন; তিনি পরনির্ভরশীলতা পছন্দ করতেন না; স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী, (৫) বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে দুই মেরুর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, (৬) বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর সংবিধানে 'সমাজতন্ত্রকে' সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, (৭) ভূ-রাজনৈতিকভাবে এবং অস্ত্র ব্যবসায় পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র ছিল পরস্পরের বন্ধু, (৮) বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমীকরণে ছিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভারত, যেখানে সোভিয়েত-ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শক্তি। এসব কারণে আমি সন্দেহাতীতভাবে মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। আর এসব কারণে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়িসহ (bottomless basket) আরো অনেক ধরনের অন্যায় উক্তি, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ব্যঙ্গ-কটুক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ যে বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ মোশতাক-ফারুক-রশিদ-জিয়াউর রহমানের পুনর্বাসন করেছিল, তা এখন দালিলিকভাবেই প্রমাণিত। সিআইএসহ মার্কিন সরকারের দলিলপত্রেই উল্লেখ আছে: (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ ছিল; কিসিঞ্জার বলেছেন 'মুজিব ছিলেন বিশ্বসেরা বোকাদের একজন'; সিআইএর ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সরকার পরিবর্তন হবে এক আকস্মিক আঘাতে'; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জার ঐতিহাসিক পক্ষপাতদুষ্ট'; ফারুক-রশিদ তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে ১৯৭২ সালে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিল'; 'জিয়া পঁচাত্তরের অক্টোবরের আগে বঙ্গবন্ধুহত্যাপরবর্তী সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মার্কিন সাহায্য চান–তখন তিনি নেপথ্যের নায়ক'; ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার– খন্দকার মোশতাক ও জিয়া সরকার যেন টিকে থাকে, সে জন্য তৎপর ছিল; বোস্টার সাহেব বলেছিলেন '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট-এর ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন, তারা দায়িত্বহীন নন'; ১৯৭৫-এর ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সাথে প্রথম বৈঠকেই মোশতাক বোস্টারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন 'যে সুযোগ একাত্তরেই হারিয়েছি, তা এবার আর হাতছাড়া করা যাবে না'; বঙ্গবন্ধুর খুনিদের প্রতি কিসিঞ্জার যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান যে কারণে 'ফারুক রহমানরা ব্যাংককে গিয়েও মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈঠক করেন'; কিসিঞ্জার বলেছিলেন 'মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ধন্য মনে করছি' (বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান খান, ২০১৪, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ: ১০, ৫২, ৬১-৬৬, ৭৩, ১০৮, ১৯০)।

৯ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন "সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী উচ্চাভিলাষী অফিসারের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং এই কুচক্রীরা জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচিকে বানচাল করে বাংলাদেশে প্রগতির ধারা পাল্টে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে" (শেখ হাসিনা, ২০১৫, শেখ মুজিব আমার পিতা, পৃ: ৩৭, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী")। এখানে আরও উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) এস এস উবান তার "Phantoms of Chittagong:. The "Fifth Army" in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন: "লক্ষ করলাম তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) বাসার কোথাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। ...তাঁর সাথে দেখা করতে আসা

নভেম্বর কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এস কামারুজ্জামান) হত্যা করল।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই মৌল-আকাঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করল। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সবধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি প্রগতিবিরুদ্ধ অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসময় লাগাতার সেনাশাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনাশাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত– এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি বিশেষত "ধর্মনিরপেক্ষতা"সংশ্লিষ্ট ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি কর্তন-পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে[১০]; স্বাধীনতাবিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয়, স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে "নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলার" যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—সেটাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেন চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েন তারা, যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন

মানুষজনের কোনো বাছ-বিচার নেই– একথা তুলতেই তিনি বললেন– 'আমি জাতির জনক। দিন-রাতের যেকোনো সময়ে আমার কাছে প্রত্যেকের আসার অধিকার আছে। কেউ যদি কষ্ট-বেদনায় থাকে, তার সামনে তো আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিতে পারি না"। এরপর জেনারেল (অব.) উবান লিখছেন "আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার এ অনুভূতিতে মুগ্ধ, তবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। ...আমার মনে হয়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতারা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে মুজিব যতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ততদূর খুব কমসংখ্যকই গিয়েছেন" (মূল গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ২০১৪, ঢাকা: পৃ: ১৪২)।

১০ ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের "প্রস্তাবনার" উপরে (অথবা অন্য কোথাও) "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম" লেখা ছিল না, যা বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে তেমন সময়ক্ষেপণ না করেই সংযোজন করা হয়েছে। কাজটি করলেন সেনাশাসক রাজাকার পুনর্বাসনকারী "মুক্তিযোদ্ধা" জিয়াউর রহমান। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে 'ধর্ম' বিষয়ক চেতনা ছিল "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার" (যেটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবস্তু)। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে ছিল না "রাষ্ট্রধর্ম" বলে কোনো কিছু। কিন্তু বঙ্গবন্ধুপরবর্তীকালে এখন সংবিধানে স্পষ্ট লেখা "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন" (সংবিধান, পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১, ২০১১ সালের ১৪ নং আইন-এর ৪ ধারাবলে ২ক অনুচ্ছেদে প্রতিস্থাপিত)। "রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম" করে ছাড়লেন স্বৈরশাসক-সেনাশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ। উল্লেখ্য, ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার" নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল; সংবিধানের "ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে (১২নং অনুচ্ছেদ) রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যতম মূলনীতি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। (১৯৭২-এর সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১২)।

না–যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent-Seeker)[১১] হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করে ফেলেন। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু-দর্শন-এর শ্রেষ্ঠ প্রতিচ্ছবি আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি–বাতিল ঘোষিত হয়েছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে দেশ পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিক উল্টোপথে। স্বপ্ন ছিল সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গঠনের; কিন্তু তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি (যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই), যা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জনকল্যাণবিরোধী ব্যবস্থা। নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজারব্যবস্থাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করেছে: বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বেড়েছে গুটিকয়েক সুপার-ডুপার ধনী, জনগণের জীবন পরিচালনে প্রয়োজনীয় পণ্যের (ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) মূল্যবৃদ্ধি, দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত শ্রমশক্তির অভাব, মনুষ্যশ্রমের স্বল্পমূল্য (মজুরি), কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, বিচারিক অন্যায্যতা, দুর্নীতি, দুঃশাসন, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা–পরস্পরসম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। এসব থেকে মুক্তির পথ একটাই। আর তা হলো বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত-বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত-অসাম্প্রদায়িক" উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন।

---

[১১] সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় Rent-seeker ও Rent-seeking বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিষয়টি এ রকম– বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে বা দু'পদ্ধতিতে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে (by creating wealth)– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন অনৈতিক ও অসভ্য পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking; আর এসবের সাথে যুক্ত যারা, তারাই rent-seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত (wealth) বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নিচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এ রকম: উপর তলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে, কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না–কীভাবে কী হয়ে গেল! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। এ ত্রিভুজ যতদিন বহাল থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে (Rent-seeker ও Rent seeking বিষয়ের মর্মকথা বিস্তারিত জানতে দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৭, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ২৩-৩৪)।

৩. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফল

মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালাল-দোসররা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে ক্ষয়-ক্ষতি করেছিল—তা যেকোনো মাপকাঠিতেই ছিল অপূরণীয় ও অপরিমেয়। এ অবস্থায় "বঙ্গবন্ধুর-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৭২ সালে দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের কর্মকাণ্ডে। প্রথমটি, আশু-তাৎক্ষণিক-জরুরি প্রকৃতির এবং কিছুটা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন বিষয়ক; আর দ্বিতীয়টি, দেশের ভিতরে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনঃগঠন-পুনঃনির্মাণ-এর মাধ্যমে বলা যায়, জিরো অবস্থা থেকে শুরু করে মুক্ত-স্বাধীন দেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলা, যা কোনো অর্থেই সহজ কাজ ছিল না, কারও কারও মতে কাজটি ছিল অসম্ভব।

তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তো মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' ('Bangladesh is a bottomless basket') আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছিলেন *'কথা তো শুনলে না, দেখি মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের নামে তোমাদের কোথায় নেয়'*। এ দলে কিসিঞ্জার একা ছিলেন না। অর্থনীতিবিদদের নমস্য তত্ত্বগুরু জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নসম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে রীতিমতো গুরুগম্ভীর এক পুস্তকই লিখে ফেললেন, যার শিরোনাম "Bangladesh: The Test Case of Development" অর্থাৎ "বাংলাদেশ–উন্নয়নের এক টেস্ট কেইস"। যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিয়ে তারা এ উপসংহারে উপনীত হলেন যে উন্নয়নের তেমন কোনো সম্ভাবনা বাংলাদেশের নেই। ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেব ঐ গবেষণা (!) গ্রন্থে যা বললেন, তার সারকথা এ রকম: *"বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১ কোটি হলে ভালো হতো। কিন্তু জনসংখ্যা ৮ কোটি, তাও আবার ক্রমবর্ধমান। সে কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অবস্থা আরও খারাপ-ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ হতে বাধ্য (তাদের ভাষায় "certainly get worse, terribly worse")*। তাদের বিশ্লেষণের শেষ কথাটি এ রকম: *"বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল হতে পারে, তাহলে পৃথিবীর যেকোনো দেশই তা পারবে"*[১২]।

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ যে ফলপ্রদ হলো, তা তিনি ১৯৭২ সালে যা যা করলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতাটিতে একবার চোখ বুলালেই সহজে বুঝা যায় (ছক ২ দেখুন)। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু উল্লেখিত বৃহৎ বর্গের অন্তর্গত প্রথম যে ধরনের কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল তা সমর্পণ করানো; ভারতফেরত ১ কোটি শরণার্থীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন; শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে সহযোগিতা প্রদান; স্বল্প সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন; সরকার পরিচালনে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর গণমুখী পরিবর্তনসহ দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি; মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনা; বাংলাদেশে অবস্থানকৃত প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো; পাকিস্তানে আটকেপড়া প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট প্রণয়ন; স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের যত দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন; জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন; যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক অনুদান-সহযোগিতা প্রাপ্তির সর্বাত্মক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা; আন্তর্জাতিক

---

[১২] দেখুন, জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন, ১৯৭৭, Bangladesh: The Test Case of Development, New Delhi: S. Chand & Company Ltd, পৃ: ১৯৭।

জ্বালানি তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব মোকাবেলা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নস্যাতের প্রচেষ্টা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দেশবিরোধী সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড মোকাবেলা; সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা; ব্যাংক-বীমা, পাট শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ; কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি। ছক ২-এ প্রদর্শিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত প্রথম বছরের (১৯৭২ সালের) কর্মকাণ্ডের মাসওয়ারি খেরোখাতা শুধু একটি তালিকামাত্র নয়–তালিকায় কর্মকাণ্ডের যুক্তিপরম্পরা অনুধাবন না করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচার অসম্পূর্ণ হবে। এ তালিকাটি বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনে অগ্রাধিকারক্রম বিবেচনায় তাঁর মেধা-মনন, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। এককথায় কর্মযজ্ঞের অগ্রাধিকারক্রম (priority) এবং কালানুক্রম (sequence) স্পষ্ট নির্দেশ করে যে ১৯৭২ সাল থেকেই "বঙ্গবন্ধু-দর্শনের" বাস্তব প্রয়োগ শুধু শুরুই হয়নি, তা স্বল্প সময়ে যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়েছিল।

ছক ২: যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রথম বছরেই (১৯৭২ সালে) বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেসব পদক্ষেপ নিলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতা

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ		মাস (১৯৭২ সালে)											
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১.	মন্ত্রিসভা গঠন (১২ সদস্যবিশিষ্ট)												
২.	মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয়: জাতীয় পতাকা; জাতীয় সঙ্গীত; রণসঙ্গীত												
৩.	শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন												
৪.	ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত												
৫.	মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন												
৬.	শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন												
৭.	মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিচারের জন্য "বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ" প্রণয়ন												
৮.	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন গঠন												

ছক ২ চলমান...

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ		মাস (১৯৭২ সালে)											
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
৯.	ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা পুনর্গঠন/পুননির্মাণ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১০.	টেলিযোগাযোগব্যবস্থা চালু করা	■	■	■	■	■	■	■					
১১.	কৃষি পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১২.	১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৩.	সংবিধান প্রণয়ন												■
১৪.	প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ			■									
১৫.	আন্তর্জাতিক অনুদান প্রাপ্তির কূটনীতি	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৬.	মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ			■									
১৭.	ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্রকল জাতীয়করণ			■									
১৮.	বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৯.	১৯৭১ এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ	■											
২০.	প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ				■								
২১.	ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন							■					
২২.	পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা	■											
২৩.	বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ						■						
২৪.	ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২৫.	শিক্ষকদের ৯ মাসের বন্ধ বেতন দেয়া							■	■	■	■	■	■
২৬.	জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২৭.	কৃষকদের (২৫ বিঘা পর্যন্ত) খাজনা মওকুফ												■
২৮.	পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন	■											

ছক ২ চলমান...

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ		মাস (১৯৭২ সালে)											
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
২৯.	রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা												

উৎস : বারকাত আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ৭৫-৭৭।
কালো রং-এর বক্সসংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাস নির্দেশ করছে।

স্বাধীনতার পরপরই 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর বাস্তব প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিদর্শন নিম্নরূপ:

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার-পরিজনসহ জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীসহ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু লক্ষ-লক্ষ বাস্তুচ্যুত-গ্রামচ্যুত-শহরচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসন, দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ পুনর্বাসনসহ এসব পরিবারে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের কাজটি ছিল বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা সমাধানে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল পাকিস্তানপন্থি স্থানীয় শাসন পরিষদ ও প্রশাসন। এসব বাধা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ এর ৪ মার্চ নাগাদ মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে সামগ্রিক পুনর্বাসনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ করে। এর অর্থ জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতিভূ মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটিতে হাত দিলেন তা হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসন।

২। ১৯৭১-৭২ সময়কালে কৃষিই ছিল এ দেশের অর্থনীতির প্রাণ। কৃষিকে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসররা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছিল। কৃষির চিরাচরিত কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু যথামাত্রা গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিতে বিদ্যমান শ্রেণিকাঠামো জিইয়ে রেখে মুক্তিও আসবে না জনকল্যাণকামী উন্নয়নও হবে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি-খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু যেসব বাস্তবভিত্তিক সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: কৃষকদের জরুরি ভিত্তিতে কৃষিঋণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা; গভীর ও অগভীর নলকুপ মেরামত ও পুনঃখনন করা; হালচাষের জন্য কয়েক লাখ গরু আমদানি করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা; একফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তরের সবার্ত্মক প্রয়াস; খাসজমি ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকসহ বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন; চর এলাকায় বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ; উপকূল অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও কৃষিতে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাসে কৃষকদের মুক্তিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ নেন এবং ঘোষণা করেন, তার মধ্যে ছিল ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি খাস হিসেবে ঘোষণা; খাসজমি ও নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন; ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খায়-খালাসী আইন পাস; বন্ধকী ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করা হলে তা মালিককে ফেরত প্রদান, যাতে জোতদারদের কাছ থেকে কৃষক জমি ফেরত পান। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার

প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে যেখানে বলা হয়েছে, *"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা ও জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"*। এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা, যার ভিত্তি-দর্শন ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় তার দৃঢ়মূল বিশ্বাস।

৩। ১৯৭২ সালে দেশে মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকারের হাতে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন। খাদ্য পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল সংকটময়; আর সংকট গুণিতক হারে বাড়লো কারণ একদিকে আমাদেরই আধাভুক্ত-অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ও আটককৃত ৫০-৬০ হাজার দালাল-রাজাকারদের (যারা খাদ্য ঘাটতি পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মূল দায়ী) এবং সেইসাথে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় মিত্র সেনাবাহিনীকে। খাদ্য ঘাটতি আর অতিনগণ্য মজুত নিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। এ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক বিরল যোগ্যতার প্রমাণ।

৪। অপূরণীয়-অপরিমেয় মানবসম্পদ ক্ষতির পাশাপাশি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালালরা সবচে' বেশি ক্ষতি সাধন করেছে অবকাঠামোগত-ভৌত সম্পদের যার মধ্যে অন্যতম রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ (উৎপাদন-সঞ্চালন-বিতরণ), টেলিযোগাযোগ। অবকাঠামো ধ্বংস বিষয়টি যে শুধু পরিমাণের নিরিখে বিশাল ক্ষতি ছিল তাইই নয়, তা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে কৌশলগত দিক থেকেও ছিল অপূরণীয়। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি ১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রী সভা গঠনের পরেই কোনো বিলম্ব না করে ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসেই ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সংস্কার-নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-পুনঃগঠনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাত দেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্কারকাজে হাত দেন মার্চ মাসে (দেখুন খেরোখাতা ছক ২)। বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসমূহ ১৯৭৩-এর শেষনাগাদ চলাচল উপযোগী করা হয়; একই সময় রেললাইনগুলো চলাচল উপযোগী করা হয়; চট্টগ্রাম বন্দর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ১৯৭৪ নাগাদ মাইনমুক্ত করা হয়; টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সচল করা হয়। অর্থাৎ বিচক্ষণ ও প্রায়োগিক দক্ষতাসহ অর্থনীতির অবকাঠামোর বিকল অবস্থা অতি স্বল্প সময়েই কার্যকরভাবে সচল করা হয়। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব", "বাংলাদেশ সচল করতে কমপক্ষে দশ বছর সময় লাগবে"।

৫। মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিসহ শিক্ষাকার্যক্রম প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী যে কাজগুলি করলেন, তা হলো ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্বাধীন-মুক্ত-জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও তা বিনামূল্যে প্রদানের ঘোষণা (উভয়ই ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে); ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ (অব্যাহত এ

কাজের শুরু ১৯৭২-এর মার্চ মাসে); প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ (১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে শুরু); বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান (১৯৭২-এর জুন মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বাজেটে); এবং ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষকদের ৯ মাসের বেতন প্রদান (উভয়ই ১৯৭২-এর জুলাই মাসে)। এসবের বেশ কয়েকটি কর্মকাণ্ড চলমান থাকলো। এ তো গেল ১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই দেশে দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি স্কুল সরকারীকরণ-জাতীয়করণ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন। ফলে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকৃত হলো। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে জাতীয়করণ ছিল অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় শর্ত।

স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু যে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষাকে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে ও সমতাভিমুখী সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিজ্ঞানভিত্তিক-গণমুখী-কর্মমুখী-জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান– এটা বঙ্গবন্ধুর দেশজ উন্নয়নদর্শনের (home grown development philosophy) অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাকে বঙ্গবন্ধু কখনও ব্যয় (expenditure) হিসেবে গণ্য করেননি, গণ্য করেছেন উন্নয়নে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ (investment) হিসেবে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট ধারণা প্রসঙ্গে যা বললাম, তার স্বপক্ষে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একাংশের শিরোনাম ছিল "শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ"। ১৯৭০-এর ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন *"সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ...জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের,* ***বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।*** *নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে।... দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে"*[১৩]। শিক্ষা যে মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ আর তাই শিক্ষাখাতে যথেষ্ট মাত্রায় বিনিয়োগ করতে হবে, শিক্ষাকে যে হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষক বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যেন উচ্চ মর্যাদায় দেখা হয়, দারিদ্র্য যেন শিক্ষার মাধ্যমে মেধা বিকাশে বাধা না হয়– বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার এসবের কোনোটিই রাজনৈতিক স্লোগানমাত্র ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বঙ্গবন্ধু সরকারপ্রণীত ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট; বাংলাদেশের সংবিধান; মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

[১৩] বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০-এর নির্বাচনী ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (১৯৮৯), ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন, পৃ: ৩০।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন (১৯৭৩ সাল); সেই সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ।

উল্লেখ্য, ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহসহ যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল, তার ভিত্তি-দর্শন হলো বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। আর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ-কারিগর সৃষ্টির মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৬। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ জাতীয়করণ নীতি (Nationalisation Policy) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাংক (বিদেশি ছাড়া), বিমা (বিদেশি ছাড়া), পাট, বস্ত্র, কাগজ শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, বৃহৎ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান (১৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে), বিমান ও জাহাজ কর্পোরেশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ছাড়াও সামন্তবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা বেঁধে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলোর সমন্বয়ে মোট ৬টি ব্যাংক গঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩ জানুয়ারি ১৯৭২-এ জারিকৃত ১নং আদেশ (AOP 1) এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ ঘোষিত ১৬নং আদেশ (PO 16)-এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার ৮৫ শতাংশ শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত রাষ্ট্র এসবের মালিকানা ও দখল গ্রহণ করে। এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের PO 16 বিধি অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা ফেরত পাবার জন্য সরকার বরাবর আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তবে এ আদেশে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফেরত পাবার কোনো সুযোগ ছিল না।

৭। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে, যেখানে গরিব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিক হবেন; যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরিব মানুষকে জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরিবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না; যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

মানুষের যৌথ উদ্যোগ-যৌথ চিন্তার প্রতিষ্ঠান সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ ছিল তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে, যেখানে তিনি বলছেন, "*আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের*

সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।...আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। ...অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন– কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যাক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।...আমার প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে”। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গরিব মানুষকে জোতদার-ধনীদের শোষণ থেকে মুক্তি, মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ ও গণতন্ত্র বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক, পেশাভিত্তিক গণমুখী সমবায় আন্দোলন (pro-people co-operative movement) গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তব্যে স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৯৭২ সালে ঘোষিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন সফল হয়নি। একদিকে বৃহৎ ভূ-স্বামী জোতদারদের জমি হারানোর ভীতিসহ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র, আর অন্যদিকে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্র- পেশাভিত্তিক বহুমুখী সমবায় গঠন ও পরিচালন কীভাবে হবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব– এসবই গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়নি। সেই সাথে এ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যতটুকু সময় পাওয়া প্রয়োজন ছিল তাও পাওয়া যায়নি। বঙ্গবন্ধু তারপরও দমে যাননি। ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বললেন: *“...এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান-এ বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম-কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা*

না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।... আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ... আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে"[১৪]। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়সহ বহুমুখী সমবায় গঠন নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এসব ঘোষণা দিলেন তার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো! এর কারণ–বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এমন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী বিবৃত করা হয়েছিল যা, থেকে সাম্রাজ্যবাদসহ তাদের দেশি-বিদেশি সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা চুপ করে বসে থাকা কোনো অর্থেই আর নিরাপদ মনে করেনি।

৮। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলায়' রূপান্তর ও 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুধু পুনর্বাসন, পুনঃগঠন, পুনঃনির্মাণ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই (৩০ মার্চ ১৯৭২) দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, যার চেয়ারম্যান ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে[১৫]। কমিশন মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে রচনা করলেন এক ধ্রুপদী দলিল–বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে। ধ্রুপদী এ দলিলের ভিত্তি-দর্শন হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশের মাটিউত্থিত উন্নয়নদর্শন"–ধার করা কোনো উন্নয়নদর্শন নয়। উন্নয়নের এই ধ্রুপদী প্রথম-পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা দলিলটি রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল ১৯৭২-এর সংবিধানের আদর্শিক মূলনীতিসমূহকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়টি সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব পেলেও মূল দিকনির্দেশনার বিষয় ছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশ–বৈষম্যহীন, জনকল্যাণকর, সমৃদ্ধ, উন্নত, প্রগতিবাদী এক আলোকিত বাংলাদেশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে উন্নয়ন-প্রগতি অগ্রাধিকারে দিকনির্দেশনাসমূহের গুরুত্ববহ কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্যার্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এবং সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী আর্থিক ও দ্রব্যমূল্যসংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনঃগঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

---

১৪ বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ১৯৮৮, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, পৃ: ২১৪-২১৮

১৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে একত্রিত করা হলো দেশের স্বনামখ্যাত দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের। মন্ত্রী পদমর্যাদায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো ড. নুরুল ইসলামকে আর প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হলো অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মুশার্রফ হোসেনকে।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার ৩ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৫.৫ শতাংশে উন্নীত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানবশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকারকাঠামো শক্তিশালী করা।

৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজারমূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা স্থিতিশীল রাখা।

৫. পুনর্বণ্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশলসহ বণ্টন নীতিমালা এমন করা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার দেশের সামগ্রিক গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা; অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা– ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশে কমিয়ে আনা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানিকাঠামো পুনঃবিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৯. কৃষির প্রতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ণ, পানি সরবরাহ ইত্যাদি সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল নিয়ে যা উল্লেখ করলাম, সেখানে অন্তত দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয় বলে মনে করি। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী উন্নয়নদর্শনটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ-কৌশলসহ স্বাধীনতার চেতনা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তুও সে অনুযায়ী বিনির্মাণ করা হয়েছিল (সব সীমাবদ্ধতাসহ), যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসনিমিত্ত শক্ত-ভিত্তির জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল রচিত হলো তা বাস্তবায়নের মাত্র দুই বছরের মধ্যে গভীর এক আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসহ ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ-জনকল্যাণকর-বৈষম্যহ্রাসকারী-প্রগতিবাদী বাংলাদেশ বিনির্মাণের বাস্তবসম্মত স্বপ্নকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হলো– ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে।

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও প্রয়োগফলের ধনাত্মক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবণতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যদি কোনোভাবে এমন কোনো হিসেব করা সম্ভব হয়, যেখানে "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশের

অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা কেমন হতে পারতো" এটা দেখানো যায় সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের কার্যকারণ সূত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল সমীকরণও হয়তো বা উন্মোচিত হয়ে যাবে। এ ধরনের জটিল গবেষণা একটু হলেও হয়েছে, যেখানে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং সেইসাথে জাতীয়তাবাদ-সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতাসংশ্লিষ্ট চার-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রবণতা বহাল থাকতো, তাহলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চেহারাটি কেমন হতে পারতো? এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকাঠামো, প্রবৃদ্ধি হার এবং বৈষম্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন কৌশল যদি বজায় থাকতো, তাহলে মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়সহ আর্থসামাজিক শ্রেণিবৈষম্য হ্রাসে যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো, তা আজকের সময়ের বিচারে কল্পনাতীত এবং অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে[১৬]।

৪. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজ কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনটা কেমন হতো?

গবেষণায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে "বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে" এবং একই সাথে "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতির প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে বাংলাদেশ কল্পনাতীত মাত্রায় এগিয়ে যেত। যেমন প্রমাণিত হয়েছে যে ২০০০ সাল নাগাদ মালয়েশিয়াকে পেছনে ফেলে দিত বাংলাদেশ।[১৭] অর্থনীতির যেসব বড় মাপের মানদণ্ডে এসব ঘটত, তার মধ্যে আছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), (এমনকি) মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন, মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয়, মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে)।

'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর অনুষঙ্গ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতিতে কল্পনাতীত পরিবর্তন হতো এ নিয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজকাঠামোর ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটায়—এ কথা নিঃশর্ত সত্য নয়। আর সে কারণেই ভাবনাটা জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সমাজে, সমাজকাঠামোতে, শ্রেণিকাঠামোতে সম্ভাব্য কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারতো। যা হয়নি। যাকে আমি বলছি "কল্পনাতীত হারানো সম্ভাবনা" বা "unimaginable lost possibilities"।

এককথায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণিকাঠামোটি কেমন হতে পারতো? প্রশ্নটি সহজ কিন্তু উত্তর কঠিন। তবে সহজ এ প্রশ্নটি উত্থাপন এখন জরুরি; কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী বাংলাদেশে আয় ও ধনবৈষম্য ক্রমবর্ধমান। "বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে" এবং একইসাথে তাঁরই উদ্ভাবিত "সমাজ-অর্থনীতির উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে আমার হিসেবে সম্ভাব্য সামাজিক পরিবর্তন যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপ:

১) ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৭ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিষ্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালান আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুঁকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"—এ অবস্থা কখনও হতো না।

---

[১৬] এ গবেষণা ফলাফলের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, (পৃ: ১০৯-১৬০), ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

[১৭] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ। (পৃ: ১০৯-১৩৭); ঢাকা: মুক্তিবুদ্ধি প্রকাশনা।

২) মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।

৩) ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানবমুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনাসংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেত এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখত। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশপরম্পরা।

৪) সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনভার অর্পণ করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতো। এসবের প্রকৃত অভিঘাত যা দাঁড়াতো তা হলো জনগণই হতেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করতো। আর এর ফলে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশীদারিত্ব বাড়ত অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতিবিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেত। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"–এটাই ছিল "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর নিহিতার্থ।

৫) মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সবধরনের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থুল জন্মহার (crude birth rate) এবং স্থুল মৃত্যুহার (crude death rate)– উভয়ই হ্রাস পেত। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেত। জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৭ কোটিতেই থাকত কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটত। যা হতো তা হলো এই ১৭ কোটি জন-সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উচ্চতর গুণমানসমৃদ্ধ আলোকিত জন-সম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসত। আর এই রূপান্তর দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিত (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এসবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো আজকের বাংলাদেশের তুলনায় অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেত– যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

৬) জনসংখ্যা ১৭ কোটি থাকত তবে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেত। গ্রাম তো আর আজকের মতো গ্রাম থাকত না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিকসমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন– পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এসবের ফল দাঁড়াত একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন, যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০

সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেত–সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেত না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৬ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন, আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন; সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৮:৭২–এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন– এই প্রক্রিয়া থাকত না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোনো কারণে শহরে এলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানসমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

৭) বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণনিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২-এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরুত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার প্রতিশ্রুতি) ও কলকারখানায় শ্রমিকের যৌথমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকত না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকত না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকত না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।

৮) বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকত না, দারিদ্র্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ' পেশা, চর-হাওর-বাঁওড়ের মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য ইত্যাদি[১৮]।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে যেসব প্রবণতা-সম্ভাবনা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম সবকিছুই মোটামুটি তেমনটিই হতো—কারণ এ সম্ভাবনা বাস্তব, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেত। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর

[১৮] দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৭, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", (পৃ: ৩৫-৬৯); ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

ঘটত এ কারণেও যে ১৯৭২-এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি।

আজকের বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণিকাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হতো (বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তাসহ হিসেবপত্তর কেউ কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ নিয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক বর্তমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[১৯] তা যথাক্রমে ছক ৩ ও ছক ৪-এ দেখানো হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তা-ই নয় এ শ্রেণিবৈষম্য ক্রমবর্ধমান। দেশে ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য ও আয়বৈষম্য নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশপ্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক বহুমুখী দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে[২০]। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ, যাদের বলা হয় super-duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ ১ শতাংশের এক সমীকরণ, যাকে নোবেল বিজয়ী অথনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%" হিসেবে, এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ্চ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে সর্বোচ্চ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাবহেতু (lack of opportunity) ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব[২১]।

---

১৯ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেবপত্তর নিয়ে যে-কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগে অনুরোধ করব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে, তারা বিশ্বাস করেন কি না যে ১৯৭২-এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করব মানেন কি না যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে '৮'-এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যেকোনো একটি বা একাধিক রূপ, যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই 'বহুমুখী দরিদ্র', আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

২০ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৭, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। মইনুল ইসলাম (২০১৯), "বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য: সমাধান কোন পথে?" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ঢাকা: ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

২১ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জোসেফ স্টিগলিজ, (২০১৩), The Price of Inequality, Penguin Books, পৃ: ix, xi, xiii, xxix-xxxii, xlii-xliii, xliv-xlvii, 1-3, 5, 19, 35,-38; পল ক্রুগম্যান, (২০১৩), End This Depression Now, WW. Norton & Company Ltd., পৃ: ৭৪-৮২; নোয়াম চমস্কি, (২০০৪), Hegemony or Survival : America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ: ১৫৯; চাক কলিন্স. (২০১২). 99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It. পৃ: ৩, ১৯-৩১, ৪১-৪৭.

ছক ৩: আজকের (২০২২ সালের) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো কেমন?
(মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি)

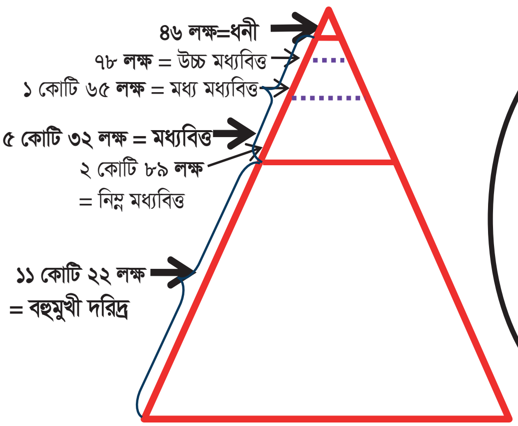

ছক ৪: 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের (২০২২ সালের) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো কেমন হতো?
(মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি)

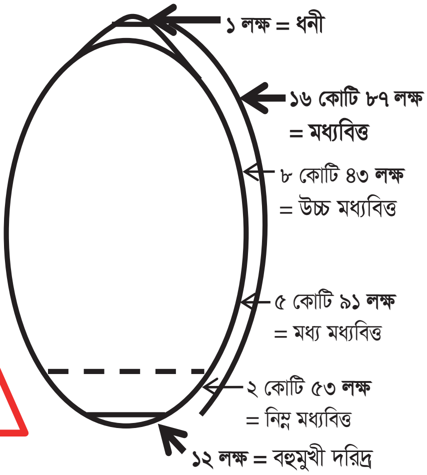

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ৩ দেখুন): মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪৬ লক্ষ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে, যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী; ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৫ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ); আর ৬৬ শতাংশ বহুমুখী দরিদ্র (multiple poor, যাদের সংখ্যা ১১ কোটি ২২ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থসামাজিক শ্রেণিমইয়ের অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয়, তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালোটাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী) বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাওখাওয়া এই rent-seeker গোষ্ঠী সমগ্র আর্থসামজিক ব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ করার ফলে বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরও ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এসবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

লেখচিত্র ১: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা:
দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৭ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০২২

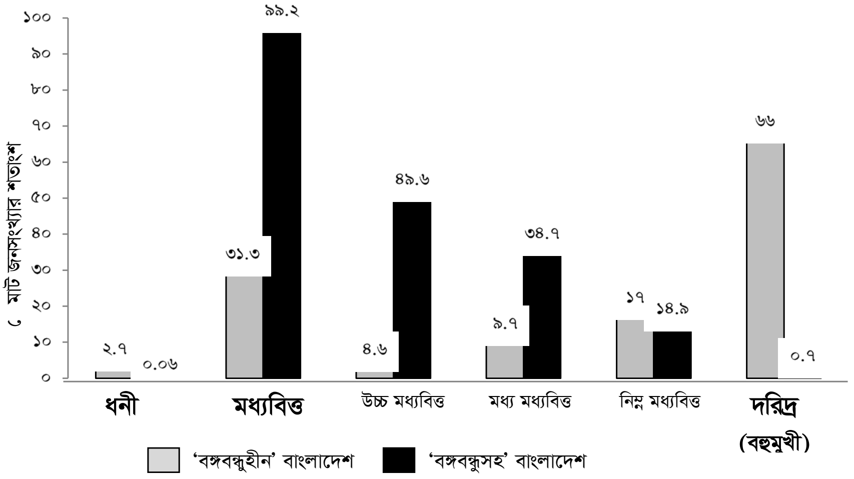

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো—এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াত, তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৪, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ১ দেখুন): আজকের বাংলাদেশে মোট ১৭ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী, সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াত ০.০৬ শতাংশ (অর্থাৎ আজকের ৪৬ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণিকাঠামোর একদম নিচতলার বহুমুখী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজকে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ (মোট ১১ কোটি ২২ লক্ষ মানুষ), সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে (আজকের দৃষ্টিতে-এই সময়ে বসে) কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াত (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হতো মাত্র ১২ লক্ষ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচে বড় যে পরিবর্তন ঘটত, সেটা হলো—মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর–আজকে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৫ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ), যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.২ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আজকের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪৬ গুণ কমে যেত, অন্যদিকে বহুমুখী দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৪ গুণ কমে যেত, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বাড়ত।

'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। কিন্তু মধ্যবিত্তে ঘটত বড় ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর। মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এখানেই ঘটত

আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ১০.৮ গুণ (আজকের বাংলাদেশের ৭৮ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ৯১ লক্ষ মানুষ), আর সঙ্গত কারণেই মধ্যবিত্তের উপরতলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ হ্রাস পেত (মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ মানুষে দাঁড়াত)। অর্থাৎ এককথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিবাদী আমূল রূপান্তর ঘটত–এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে এখন থেকে ৫০ বছর আগের বাংলাদেশের সমকক্ষীয় বেশকিছু দেশ অর্থনৈতিকভাবে বেশ উন্নতি করেছে, এ কথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে ঐসব দেশে তেমন কোনো প্রগতিমুখী রূপান্তর ঘটেনি, যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটত। আর তা ঘটত "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই, অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটত সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরও কিছু বিশ্লেষণাত্মক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরও কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

১. জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাকাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে'–প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়[২২]। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার (individual-household-family) পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না।

২. ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকত, তা বণ্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বণ্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণিকাঠামো মইয়ের উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোনো

[২২] আমার কাছে সংবিধানে বিধৃত এই সমবায়ের অর্থ অধুনা তথাকথিত 'অংশগ্রহণমূলক' (partnership) উন্নয়ন বলতে যা বুঝানো হয় তা নয়। তথাকথিত "অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন" আসলে নয়া-উদারবাদীদের প্রেসক্রিপশন। এক্ষেত্রে যা বুঝানো হয় তাতে আমি বুঝি সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়তেই থাকবে আর তারই মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মেহনতি মানুষ অধিক হারে সম্পৃক্ত হবেন বা অংশগ্রহণ করবেন। আমার কাছে এই 'অংশগ্রহণের' অর্থ "শ্রমিক-কৃষক আরও বেশি কাজ করো, আরো বেশি উৎপাদন করো। আর আমরা মালিকরা যত বেশি পাবো তার অংশ তো চুইয়ে তোমাদের কাছেই যাবে– trickle down হবে। তোমরা আগের চেয়ে ভাল থাকবে। মজুরির আন্দোলন করে অযথা ঝামেলা বাড়িও না। কারখানা বন্ধ হলে তোমাদের কাজ থাকবে না। আর তাতে দেশের মহাক্ষতি হয়ে যাবে"। এই সম্পৃক্ততার বা অংশগ্রহণের মানে দাঁড়ায় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের যন্ত্র-হাতিয়ারের উপর যেমন চাষের জমির উপর প্রকৃত কৃষকের থাকবে বড়জোর অভিগম্যতা (access) মালিকানা (ownership) নয়। এসবই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud) যার পেছনে আছে সমাজতন্ত্রসহ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ঠেকানোর প্রচেষ্টা আর অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দর্শন এবং যার বাস্তবায়ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক ও নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশিয়ান ডেভেলোপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাবলু টি ও), আফ্রিকান ডেভেলোপমেন্ট ব্যাংকসহ জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান, এবং ইদানীংকালের বহু ধরনের 'থিংক ট্যাংক' (Think Tank, মহাচিন্তা-মহাদুশ্চিন্তার ল্যাবরেটরি) কে।

সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মইয়ের (class ladder) উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে থাকত উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণিমইয়ের সর্বনিম্ন ১০ শতাংশের হাতে থাকত উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকত ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানাভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩. জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোনো সুযোগ থাকত না। বংশপরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকত না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদীভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপৎকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system) নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারও দরিদ্র থাকার কোনো সুযোগই থাকত না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশানির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো। এসবই "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর মর্মবস্তু।

৫. উপসংহার

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজভাবনা, রাজনীতিচিন্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নভাবনার পরস্পরসম্পর্কিত এক সমগ্রক রূপ। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর মৌল ভিত্তি চেতনা হলো জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। এ দর্শন বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে সহায়ক। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক বাস্তব প্রয়োগ হয় ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে, যার ইতিবাচক অভিঘাত ছিল দৃশ্যমান। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ হয়নি; বাধাগ্রস্ত হয় ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে। তবে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ-বাস্তবায়ন হলে ২০০০ সাল নাগাদ স্বাধীন বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত শ্রেণিবৈষম্যহীন শক্তিশালী অর্থনীতিসমৃদ্ধ ও আলোকিত মানুষের সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতো। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বাস্তবায়নের অনুকূল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোকেই হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সমগ্র কাঠামোটিই ছিল প্রতিকূল। বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালের কাঠামো নিও-লিবারেল মুক্তবাজার দর্শনভিত্তিক পরজীবী-লুটেরা পুঁজিবাদ (rent seeking capitalism) বিকশিত হবার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যও ছিল তাইই—শোষিতের গণতন্ত্রভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের কাঠামো ভেঙ্গেচুরে শোষণভিত্তিক লুটেরা-পরজীবী ধনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা, যে কাঠামোতে দেশের মোট উৎপাদন বাড়তে পারে—কিন্তু আয়বৈষম্য, ধনবৈষম্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাড়বেই।

এহেন ঐতিহাসিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন প্রশ্ন—"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অনুষঙ্গ "বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়ন সম্ভব কি? আমার মতে, পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে চলমান কাঠামোতেই কয়েকটি সম্ভাবনা পরীক্ষা-নীরিক্ষা-প্রয়োগ করে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে আমি অন্তত তিনটি বড় মাপের ক্ষেত্র দেখি, যেখানে ঐ সম্ভাবনা প্রয়োগ করে দেখা সমীচীন: (১) রাষ্ট্রীয় আয়োজনে সারা দেশে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার, যেখানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ সামাজিক মর্যাদা হতে হবে সর্বোচ্চ যাতে মেধাবিরা প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হন। (২) রাষ্ট্রীয় আয়োজনে দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। অসংক্রামক ব্যাধি যেমন ক্যান্সার, হার্টের অসুখ, কিডনির অসুখ, ডায়াবেটিস—এসব রোগে প্রতিবছর আমাদের দেশে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্র হন। অসংক্রামক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা হতে হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে—রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে (অন্তত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য)। (৩) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বহুমুখী-গণমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা (এক্ষেত্রে খাসজমি-জলা সমবায়ী মালিকানায় দেয়া যেতে পারে)। আমার ধারণা বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোতে অন্তত উল্লিখিত ৩টি পদক্ষেপ-কর্মকাণ্ড গ্রহণ সম্ভব, যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য কমবে। কমবে ধনবৈষম্য, আয়বৈষম্য, স্বাস্থ্যবৈষম্য ও শিক্ষাবৈষম্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটাও হতে পারে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর আংশিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশে মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ফলপ্রদ পথ-পদ্ধতি।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১২১-১৪২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারসংক্ষেপ *কোভিড-১৯ (COVID-19) বা করোনাভাইরাস গোটা পৃথিবীকে স্থবির করে দিয়েছে। এর ভয়াল থাবার শিকার নারী-পুরুষনির্বিশেষে—বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নবজাতক পর্যন্ত সবাই। ২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশে এই মহামারির হানা আসার পর বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক জীবনমানে বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের আয়ের ওপর অবর্ণনীয় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রান্তিক শ্রমজীবী ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সমস্যার সংগতিপূর্ণ সমাধানের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারনির্ভর এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিডের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু করোনাভাইরাসের প্রভাব এখনো বিদ্যমান, কাজেই কোনো জরিপের ফলাফলই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যাবে না। শুধু ব্যক্তি উদ্যোগে বা সরকারের একার পক্ষে এ ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয়। তাই সবাই মিলে একত্রে কোভিড-১৯-এর মোকাবিলা করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পেশাজীবীর সবাইকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক শ্রমজীবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে তাদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থা করতে হবে। এ গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, শুধু রাষ্ট্র ও সামাজিক উদ্যোগসহ ব্যক্তিপর্যায়েও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের জীবযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।*

মূলশব্দ *কোভিড-১৯ · নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষ · প্রান্তিক পেশাজীবী · জীবিকা*

১. গবেষণার পটভূমি

বাংলাদেশ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। মহামারি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিকভাবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত 'সাধারণ ছুটি' ও লকডাউন ঘোষণা করে। এরপর বিভিন্ন ধাপে বাংলাদেশ সরকার লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করে। এতে করে

* সহযোগী অধ্যাপক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ই-মেইলঃ mjalam.jsc@du.ac.bd

বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্থনীতি আকস্মিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। দীর্ঘ সাধারণ ছুটির মধ্যে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবীদের কর্মহীনতার ফলে তাদের জীবনে ঘটেছে চরম বিপর্যয় ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। এই গবেষণা প্রবন্ধে কোভিড-১৯ চলাকালীন বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী শ্রেণির সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয় ও দুর্ভোগের প্রকৃত চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক পরিচালিত 'শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০' অনুসারে বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৮৭ ভাগ অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এটি একটি অরক্ষিত খাত। এখানে আরও উল্লেখ্য, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৪ সালের বস্তি শুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, কেবল ঢাকা শহরের দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৩ হাজার ৩৯৪টি ছোট-বড় বস্তি রয়েছে। এসব বস্তিতে মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ঘর রয়েছে। এসব ঘরে বসবাস করে ৬ লক্ষাধিক প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষ। এসব বস্তিতে বসবাস করতে গিয়ে নিজেদের আয়ের ৬০ শতাংশেরও বেশি টাকা ঘরভাড়া হিসেবে খরচ করতে হয়। বাকি ৪০ শতাংশে প্রাত্যহিক খরচ চালানো তাদের জন্য অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশের পেশা বাসা-বাড়িতে গৃহপরিচারিকা, রাস্তা ও ফুটপাতে হকার, রিকশা-ভ্যানচালক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পোশাকশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, মোটরশ্রমিক, ভ্রাম্যমাণ মাছ-মাংস-ফলমূল-সবজি বিক্রেতা ও ভিক্ষুক। এসব প্রান্তিক পেশাজীবীর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে ঢাকা শহরের প্রায় দুই কোটি মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাপনের গতিশীলতা। অথচ এই বৈশ্বিক মহামারিকালীন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছেন এই প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষেরা। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণে তাদের অনেকে ঢাকা শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এ কারণে দুই কোটি নাগরিকের অভ্যস্ততাও ব্যাহত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রান্তিক এসব মানুষের আয় ও সার্বিক জীবনমানে কোভিড-১৯-এর প্রভাবের স্বরূপ পর্যালোচনার প্রয়াস গ্রহণ এবং গঠনগত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২. গবেষণা পর্যালোচনা

কোভিড-১৯ থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্যসংকট বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সর্বোপরি অর্থনীতিতে গভীর অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। এ গ্রহের ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার নজির নেই, যার ফলে সর্ব-দক্ষিণে চিলির পুয়ের্তো উইলিয়াম থেকে সর্ব-উত্তরে নরওয়ের হ্যামারফাস্ট পর্যন্ত সব অঞ্চলে একযোগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এমনকি দুটি বিশ্বযুদ্ধেও পুরো পৃথিবী এভাবে স্থবির হয়ে পড়েনি। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পুরো পৃথিবী প্রায় অচল হয়ে গেছে। এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ। শুধু উচ্চ বেকারত্ব ও কর্মহীনতাই প্রান্তিক পেশাজীবীদের একমাত্র সমস্যা নয়; তারা আরও বেশি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এখনও তারা এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অনাড়ম্বর জীবন, ক্ষুধা, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন, পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুচিকিৎসা প্রভৃতির অভাব প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমানকে স্থায়ী দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করছে। কোভিড-১৯ তাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধকে আরও কঠিন করে তুলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপ অনুসারে, ২০১৬ সালে দেশের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক দারিদ্র্য ছিল ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ; ২০১৮ সালের *জিইডি-সানেম* জরিপ অনুসারে, যা ছিল ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ। কিন্তু করোনার প্রভাবে ২০২০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ। ছোট দেশ অধিক জনসংখ্যা, অপর্যাপ্ত খনিজসম্পদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব—নানাবিধ সমস্যার মধ্যে থেকেও বিস্ময়কর গতিতে দেশটি অর্থনৈতিক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে সীমিত সম্পদ

নিয়েই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এসেছে। কিন্তু করোনার ফলে প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বেড়েছে। প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা হ্রাস পেয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, উপার্জন কমে যাওয়ায় জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে তারা এমন কৌশল অবলম্বন করবে, যা কার্যত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। খরচ কমাতে তারা কম খাবার খাবে, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। কিংবা স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে স্থায়ী দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়বে। এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয় যে, কেউ কেউ অসামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে, যার ফলে আইন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটবে। রাষ্ট্রের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা, তাদের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্রীয় একটি বিশেষ সংস্থা গঠন এবং সেই সংস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবীদের যাবতীয় জরুরি প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। করোনার প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

করোনা এমন একসময় আঘাত হেনেছে, যখন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরিত হচ্ছে। করোনা থেকে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এসডিজির লক্ষ্য পূরণ শঙ্কার মুখে পড়েছে। এ গবেষণা প্রবন্ধ সে শঙ্কার মাত্রা পরিমাপ করতে সহায়ক ও এ সংকট থেকে উত্তরণে অবদান রাখবে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে প্রথমবারের মতো এবং ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ। ২০২৪ সালের সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এ অভীষ্টযাত্রায় প্রতিবন্ধক হতে পারে করোনার প্রভাব। এমতাবস্থায়, এ গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য বাংলাদেশের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিরূপণ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায়সমূহের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবীদের কর্মহীনতা, আয় কমে যাওয়া ও এর অব্যবহিত ফলস্বরূপ তাদের জীবনমানের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা পর্যালোচনা করা। অর্থনৈতিক সম্পৃক্তির মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার উপায় অনুসন্ধান এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য হলো:

(ক) কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট সমস্যায় প্রান্তিক পেশাজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা।

(খ) প্রান্তিক পেশাজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপসমূহের বিশ্লেষণ।

(গ) কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান।

৪. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রপপঞ্চের সংজ্ঞায়ন

এই গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রপপঞ্চের সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

৪.১. প্রান্তিক পেশাজীবী

মূলত কর্মক্ষেত্রে অস্থায়ী, দুর্বল প্রশিক্ষণ, কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাব, অনুপ্রেরণার অভাব, দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পেশাই হলো প্রান্তিক পেশা। এ সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকায় এসব পেশাজীবী নিয়োগকর্তার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন না। অনেকাংশে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হন। বাসাবাড়িতে কর্মরত, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, রিকশা-ভ্যান-বাসচালক, নির্মাণশ্রমিক, হকার প্রভৃতি পেশার শ্রমজীবী মানুষ প্রান্তিক পেশার শ্রেণিভুক্ত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য (Hossain, 2021)। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে প্রান্তিক পেশাজীবীরা অধিকসংখ্যক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। সে কারণে পরিবারের সদস্যসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়, যার ফলে এই প্রান্তিক পেশাজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা অসচ্ছল থাকে।

৪.২. নিম্নবিত্ত শ্রেণি

দারিদ্র্য, গৃহহীনতা এবং বেকারত্বের দ্বারা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। এ শ্রেণির মানুষেরা মূলত, চিকিৎসাসেবা, বাসস্থান, পুষ্টিকর খাদ্য, অপরিহার্য পোশাক, নিরাপত্তা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সমস্যায় থাকে (Newton, 2017)। প্রধানত কৃষক, পোশাকশ্রমিক, মুদি দোকানদার এ শ্রেণিভুক্ত মানুষ। কিছু পরিবারে আর্থিক সংগতি থাকলেও এদের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবে তারা দারিদ্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে এবং দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন।

৪.৩. নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান গরিব ও ধনীদের মাঝামাঝি। এ শ্রেণিভুক্ত মানুষের আয় নিম্নবিত্ত মানুষের আয়ের চেয়ে বেশি, তবে উচ্চবিত্তদের আয়ের চেয়ে কম। সম্পদ, শিক্ষা এবং প্রতিপত্তি অনুসারে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন ১. নিম্ন-মধ্যবিত্ত, ২. উচ্চ-মধ্যবিত্ত। বেসরকারি চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, শিক্ষক প্রভৃতি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষ। এ গবেষণা প্রবন্ধে শুধু নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা অনুসারে, বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি অনেকাংশে নিম্নবিত্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে শিক্ষা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই।

কোভিড-১৯ নিয়ে প্রথম গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশ করেন গণ-মানুষের অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. আবুল বারকাত 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে', তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ করেন, "কোভিড-১৯-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০২০ সালে দেশে প্রথম লকডাউনের আগে মোট মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৯০ লক্ষ। লকডাউনের পর মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৫০ লক্ষে। অর্থাৎ মাত্র দুই মাসের মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।"

৪.৪. আয় বৈষম্য

কোভিড-১৯ যে শুধু শ্রেণিকাঠামো পাল্টে দিয়েছে তা-ই নয়, করোনা এবং লকডাউনের কারণে দেশে আয় বৈষম্যও বেড়েছে। কোভিড-১৯ দেশের খানার মোট আয় (Total household income) বণ্টনে

বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। আয় বৈষম্য মারাত্মক বলা হয় তখন, যখন বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ/জিনি সহগ-এর (Gini coefficient) মান ০.৫ অতিক্রম করে। গিনি সহগ বাড়তে থাকা মানে আয় বৈষম্য বাড়তে থাকা। আয় বৈষম্য 'মারাত্মক বিপজ্জনক' বলা হয়, যখন পালমা অনুপাত (Palma ratio) সংখ্যাটি ৩ এর কাছাকাছি বা ৩ অতিক্রম করে। লকডাউনের আগে আমাদের গিনি সহগ ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের ৬৬ দিন পর হয়েছে ০.৬৩৫। লকডাউনের আগে পালমা অনুপাত ছিল ২.৯২, যা লকডাউনের পর হয়েছে ৭.৫৩। অনুপাতটি বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি নির্দেশ করছে। সুতরাং কোভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্য এবং 'বিপজ্জনক আয় বৈষম্য' অনুপাতের দিকে নিয়ে গেছে (বারকাত, ২০২০)।

৪.৫. অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বা অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাত বলতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কাজ বা চাকরি ও শ্রমিকদের এক বৈচিত্র্যময় সমবায়ে গঠিত অর্থনৈতিক একটি খাতকে বোঝায়। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা সুরক্ষিত নয়। রাষ্ট্র এই খাত থেকে কোনো কর আদায় করে না কিংবা এটিকে পর্যবেক্ষণও করে না। এসব অনানুষ্ঠানিক পেশা হলো মজুরিশ্রমিক, স্বনির্ভর ব্যক্তি এবং অবৈতনিক-বৈতনিক পারিবারিক শ্রম (Mahmud et. al, 2021)। শুরুতে ক্ষুদ্র অনিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সবধরনের কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিকে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বলা হলেও বর্তমানে সুরক্ষাহীন দিনমজুরের কর্মসংস্থানকেও এর আওতায় ধরা হয়। ধারণাটি মূলত ছোট অনিবন্ধিত ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (WIEGO)। বাংলাদেশে মোট কর্মরত মানুষ ৮৫ দশমিক ১ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে (Hossain, 2021)। চলমান এ পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষের জীবিকা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ব্যক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে (Islam, 2020)। আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হলো:

ক. বাস/ট্রাক/অটো-রিকশা/রিকশা/ভ্যান/লঞ্চচালক, বাসাবাড়িতে কর্মরত, হকার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নির্মাণশ্রমিক, ভিক্ষুক ইত্যাদি।

খ. কৃষক, পোশাকশ্রমিক, মুদি দোকানদার, প্রবাসী ইত্যাদি।

গ. চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, শিক্ষক ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'ক' ও 'খ' শ্রেণি নিম্নবিত্ত এবং 'গ' শ্রেণি নিম্ন-মধ্যবিত্তভুক্ত।

গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের গবেষণাগ্রন্থে 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' উল্লেখ করা হয়েছে, "বাংলাদেশে মোট সক্রিয় শ্রমশক্তির (Active labour force) তথা শ্রমবাজারের ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। কোভিড-১৯ এর ফলে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের বেশির ভাগ এই খাতে কর্মরত। যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—ফেরিওয়ালা, হকার, ভ্যানে পণ্যবিক্রেতা, চা-পান স্টল; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—মুদি দোকানদার; ক্ষুদ্র-হোটেল-রেস্তোরাঁ; ক্ষুদ্র মাঝারি পাইকার; নির্মাণশিল্পের শ্রমিক; পরিবহনশ্রমিক; রিকশা-ভ্যানচালক; কৃষিমজুর ইত্যাদি। যেহেতু ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের নিয়ে সরকারি পরিসংখ্যানে খুব বেশি কিছু নেই, যেহেতু এরা অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রধান সমস্যা এবং যেহেতু এরা কোভিড-১৯ এর লকডাউনে

খুবই ক্ষতিগ্রস্ত—সেহেতু প্রথমেই এদের আনুমানিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত হিসাবে এদের মোট আনুমানিক সংখ্যা ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪টি। এদের মধ্যে গ্রামে ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯২০ (৪০.৩ শতাংশ) এবং শহরে ৫১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭৪টি (৫৯.৭ শতাংশ)।"

কোভিড-১৯ এ লকডাউনের ফলে এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সারা দেশে অণু ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালা, চা-পান স্টল, মুদি দোকান, মাঝারি পাইকারি দোকান ও অণু-ক্ষুদ্র হোটেল রেস্তোরাঁর সংখ্যা মোট ৮৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯৪টি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে কর্মচারীর সংখ্যা (মালিকসহ) ১.৮৩ জন। সে হিসেবে ওইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোট নিযুক্ত আছেন ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬২৬ জন। এদের মধ্যে প্রথম দুই ক্যাটাগরির অর্থাৎ অণু-ব্যবসায়ীঃ ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা ও চা-পান বিক্রেতাদের প্রায় সবাই কোভিড-১৯ এর কারণে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন (বারকাত, ২০২০)।

কোভিড-১৯-এর লকডাউনে অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এসব খাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৬৫ লক্ষেরও বেশি নিঃস্ব হয়ে 'নব দরিদ্রে' রূপান্তরিত হয়েছে, অন্যরা পুঁজিপাট্টা হারিয়ে নিঃস্বপ্রায়। এদের কেউই রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়া ব্যবসা করতে পারবেন না। এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসার সচলতার সাথে মোট ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা সরাসরি নির্ভরশীল। সুতারাং এসব অণু-ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু করে অর্থনীতির প্রবাহ সচলতার জন্য সরকারকে দ্রুত অনুদানসহ ঋণ সরবরাহ করতে হবে (বারকাত, ২০২০)।

৪.৬. কোভিড-১৯

করোনাভাইরাসের ফলে সাধারণ সর্দিজ্বর থেকে শুরু করে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রম (মার্স) ও সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রমের (সার্স) মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। ২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশে কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়। করোনাভাইরাস শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতাজনিত মহামারি সৃষ্টি করেছে। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, কথা বলা, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি থেকে ক্ষুদ্র সংক্রামক কণা ছড়িয়ে পড়ে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলা, হাত পরিষ্কার রাখা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অপরিহার্য। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়, ২০২০ সালের ৮ মার্চ।

৫. প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সমীক্ষা

কোভিড-১৯ নতুন একটি বৈশ্বিক মহামারি। এ বিষয়ে মানুষের আগে কোনো ধারণা ছিল না। করোনা ভাইরাসের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে দেখতে হবে আংশিকভাবে নয় সমগ্রতার নিরিখে এবং বড় পর্দায় (বারকাত, ২০২০)। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট থেকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি এবং ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে বেরিয়ে মধ্যম আয়ের দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে (Mahmud et. al, 2021)। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ সাফল্য এবং গত কয়েক দশকের প্রবৃদ্ধি করোনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি দরিদ্র মানুষকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করেছে। সাধারণ ছুটিকালীন মাত্র ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ সরকারি সহযোগিতা পেয়েছেন এবং মাত্র ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ বেসরকারি উৎস থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। এ ছাড়া সংকটটির ব্যাপকতা এত বেশি, যা প্রতিটি দেশে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের প্রতিটি শহর, পাড়া, মহল্লা ও গ্রামে করোনা ছড়িয়ে যায় ও প্রতিটি জনপদে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশের ৩৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির সিংহভাগই স্বনির্ভর এবং দিনমজুর সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়েছেন (Islam, 2020)। এখানেই শেষ নয়, মোটামুটি টিকে থাকতে সক্ষম এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগও করোনায় স্থবির হয়ে গেছে। অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের কর্মঘণ্টা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা বেশি (Nasrin, 2021)। নারী গার্মেন্টস কর্মীদের চাকরি না থাকায় পরিবারের অন্য সদস্যদের আয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আবার অনেক পরিবারে আয় না থাকায় খরচের ভয়ে অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কম্পিউটেবল জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম (CGE) মডেল পরামর্শ দেয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর প্রভাব না থাকলে ২০২০ সালের জন্য সেক্টর অনুসারে জিডিপির বার্ষিক বৃদ্ধি ৮ দশমিক ২ শতাংশ হতো। কিন্তু কোভিড-১৯ এর ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে (Unicef Bangladesh, 2020)। কোভিড-১৯ এর আগ্রাসন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে স্থবির করে দিয়েছে। তাই কোভিডপরবর্তী সময়ে অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য শুধু প্রবৃদ্ধিভিত্তিক নীতিব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। বরং বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে সক্ষম হবে (Hossain, 2021)। অর্থনীতির পাশাপাশি, সারা দেশে দরিদ্র মানুষ পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবারের তীব্র ঘাটতিতে সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে ফেলেতে পারে (Ali & Bhuiyan, 2020; Palma, 2020)। উপার্জন ক্ষতির মুখে পড়ায় তারা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা ভবিষ্যতে জাতিকে দুর্বল ও কম মেধাসম্পন্ন প্রজন্ম উপহার দেবে। এতে খাদ্য প্রাপ্যতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী অরক্ষিত হয়ে পড়বে এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য তারা সরকারের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে (GoB, 2020)। তবে বাংলাদেশ সরকার ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) এবং ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি সম্প্রসারণ, কম দামে খোলা বাজারে চাল, আটা, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রি করা শুরু করেছে। এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে (Riaz, 2020)। পেশাদার ডাক্তার এবং দক্ষ নার্সের অভাব বাংলাদেশের জন্য আরেকটি সমস্যা (Rahman et. Al, 2020)। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের কোনো স্বাস্থ্যবীমা নেই বা উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশি কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারি হাসপাতালগুলোর কর্মদক্ষতা বাড়ানো, দক্ষ নার্স, অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসের মতো পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং কোয়ারেন্টাইনের মতো মহামারিসংক্রান্ত সমস্যা, সেইসঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পতন ও মনোস্তাত্ত্বিক মধ্যস্থতাকারীদের ট্রিগার করতে পারে। যেমন দুঃখ, উদ্বেগ, ভয়, রাগ, বিরক্তি, হতাশা, অপরাধবোধ, অসহায়ত্ব ও একাকীত্ব ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্যকে হুমকির মধ্যে ফেলতে পারে (Mamun & Griffiths, 2020)। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রান্তিক শ্রমজীবীদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় দুই কোটি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। তাদের উপার্জন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে (Mahmud et. al, 2021)। অপরদিকে, শহর এলাকার বস্তিবাসী মানুষ এবং গ্রামীণ দরিদ্র, যারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভর করে—তারা কোভিড-১৯ এর সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার। বস্তিবাসীরা তাদের দৈনিক আয়ের ৮২ শতাংশ হারিয়েছেন (Hossain, 2021)। অন্যদিকে গ্রামীণ পরিবারগুলো ৬৩ শতাংশ খাদ্য খরচ কমিয়েছেন, ৫০ শতাংশ বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সংসার খরচ চালিয়েছেন। মাত্র ৩৩

শতাংশ সরকারি সাহায্য পেয়েছেন। ৫৫ শতাংশ মানুষ তাদের সঞ্চয় ব্যবহার করে দিন যাপন করেছেন। ২২ শতাংশ পরিবার নতুনভাবে কাজের জন্য অনুসন্ধান করেছে (Genoni et. al, 2020)। শ্রমজীবীদের একটা বিরাট অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। তাদের বেশির ভাগই কোনো আয়ের উৎসের সন্ধান করতে পারেননি। যেমন প্রান্তিক শ্রমজীবীদের মধ্যে যারা কৃষিখাতে কাজ করেন তাদের সংখ্যা ৯৫ শতাংশ। যেখানে পরিষেবা খাতে মোট কর্মসংস্থানের ৭২ শতাংশ এবং শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে (Hossain, 2021)। কোভিড-১৯ এর ফলে এই শ্রেণিভুক্তের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ চাকরি হারিয়েছেন।

নিম্নবিত্ত শ্রেণিভুক্ত কয়েক লাখ প্রবাসী বাংলাদেশে ফিরেছেন। বিদ্যমান লকডাউনে অনেকে তাদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে না পারায় চাকরি হারিয়েছেন। আবার অনেকে চাকরি হারিয়ে দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন। যারা স্বদেশে আছেন, নিজ কর্মস্থলের দেশে পুনরায় ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে শিগগিরই সেসব দেশে পুনরায় ফিরতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। কেননা অনেকেরই বৈধ ওয়ার্ক পারমিট এবং কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও কর্মস্থলে যেতে পারছেন না (Mahmud et. al, 2020)। তা ছাড়া করোনার টিকাসংক্রান্ত জটিলতাও রয়েছে। বিষয়টি তাদের ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক চাপ তৈরি করে। করোনার কারণে বিভিন্ন দেশে শ্রম চাহিদা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি কমেছে নাটকীয়ভাবে। ফলস্বরূপ পোশাক শিল্প অনেকাংশে ধসে পড়েছে। লকডাউন এবং শারীরিক দূরত্ব ব্যবস্থার প্রভাবের কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া প্রবাসীরা কাজে ফিরতে না পারায় রেমিটেন্স খাতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে (Unicef Bangladesh, 2020)।

ওপরের গবেষণা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, করোনা ভাইরাসের প্রভাব সম্পর্কে অনেক গবেষণা থাকলেও এর প্রভাব থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা না থাকার কারণে আলোচ্য গবেষণাপ্রবন্ধ একটি যৌক্তিক সমাধানের দিকনির্দেশনা দেবে।

৬. গবেষণা পদ্ধতি

অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতে পেশাজীবীদের জীবিকার ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ঘটনাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণার বিষয়বস্তু, মৌলিক উদ্দেশ্য, তথ্যের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি তথ্য প্রদানকারীদের সামাজিক অবস্থার পটভূমি, এ পদ্ধতির উপযোগী বলেই গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। উপাত্ত গঠনে সুগভীর আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক পর্বে লিখিত প্রবন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষত যেগুলোতে সমাজকাঠামোর পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবীর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে এবং এই পেশাজীবীদের মধ্যে ৩০ জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই ৩০ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে তাত্ত্বিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যাবহার করে নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও এই গবেষণার জন্য গবেষক ৫০ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু, উত্তরদাতার তথ্যের সম্পৃক্তি বিন্দু (স্যাচুরেশন পয়েন্ট) এবং তথ্যের গুণমান বিবেচনা করে, গবেষক, গবেষণা বিষয়ের স্বচ্ছতার জন্য নমুনা হিসেবে ৩০ জন উত্তরদাতার তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং চলাচলের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে, এই গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনা অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং উপাত্তকে ভাবগতভাবে সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবের মাধ্যমে কোডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। যেহেতু এ জনগোষ্ঠীর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত, সেহেতু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে বাসাবাড়ির গৃহপরিচারিকা, রাস্তা ও ফুটপাতের হকার, রিকশা-ভ্যানচালক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পোশাকশ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, মোটরশ্রমিক, ভ্রাম্যমাণ মাছ-মাংস-ফলমূল-সবজি বিক্রেতা ও ভিক্ষুক শ্রেণির প্রান্তিক পেশাজীবীদের মধ্যে ৩০ জন নারী-পুরুষের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের গবেষণা প্রক্রিয়ায় গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন উৎস থেকে এ নিবন্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১. তথ্য সংগ্রহের বিবরণ

নং	পেশাজীবী	নমুনা	নারী	পুরুষ	গড় বয়স	পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা
১	বাসা-বাড়ির গৃহপরিচারিকা	৪	৪	০	৫৫.৫	৪
২	রাস্তা ও ফুটপাতের হকার	৪	২	২	৫২.৫	৫
৩	রিকশা-ভ্যান চালক	৪	০	৪	৪৫.৫	৬
৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৪	২	২	৫১.৫	৫
৫	পোশাকশ্রমিক	৪	৪	০	৩৫.৫	৩
৬	নির্মাণশ্রমিক	৪	২	২	৩০.৫	৬
৭	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	৪	২	২	৩৮.৫	৪
৮	ভিক্ষুক	২	১	১	৬১.৫	৩
	মোট	**৩০**	**১৭**	**১৩**	-	-

বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাপ্রবন্ধটি রচনার জন্য সাম্প্রতিক জরিপ, গবেষণা রিপোর্ট, দেশি-বিদেশি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কলাম, আন্তর্জাতিক জার্নাল, নির্ভরযোগ্য অনলাইন পোর্টালের প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত, গণমাধ্যম থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক খবর, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব শ্রম সংস্থা ইত্যাদি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা, নির্দেশনা, ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। যেসব গবেষণা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বই, সাময়িকী ও অন্যান্য উৎস হতে তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে, সেসব উৎসের উল্লেখ ও স্বীকৃতি এ নিবন্ধের শেষভাগে গ্রন্থপঞ্জী শিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিবিধ তথ্য-উপাত্তের যা-কিছু প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিয়ে এ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। বিবিধ উৎস থেকে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এ গবেষণাপ্রবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে এ নিবন্ধের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যগত সংকট থেকে চরম অর্থনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ সমসাময়িক দুনিয়ায় যে বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখিয়েছে, এ মহামারি সেটিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জীবন-

জীবিকার অবনমন ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রসু হয়েছে বলা যায়। এ গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন ক্ষেত্রবিশেষে ছদ্মনাম ব্যবহার করা, সাক্ষাৎকারের আগে অনুমতি গ্রহণ করা, সাক্ষাৎকারদাতার পরিচয় গোপন রাখা, তথ্যের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৭. গবেষণার ফলাফল

কোভিড-১৯ এর কারণে নিম্ন-মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বলে এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়। উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিবারগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলায় কখনো কখনো নেতিবাচক কৌশল অবলম্বন করেছে বলেও দৃশ্যমান হয়েছে। যেমন খাদ্য খরচ কমানো। এর ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আয় ক্ষতির একটি বড় ঝুঁকিতে পড়েছেন। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) সেক্টরে অনেক মানুষ সাময়িকভাবে চাকরি হারিয়েছেন। অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। নিম্নে এ গবেষণার ফলাফল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো—

৭.১ প্রান্তিক পেশাজীবীর আয়ের ওপর প্রভাব

এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, করোনার প্রকোপে প্রান্তিক পেশাজীবীরা বহুমুখী সমস্যায় আবর্তিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তারা কর্মহীন হয়েছেন অথবা আয় কমে গেছে। অব্যবহিত কারণে তাদের জীবনমানের ওপর প্রভাব পড়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। করোনা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা ও সুরক্ষা সহযোগিতা না পেয়ে প্রান্তিক পেশাজীবীরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। এ গবেষণায় দেখা যায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণরোধে লকডাউন পরিস্থিতিতে বিশাল আকারের অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে বিশেষ করে পচনশীল খাদ্য পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা এর ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। সরকারি নির্দেশনায় ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি পচনশীল খাদ্যপণ্য পরিবহন নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হলেও তাদের পণ্য বাজারজাত করতে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চলাচলের ওপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এসব পণ্যের ক্রেতাও কম। এসব কারণে কার্যত ছোট বা মাঝারি রেস্তোরাঁ এবং ভাতের হোটেল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এসব হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক কর্মচারি, কাঁচামাল সরবরাহকারীর আয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে প্রান্তিক পেশাজীবীরা বেকার হয়ে পড়েছেন। করোনাভাইরাসের কারণে সরকার যে সাধারণ ছুটি ও যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, তার কারণে অনেক প্রান্তিক পেশাজীবীও তাদের কাজ হারিয়েছেন। তবে অনেকে আবার করোনাকালে নতুন পেশার সন্ধানও করে নিয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে— ঢাকার রাজপথজুড়ে অসংখ্য মাস্ক/হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রেতার দোকান। তবে নতুন আয়ের পথ করতে পারা প্রান্তিক পেশাজীবীর সংখ্যা মোট সংখ্যার তুলনায় খুব সামান্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক পেশাজীবীদের অনেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড; চুরি বা ছিনতাইয়ের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছেন।

সারণি ২. প্রান্তিক পেশাজীবীর গড় আয়ের ওপর প্রভাব

ক্র. নং	পেশাজীবী	২০১৮-২০১৯ সালের গড় আয়	২০২০-২০২১ সালের গড় আয়	গড় আয় হ্রাস
১	বাসা-বাড়ির গৃহপরিচারিকা	৫০০০	২৫০০	২৫০০
২	রাস্তা ও ফুটপাতের হকার	৭০০০	৪০০০	৩০০০
৩	রিকশা-ভ্যান চালক	৮০০০	৭০০০	১০০০
৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৬৫০০	৫১০০	১৪০০
৫	পোশাকশ্রমিক	১২০০০	৭৬০০	৪৪০০
৬	নির্মাণশ্রমিক	১৭০০০	১১৫০০	৫৫০০
৭	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	৯০০০	৪৭০০	৪৩০০
৮	ভিক্ষুক	১০০০০	৬০০০	৪০০০

৭.২. খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ওপর প্রভাব

সাধারণ ছুটি ও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় প্রান্তিক পেশাজীবীরা খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিজেদের জীবনযাপন করছেন। যদিও সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে তার সঠিক বণ্টন হয়নি। খাদ্য সংকটের কারণে প্রান্তিক পেশাজীবীদের অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা খাবারের চাহিদা পূরণের জন্য ঋণ নিয়েছেন। এ ছাড়া খাদ্য সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হয়েছে, যা খাদ্যের বাজারমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, ফলে পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী খাবার কিনতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা যেহেতু আয় সংকটে রয়েছে, তাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাদের অবস্থা আরও নাজুক করে তুলেছে। করোনার এ সময়ে প্রান্তিক পেশাজীবীদের জন্য শীতবস্ত্রের সংকট একটি বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দেয়। শহর বা গ্রাম যেখানেই এই জনগোষ্ঠী বসবাস করে, সেখানে তাদের শীত ও কুয়াশার সঙ্গে লড়াইটা অনেক কঠিন হয়ে ওঠে। যেহেতু এদের ঘরবাড়ি মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই বস্তিতে বসবাস করে। তাই তাদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তাদের আরও বেশি। এদিকে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতরা যেখানে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারছে না, সেখানে সন্তানকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো বা নতুন করে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং অনলাইনে ক্লাসে অংশ নেওয়া তাদের জন্য এক প্রকারের বিলাসিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রান্তিক পেশাজীবীদের সন্তানেরা শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। করোনাকালে প্রান্তিক পেশাজীবীদের সন্তানদের শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। কেননা গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে থাকা এই শিক্ষার্থীদের বিকল্প অথবা বিশেষ সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক আয়ের জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা সরকার কর্তৃক প্রচারিত বা পরিচালিত কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৭.৩. চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর প্রভাব

করোনাকালে প্রান্তিক পেশাজীবীরা সবধরনের স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আকস্মিক মহামারিতে জনস্বাস্থ্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পেয়ে ফেরত আসতে হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মারাও পড়েছেন অনেকে। গর্ভবতী ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবহেলা অবজ্ঞার শিকার হয়েছে এই জনগোষ্ঠী। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা

ভঙ্গুর এবং মানুষ খুব কমই শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা পায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম, চিকিৎসক ও নার্সের অভাবে বিপুলসংখ্যক রোগী সামলাতে পারছে না। কোভিডের সময়ে এ পেশার মানুষ খুব কমই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা যেমন জ্বর, ঠান্ডা-কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও চিকিৎসকের সহায়তা পেয়েছিল। অন্যদিকে লকডাউনের সময় ক্যানসার, কিডনি রোগ এবং নতুন ধরনের কোনো রোগে আক্রান্ত বহু রোগী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাননি। যেহেতু বেশির ভাগ সরকারি হাসপাতাল কোভিড রোগীদের নিয়ে কাজ করতে পারেনি, তাই বেসরকারি হাসপাতালগুলো চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে এ পেশার কোভিড রোগীরা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সেবা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে তারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাননি। বাংলাদেশে জিডিপির মাত্র ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করেন, যা আমাদের জনসংখ্যার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র, তাদের কোনো চিকিৎসা বীমা নেই। তাই শহরের তুলনায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ অনেক বেশি ভোগান্তিতে পড়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য।

এসব চিত্র বলে দেয় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদের দেশে সরকারি জনস্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট সিস্টেম আদৌ সৃষ্টি হয়নি। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের অবশ্যই সরকারি খাতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সে কারণে এই খাতে সরকারকে ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে (বারকাত, ২০২০)।

৭.৪ কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

বৈশ্বিক মহামারি করোনায় বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবীর অনেক মানুষকে কিছু সময়ের জন্য হলেও বেকার থাকতে হয়েছে। যারা কাজে ছিলেন, তাদের অনেকের জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজনীয় আয় কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। করোনা মহামারির কারণে বিশ্বজুড়ে প্রতি দুজন মানুষের একজনের আয় কমেছে। এ গবেষণায় প্রতি তিনজনে একজন জানিয়েছেন, করোনার কারণে তাদের আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লকডাউন অবস্থা উঠে যাওয়ার পরেও এ পেশাজীবীর ক্ষতির আংশিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না বলেও এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নিম্ন আয়ের লোকেরা তাদের নিত্যকর্ম চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কর্মঘণ্টা তুলনামূলক কম হ্রাস পেয়েছে। জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রত্যেক পেশাজীবীর করোনা মহামারির প্রত্যক্ষ প্রভাবও এখন পর্যন্ত পূর্ণরূপে দৃশ্যমান নয়। কিন্তু এ বৈশ্বিক মহামারি প্রান্তিক পেশাজীবীদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ওপর যে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা দৃশ্যমান। এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, করোনার প্রবল আঘাতে আছড়ে পড়েছে কম দক্ষ বা অদক্ষ পেশার মানুষের ওপরই। তুমুলভাবে বেশি বিপর্যস্ত হয়েছে তৈরি পোশাক খাত, পর্যটন খাত, নির্মাণখাত, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, রেস্তোরাঁ ব্যবসা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পরিবহণ খাত। এ ছাড়া পল্লী অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে শস্য উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অবরুদ্ধ থাকার কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের সরবরাহ ও বিপণন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, যা সরাসরি এ পেশার মানুষের কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত। এর ফলে দেশীয় অর্থনীতিতে প্রতিদিন প্রায় অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে।

সারণি ৩. প্রান্তিক পেশাজীবীর কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

ক্র. নং	কোভিডপূর্ববর্তী পেশা	কোভিডপরবর্তী বর্তমান পেশা	কোভিডকালীন আয়ের অবস্থা	বর্তমানে কাজের অবস্থান
১	গৃহপরিচারিকা	দৈনিক শ্রমিক	কর্মহীন ও আয় কমেছে	গ্রাম
২	হকার	দৈনিক শ্রমিক	আয় কমেছে	শহর
৩	রিকশা-ভ্যানচালক	রিকশা চালক	আয় কমেছে	গ্রাম
৪	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	আয় কমেছে	শহর
৫	পোশাকশ্রমিক	দৈনিক শ্রমিক	কর্মহীন	গ্রাম
৬	নির্মাণশ্রমিক	দৈনিক শ্রমিক	কর্মহীন	শহর
৭	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা	আয় কমেছে	শহর
৮	ভিক্ষুক	ভিক্ষুক	আয় কমেছে	গ্রাম

৭.৫ পরিবার, নারী ও শিশুর ওপর প্রভাব

এ গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, করোনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রথমত, নারীরা তুলনামূলক শ্রমঘনিষ্ঠ কম-দক্ষতার কাজে সংশ্লিষ্ট থাকেন। দ্বিতীয়ত, মহামারির প্রভাবে তাদের ঘরে 'অবৈতনিক সেবামূলক' কাজের চাপ বেড়েছে। সন্তানের দেখাশোনা, বয়স্ক ও অসুস্থদের পরিচর্যা, করোনার স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ইত্যাদি কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি প্রকোপে ২০২০ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে গৃহে কাজ করা অনেক নারী এবং গার্মেন্টস কর্মী কাজ হারিয়েছেন। বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীদের অনেকেই বেকার হয়েছেন করোনা মহামারির সময়। মানসিক স্বাস্থ্য নারীদের জন্য একটি জরুরি বিষয়। কেননা মানসিক সমস্যা মোকাবিলা করা, যত্ন, বাড়তি কাজ, উপার্জনের অনিশ্চয়তা, খাদ্যনিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসুবিধা প্রাপ্তি—সবকিছু একইসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া নারীরা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়েছেন। এ মহামারি তরুণদের মনোস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং বিকাশের ওপর একটি লক্ষণীয় বিরূপ প্রভাব ফেলে। শিশু-কিশোররা কিছু করতে না পারায় বা বাইরে খেলতে যেতে না পারায় বিরক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ তারা বাবা-মা বা বয়স্কদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়। লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে খুব কমই যোগাযোগ করতে পারে। তাদের শারীরিক কার্যকলাপের সুযোগও কমে যায়। ফলস্বরূপ তারা উদ্বেগ, ঘুম রোগ, চাপ এবং বিষণ্নতাসহ বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি, মৃত্যুর খবর, অস্বাভাবিক আচরণ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষতি শিশুদের ওপর তীব্র মানসিক প্রভাব ফেলেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.৬ সামাজিক অসহযোগিতা

এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কোভিডের ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণির মানুষেরা কোভিডের আগে পরস্পরকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু মহামারির অজানা আশঙ্কায় তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে দেখা গেছে। কোথাও কোথাও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন মৃতের দাফন করানো, দুর্ঘটনায় পড়লে সাহায্যে এগিয়ে আসা, রক্ত দেওয়া, বিয়ে, জন্মদিন বা সামাজিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে তারা পরস্পরকে এড়িয়ে গেছেন। এমনও নজির দেখা গেছে যে, করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে, তাকে নিজ গ্রামে দাফনও করতে দেওয়া হয়নি। ফলে মানুষের সামাজিক গুণাবলীর সহজাত প্রবৃত্তি

বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং সুকুমার বৃত্তি অনেকাংশে কঠিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। এতে পারস্পরিক আন্তরিকতা হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার মতো সামাজিক শিক্ষা অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কোভিডের প্রকোপ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণির মানুষ আবার অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ ত্যাগ করেছে। কিন্তু সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রগ্রস্ত হয়েছে।

৭.৭ সমাজে সুদখোর-মহাজনদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি

এই গবেষণানিবন্ধে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির বহু মানুষ করোনার প্রারম্ভে কর্মহীন হয়ে পড়েন। এ কারণে তারা শহর ছেড়ে পরিবারসহ গ্রামে যেতে বাধ্য হন। তবে সেখানে গিয়ে পর্যাপ্ত কাজের অভাবে ও দৈনিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা স্থানীয় সুদখোর-মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন। কেউ কেউ টিকে থাকতে পারলেও বেশির ভাগই তাদের পুঁজি নষ্ট করে ফেলেন। পুঁজি হারিয়ে ও মহাজনের সুদের কিস্তির চাপে পড়ে অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। একইসঙ্গে পরিবারের চাহিদার জোগান দিতে অক্ষম হয়ে পড়ায় কেউ কেউ আত্মহননের পথও বেছে নেন, যা একটি পরিবারের জন্য অত্যন্ত হতাশা ও দুঃখের। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। গ্রামে ফিরে যাওয়া মানুষদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সফল হয়েছেন। কেউ কেউ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালিয়ে বেশ ভালোভাবেই কালাতিপাত করছেন। এদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে গ্রামেই থেকে গেছেন, করোনা পরিস্থিতি উন্নতি লাভ করলেও তারা আর আগের কাজে শহরে ফিরবেন না। এর ফলে তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছেন।

৭.৮ শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তর

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সৃষ্ট চলমান আর্থিক সংকটের কারণে অজস্র মানুষ গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছেন। গ্রামে ফিরেই তারা অনেকেই কোনো ধরনের কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। তা ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গেও সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশির ভাগ অঞ্চলেই যৌথপরিবার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও একক পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে। তাই গ্রামে ফেরা মানুষগুলোর প্রথমেই পরিবারের সদস্যদের সমস্যাগুলো মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। এদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন, তারা পরিবার ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেন। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন বেকার ছিলেন বা কাজ খুঁজে পেতে দেরি হয়েছে, তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকসহ নানা ধরনের চাপের মুখে পড়েছেন। এর ফলে সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতনের হার বেড়ে গেছে। অনেকে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো দুঃখজনক পরিস্থিতিরও শিকার হয়েছেন। আবার পরিবারের ভরণপোষণ ঠিকমতো করতে না পারার কারণে প্রচুর বাল্যবিয়েও হয়েছে। এতে মা ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়েছে। প্রান্তিক পেশাজীবীদের শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরের ফলে অনেক শিশু শিক্ষার্থী অসময়ে বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে মাঝারি বা ভারী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর ফলে অনিরাপদ শিশুশ্রম বেড়ে গেছে।

এমনও হতে পারে যে, মধ্যবিত্তদের একাংশ আর শহরেই থাকবে না—স্থায়ীভাবে গ্রামমুখী হবে। এতদিন যে 'নগরায়ণ' অর্থাৎ গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা মানুষ দেখেছে, কোভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা এর উল্টোটা ঘটাতে পারে। অর্থাৎ শহরের মানুষ হবেন গ্রামমুখী- 'গ্রামায়ণ'। আর এই গ্রামায়ণে প্রধান বাহক হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (বারকাত, ২০২০)।

৭.৯ আয়ের উৎসের ওপর প্রভাব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটির কারণে গুচ্ছভিত্তিক পেশাজীবীরা কাজ হারিয়েছেন বা তাদের উপার্জন কমে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকায় স্কুলভ্যানচালক কাজ হারিয়েছেন। রিকশায় বা অটোরিকশায় যাত্রীসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। রাস্তায় খাবার বিক্রেতার বিক্রি কমে গেছে বা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে ক্রেতা কমে তাদের আয় কমেছে। তারা কর্মচারীও ছাঁটাই করেছে। অনেক ক্ষেত্রে রেস্তোরাঁর কারিগরও কাজ হারিয়েছেন, যদিও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শ্রমিক। স্টেশনারি দোকান যেখানে খাতা-কলম-পেনসিল ইত্যাদি শিক্ষাসম্পর্কিত পণ্য বিক্রি হয়, সেসব বিক্রি কমে গেছে। এগুলো উৎপাদনের সঙ্গে যেসব কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তাদের অনেকে কাজ হারিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কম্পিউটার কম্পোজ, ফটোকপির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের ইউনিফর্ম যারা তৈরি ও বিক্রি করতেন তাদের হাতে কোনো কাজই নেই। এসব প্রান্তিক পেশাজীবীর পরিবারে খাদ্য, পুষ্টি ও জীবনমানে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

৮. সুপারিশমালা

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ নিয়ে প্রথম কাজ করেন প্রফেসর আবুল বারকাত (বারকাত, ২০২০)। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উঠে এসেছে করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব। ক্ষতির আশঙ্কা হয়তো অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং তা সম্ভব। যদি করোনাভাইরাস অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয়, তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত মানুষকে খাদ্যবাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারা দেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা। মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। অবশ্য এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অংক কম-বেশি হতে পারে। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দপ্রাপ্তি যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ণ; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগহীন। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময়নির্ধারিত। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে দিতে হবে, মোবাইলে এসএমএস দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নের পর তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ বা খাবার যথাযথভাবে পৌঁছাতে হবে (বারকাত, ২০২০)।

তবে দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলমান থাকলে সমস্যার সমাধান দীর্ঘায়িত হবে। সেক্ষেত্রে মানুষের কাজও প্রয়োজন হবে। কাজ না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য নিরাশ না হয়ে কাজ খুঁজতে হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কাজ, পুকুর-দীঘি খননের কাজ, স্কুলঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি করতে হবে। আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরামূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ

করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেট বরদাস্ত করা হবে না। কোভিড-১৯-এর ক্ষতি মোকাবেলা এবং একই সাথে নিম্নগামী ও মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার উত্তরোত্তর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বহু কিছু করতে হবে, লাগবে অর্থ, লাগবে জনগণের সম্পৃক্ততা, লাগবে নেতৃত্বের সততা, সাহস এবং দেশপ্রেম (বারকাত, ২০২০)।

এ গবেষণা প্রবন্ধে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো:

ক. কোভিডপরবর্তী পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতীয় বহুমাত্রিক ধারণার ওপর একটি নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

গ. বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য একটি বীমা পরিকল্পনা ও প্রণোদনা প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের ভঙ্গুর স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজাতে হলে এই খাতে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। নার্সিং, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ও ওষুধের ওপর দক্ষতা প্রশিক্ষণের দিকেও মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

ঘ. কোভিড-১৯ সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচারের উপায় হিসেবে অনলাইনভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান এবং সম্ভাব্য টেলিমেডিসিন সেবা আরও বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারাও সাধারণ মানুষকে করোনা সম্পর্কে সতর্ক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঙ. বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অল্প দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে বেশির ভাগই আধাদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ কর্মী রয়েছেন। চাকরির যোগসূত্রসম্পর্কিত বৃত্তিমূলক দক্ষতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে মহামারি পুনরুদ্ধারের ভবিষ্যৎ পর্যায়গুলোর জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যাতে করে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের অর্জিত দক্ষতা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবহার করতে পারেন।

চ. পিছিয়ে থাকা দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন সহজে বিকল্প শিক্ষার সুবিধা নিতে পারে সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ছ. যেসব অভিবাসী শ্রমিক করোনা মাহমারির কারণে ইতিমধ্যে দেশে ফিরে এসেছেন অথবা চাকরি হারিয়ে প্রবাসে অবস্থান করছেন, তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রয়োজনে দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে উৎপাদনশীল খাতে সংযুক্ত করতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. উপসংহার

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস মহামারি আমাদের নতুন এক সার্বজনীন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মাধ্যমে আমরা শিখেছি—এই গ্রহে আমরা সবাই এক, আমাদের সমস্যা ও সম্ভাবনাও একই সূত্রে গাঁথা। তাই সামাজিক বৈষম্য দূর করাটা এখন সময়ের দাবি। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা থেকে অনিয়ম ও বৈষম্য দূর করতে হবে। তা না হলে মানবজাতির অস্তিত্ব ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রান্তিক পেশাজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। যদিও জরাজীর্ণ অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশকে কোভিড-১৯ এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে যেতে হবে। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বের পরিবর্তনগুলো ত্বরান্বিত করেছে, যা বিশ্ববাসীকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর ফলে অনেক কাজের প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হবে এবং আমাদেরও পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কেবল উপযুক্ত নীতি ও কৌশল এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে উন্নয়নের ধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে। কাজেই উদ্যোগ গ্রহণ, নীতি বা আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে তা যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাংলাদেশের সব নাগরিককে একসঙ্গে সরকারকে সাহায্য করতে হবে যেন কোভিড-১৯ এর ক্ষতি আমরা অতিদ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারি। তাই পরিশেষে বলা দরকার, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় মানুষকে নিজ নিজ জীবনধারা পরিবর্তন করতে হয়েছে। করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ সমস্ত বিশ্বকে বদলে দিয়েছে এবং জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

Ali, M. & Bhuiyan, M. (19 August, 2020). Around 1.7m youths may lose jobs in 2020 for pandemic. *The Financial Express*. Retrieved from: https://www.tbsnews.net/bangladesh/around-17m-youths-may-lose-jobs-2020-pandemic-121351

COVID-19: Bangladesh Multi-Sectoral Anticipatory Impact and Needs Analysis (15 April, 2020). *Government of Bangladesh (GoB)*. Retrieved from: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID_NAWG%20Anticipatory%20Impacts%20and%20Needs%20Analysis.pdf

Genoni, E. M., Khan, I. A., Krishnan, N., Palanswamy, N. & Raza. W. (2020). *Losing Livelihoods: The Labor Market Impacts of COVID-19 in Bangladesh*. World Bank Group. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34449/Losing-Livelihoods-The-Labor-Market-Impacts-of-COVID-19-in-Bangladesh.pdf

Hossain, I. M. (10 March, 2021). COVID-19 Impacts on Employment and Livelihood of Marginal People in Bangladesh: Lessons Learned and Way Forward. *Research Article*. Volume: 28, Issue: 1, Page(s): 57-71. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0971523121995072

International Labour Organization *(ILO)* (2010). Informal economy in Bangladesh. Retrieved from: https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/informal-economy/lang--en/index.htm

Islam, R. (17 April, 2020). Focus both on saving lives, *livelihoods: Experts to govt. United News of Bangladesh*. Retrieved from: https://unb.com.bd/category/Special/focus-both-on-saving-lives-livelihoods-experts-to-govt/49774

Mahmud, S., Zubayer, A. S., Eshtiak, A., Ahmed, I. & Nasim, H. M. (6 July, 2021). *Economic Impact of COVID-19 on the Vulnerable Population of Bangladesh*. Retrieved from: https://assets.researchsquare.com/files/rs-279226/v2_covered.pdf?c=1631872627

Mamun, A. M., Griffths, D. M. (June, 2020). First COVID-19 suicide case in Bangladesh due to fear of COVID-19 and xenophobia: Possible Suicide Prevention Strategies. *Asian Journal of Psychiatry*. Volume: 51, 102073. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820301842?via%3Dihub

Nasrin, M. (October, 2021). The Socio-Economic Impact and Implications of Covid-19 in Bangladesh: A Sociological Study According to Sociological Theories and Social

Determinants. Retrieved from: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=112588

Newton, C. (26 September, 2017). *What is Marginal Employment?*. Retrieved from: https://bizfluent.com/info-10029888-marginal-employment.html

Palma, P. (4April, 2020). Coronavirus Pandemic: A big blow to overseas jobs. *The Daily Star*. Retrieved from: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/coronavirus-pandemic-big-blow- - overseas jobs-1889365

Rahman, R. M., Sajib, H. E., Chowdhury, M. I., Banik, A., Bhattachary, R. & Ahmed, H. (December, 2020). A Review on Present Scenario of COVID-19 in Bangladesh. DOI: 10.20944/ preprints 202012.0661.v1. *Researchgate.* Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/347890174_A_Review_on_Present_Scenario_of_COVID-19_in_Bangladesh

Riaz, A. (8 April, 2020). Bangladesh's COVID-19 stimulus: Leaving the most vulnerable behind. *Atlantic Council*. Retrieved from: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/bangladeshs-covid-19-stimulus-leaving-the-most-vulnerable-behind/

Unicef Bangladesh (2020). Retrieved from: https://www.unicef.org/bangladesh/media/5256/file/%20Tackling%20the%20COVID-19%20economic%20crisis%20in%20Bangladesh.pdf%20.pdf

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (2020). Informal Economy (Empowering Informal Workers, Securing Informal Livelihoods). Retrieved from: https://www.wiego.org/informal-economy

পরিশিষ্ট
(গবেষণার প্রশ্নাবলী)

(বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা)

অংশগ্রহণকারীর সাধারণ তথ্য

১. নাম:

২. বয়স:

৩. লিঙ্গ: □ পুরুষ □ মহিলা □ অন্যান্য

৪. যোগাযোগের নম্বর:

৫. বর্তমান ঠিকানা:

অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা:

৬. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা:

৭. পরিবারের সদস্যসংখ্যা:

৮. পরিবারের সদস্যসংখ্যা:

বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা

৯. ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে পরিবারের মাসিক গড় আয়ের পরিসর

বছর	মাসিক গড় আয়
২০১৯	
২০২০	
২০২১	

১০. কোভিড-১৯-এর ফলে আপনার বর্তমান পেশায় কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে?

১১. কোভিড-১৯-এর কারণে আপনি আপনার দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে কী ধরনের প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছেন?

১২. আপনি কি এই কাভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন?

১৩. এই কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন আপনি আপনার পরিবার, শিশু এবং মহিলাদের ওপর কী ধরনের প্রভাব লক্ষ করছেন?

১৪. মহমারির সময়ে আপনি কী কোনো সামাজিক সহযোগিতা পেয়েছেন?

১৫. কোভিড-১৯-এর সময়ে আপনি কি শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছেন?

১৬. কোভিড-১৯ পরবর্তী আপনি কী পেশা পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করছেন?

১৭. কোভিডের সময়ে আপনি কোন কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

১৮. মহামারি কীভাবে আপনার সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে?

১৯. মহামারি চলার সময়ে আপনি কী সরকারের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পেয়েছেন?
১৯.১ যদি হ্যাঁ হয়, কত পরিমাণে এবং কতবার আপনি আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন?
১৯.২ যদি না হয়, তাহলে আপনি কেন কোনো আর্থিক সহায়তা পাননি?

২০. মহামারির প্রকোপ থেকে প্রান্তিক পেশাজীবীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৪৩-১৬৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

পাটশিল্প শ্রমিকদের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারসংক্ষেপ *প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবনযাপনের জন্য লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। এ সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে কখনো স্বগোত্রের, বিভিন্ন শ্রেণির বিরুদ্ধে, কখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই, আবার মানুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতিরও লড়াই প্রবাহমান। অবশ্য মানুষ এ লড়াইটা করে চলেছে কখনো একা কখনো জোটবদ্ধভাবে। একটা বিষয় পরিষ্কার—প্রাণী এবং প্রাণীর অংশ মানুষ প্রকৃতির অধীন ফলে প্রকৃতিকে শত্রু ভেবে, তার স্বাভাবিক আচরণ, যা মানুষের জীবনযাপনের প্রতিকূলে গেছে—তার বিরুদ্ধে লড়াই বা প্রকৃতিকে বশ করতে চাওয়ার কৌশল কখনো দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল শুভফল দেয়নি। গণমানুষের অর্থনীতিবিদ জননন্দিত গবেষক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের বহুমাত্রিক সুদীর্ঘ মৌলিক গবেষণা দলিল 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' গ্রন্থে তিনি অনেক সুনিবিড়, সুনির্দিষ্ট বিষয় তুলে এনেছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন-প্রকৃতিতে সাধারণত প্রতি ১০০ বছর পরপর বড় ধরনের বিপর্যয় এসেছে, যা মানবসভ্যতাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। পৃথিবীতে বহুমাত্রিক নতুন মেরুকরণের পথ দেখিয়েছে। সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস, যা কোভিড-১৯ নামে পরিচিত, তা অনুরূপভাবে পৃথিবীর চলমান সভ্যতা-অর্থনীতি-রাজনৈতিক অর্থনীতি, ভূ-রাজনীতি, ভূ-রাজনৈতিক অর্থনীতি, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি—সবকিছুকে নতুন মেরুকরণের তাগিদ দিয়েছে। এই ভাইরাস সব দেশে, সব সমাজে, সব শ্রেণি, সব পেশা, সব ধর্ম, সব বর্ণের মানুষকে ছুঁয়ে গেছে বিভিন্ন মাত্রায়। কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষ, শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বেড়েছে। আবার এটাকে পুঁজি করে শোষণ, বঞ্চনা বেড়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে স্বাস্থ্য-সম্পদ-পুঁজি—এ এক নতুন খেলা।*

এ কোভিড-১৯ এর মধ্যে চরম বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের পাট শিল্প এবং পাট শিল্প শ্রমিকেরা, শ্রমজীবী মানুষ— এই শিল্পের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য খাত-উপখাত। গত ২০২০ সালের ২ জুলাই বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) তার অধীন চালু সব কারখানা (২৫টি) একযোগে বন্ধ ঘোষণা করে। এসব মিল স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয়করণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা। ই-মেইল: jahangir252540@gmail.com

পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের ৩ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের অর্থনীতির গতি যদিও মন্থর, তারপরেও কৃষির ওপর নির্ভর করে এখানে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এ ভূখণ্ডে অনেক পাটকল গড়ে ওঠে। মূলত শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্তানের মাড়োয়ারিরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এগুলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীন নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রায়াত্ত জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মতো কারখানা লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় যদিও আর্ন্তজাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। অবশ্য ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ শিল্প নানামুখী সংকটের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালেই এসব শিল্প বন্ধ হয়ে গেল এবং তা বিকল্প শিল্প বা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াই। পাট শিল্প বন্ধের শর্তমাফিক এখনো সব শ্রমিক-কর্মচারী তাদের প্রাপ্য অর্থ বুঝে পায়নি। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং তার মধ্যে আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থায়ী বন্ধ—এ এক মহাবিপর্যয়। কেনই বা এমন হলো? এর কারণ-অভিঘাত কী? রাষ্ট্রীয় এত বড় সম্পদের ভবিষ্যৎ ব্যবহার কৌশল কী হবে? এই শিল্পে হতে যাচ্ছে কী? হওয়া উচিত কী? এসবের বিশ্লেষণ এবং তার আলোকে কিছু সুপারিশ এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলগুলোর শ্রমজীবী মানুষ, শুধু শ্রমিক নয় তার সাথে সম্পর্কিত কৃষক, কৃষক পরিবার, পরিবহন শ্রমিক, শ্রমজীবী পরিবার, ব্যবসায়ী-ব্যবসায়ী পরিবারসহ অন্যান্য সম্পর্কিতদের কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং অভিঘাত সম্পর্কে নিবিড় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় সরাসরি মাঠপর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণা দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারণী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখবে।

মূল শব্দ *বিজেএমসি · লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ · শ্রমিক অসন্তোষ · শিল্পের বিপর্যয় · পিএফ-গ্রাচুইটি · বঞ্চনা*

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ভালো মানের পাট এখানে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। এ দেশের ৩ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের ওপর নির্ভরশীল। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশেষ করে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে এ ভূখণ্ডে পাট শিল্প গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে পাটশিল্প জাতীয়করণ করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বিজেএমসি গঠিত হয়। তখন বিজেএমসির নিয়ন্ত্রিত ৭৮টি পাটকলই লাভজনক ছিল। সাম্প্রতিককালে এ শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে লোকসানের অজুহাতে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মতো কারখানা বিরাষ্ট্রীকরণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেসব মিল চালু ছিল তা-ও বকেয়া মজুরির কারণে শ্রমিক অসন্তোষসহ বহুবিধ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল। বিজেএমসির ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জুটমিলের শ্রমিকেরা মজুরিসহ বেশকিছু দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। তাদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্রমিকেরা তাদের পিএফ-গ্রাচুইটির টাকাসহ বকেয়া প্রাপ্তির জন্যও লড়াই-সংগ্রাম করছিল। দীর্ঘদিন এ অবস্থা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল, সর্বোপরি যা অর্থনৈতিক নীতি-নৈতিকতার বিচারে চরম অমানবিক। ২০২০ সালের ২ জুলাই বিজেএমসি-

নিয়ন্ত্রিত ২৫টি জুট মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা কোভিড-১৯ বিপর্যস্ত শ্রমিকদের জীবনকে আরো সংকটে ফেলে—সত্যিকার অর্থে এ এক মহা সংকট।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার আগে পাট শিল্প ও শ্রমিকদের বঞ্চনার খাত-ক্ষেত্র বিশ্লেষণ;
- কোভিড-১৯ এ পাট শিল্পের মহাসংকটের বিশ্লেষণ;
- পাট এবং পাট শিল্পের অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ;
- পাট ও পাট শিল্পের সাথে কৃষি অর্থনীতির যোগসূত্র অনুসন্ধান;
- পাটের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
- পাট ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পর্যলোচনা;
- ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও করণীয় অনুসন্ধান ও সুপারিশমালা তৈরি।

তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষাসমূহ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক পত্রিকা ও প্রকাশনা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং সরাসরি পাট শিল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব, ভুক্তভোগী শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবীর সাথে ছোট দলে নিবিড় অনুসন্ধান করে তথ্য অন্যতম।

পাট শিল্পের সংকট: কোভিড-১৯ এ মহাসংকট

বাংলাদেশ বিশ্বের একটা উন্নয়নশীল দেশ। স্বশস্ত্র সংগ্রাম আর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা লাভের বয়স প্রায় পাঁচ দশক। গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের ভাষায়, ৯৯.৯৯ শতাংশ নয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তাঁদের আত্মদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ আর লাল-সবুজের পতাকা। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধা ছিল দুই রকম (১) ঘটনাচক্রে (By chance) (২) দেশমাতৃকার টানে স্বঃপ্রণোদিত হয়ে স্ব-ইচ্ছায় (By choise) মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার এতদিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা, হিসাবপত্তর, সুযোগসুবিধাসহ সামগ্রিক পরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন চাকরির কারণে বা বিভিন্ন বাস্তবতায় এমনকি জীবন বাঁচাতে নিরাপদে বিদেশে অবস্থান করে এবং পরে বিভিন্ন লিংকেজ ব্যবহার করে অর্থাৎ ঘটনাচক্রের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন যারা, তারা সুবিধাটা গ্রহণ করেছেন বেশি। অন্যদিকে যারা ১০০ ভাগ জীবনের ঝুকি নিয়ে মা, মাটি, মানুয়ের টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন; মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন; আশ্রয়-প্রশ্রয়-অন্ন-বস্ত্র-অস্ত্র-বুদ্ধি দিয়েছেন—তাঁরা আজ বহুলাংশে বঞ্চিত, বহিঃস্থ, নিঃস্ব—এমনকি অনেকে অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকেও বঞ্চিত। এ ছাড়া আমার বিশ্লেষণে এই যে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহুমুখী প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তাকারী, তাদের বেশির ভাগই গ্রামীণ জনপদের প্রান্তিক মানুষ। তারা ছিল নির্মোহ-নির্লোভ। তবে স্বার্থ ও প্রত্যাশা ছিল এক জায়গায়, আর তা হলো—মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে তারা আর বহিঃস্থ, বঞ্চিত, নিঃস্ব থাকবে না। ১৯৭২-

এর মূল সংবিধানের চার মূলনীতির মর্মবাণী ছিল মুক্তিযুদ্ধপূর্ববর্তী বঞ্চিত, বহিঃস্থ মানুষদের দুর্দশা ঘুচিয়ে সুষম বণ্টন, সুষম উন্নয়ন ও শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজ-রাষ্ট্র পরিকাঠামো বিনির্মাণ। মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশাও ছিল তা-ই। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার পরিকাঠামো এবং মৌল মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায়ও এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ যারা আজ কৃষক-শ্রমিক, তাদের শ্রম-ঘামে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিপুষ্ট। তাদের প্রশ্নে রাষ্ট্রের বক্তব্য কী? হ্যাঁ, রাষ্ট্র তার সংবিধানের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক-শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের অধিকারকে মেনে নিয়েছে। আমার প্রশ্ন, রাষ্ট্র শুধু স্বীকৃতি দিল, কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা সত্যিকার মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিতের প্রশ্নে সত্যিকার দায়িত্ব পালন করছে কী? না কি বেশির ভাগই শুভঙ্করের ফাঁকি? আমার উত্তর, হ্যাঁ শুভঙ্করেরই ফাঁকি। তাই তো দেখি শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে পাটশিল্প ও তার শ্রমিকেরা অসংখ্য সমস্যায় নিমজ্জিত। এমনকি চাকরি জীবন শেষেও তাদের ন্যায্য পাওনা (অর্জিত) পিএফ-গ্রাচুইটির জন্যেও লড়াই করতে হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতি, সর্বোপরি স্বাধীন দেশের মৌল-মানবিকতা ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিহীন, নীতি-নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ বিশ্বের একটা কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। এ দেশের অর্থনীতি গতি যদিও মন্থর, তারপরও কৃষির ওপর নির্ভর করে এখানে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। হ্যাঁ, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এ ভুখণ্ডে অনেক পাট শিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্তানের মাড়োয়ারি মানুষেরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীন নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রায়াত্ত জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মতো কারখানা লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এই শিল্প নানামুখী সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, যা জাতীয় অর্থনীতি সর্বোপরি রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করছিল। এ রকম এক অবস্থার মধ্যে কোভিড-১৯ কালীন ২০২০ সালের ২ জুলাই থেকে সরকার বিজেএমসির চালু ২৫টি জুট মিল সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করে। এই শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া এ সিদ্ধান্ত নেওয়া কোভিড-১৯ কালীন পাট শিল্প শ্রমিকদের জন্য মহাসংকটের জন্ম দেয়, যার সূদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব এখন পাটশ্রমিক এলাকায় দৃশ্যমান। পাট শিল্পের এ দুরবস্থার কারণ এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জানা, সর্বোপরি বিদ্যমান বাস্তবতা অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ বা সঙ্গতিহীন এবং কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং তার বিশ্লেষণ করই এ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

পাট শিল্প রক্ষা ও পাট শিল্প শ্রমিকদের অধিকারের লড়াই

কোভিড-১৯ কালে পাট শিল্প বন্ধ ও কিছু ভাবনা-পুনর্ভাবনা

পাটশিল্প বেঁচে থাকলে , পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পাট চাষাধীন জমির গুরুত্ব বাড়বে এবং কৃষকের আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। পাট চাষ প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ শিল্প বন্ধ হলে বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান। যার খাত/ক্ষেত্র এবং অভিঘাত বিষয়ে কিছু ভাবনা ও পুনর্ভাবনা:

পাট শিল্পের বর্তমানে	পাট শিল্পের অবর্তমানে	মন্তব্য
স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ	২০২০ সালের ২ জুলাই বন্ধ ঘোষণা	৪৮ বছরের ব্যবধানে প্রবণতা কোন পথে?
১৯৭২ সালের ২৬ বিজেএমসি গঠন	২০২০ সালের ২ জুলাই লোকসানের অজুহাতে বিজেএমসির পাট শিল্প বন্ধ	বি. জে. এম. সি কার্যক্রম আর দক্ষতার প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক কি?
স্বাধীনতারপরবর্তী দেড় দশকে পাট জাতীয় অর্থনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল	স্বাধীনতার দেড় দশকের পর থেকে লোকসানের দিকে যাত্রা	দুর্নীতি-লুটপাট বাড়েনি কি বাড়েনি?
২০০২ বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ ঘোষণা	২০২০ সালের আগে অর্ধশত রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বিরাষ্ট্রীকরণ ও বন্ধের প্রক্রিয়া	উন্নয়ন না অনুন্নয়ন?
ইতিপূর্বে বন্ধকৃত কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি	এ শিল্পকে বন্ধের পর আধুনিক করে আবার চালুর কথা	এর নিশ্চয়তা কি?
ইতিপূর্বে বিরাষ্ট্রীকরণকৃত শিল্প ও বন্ধ শিল্প লিজ-ক্রয় করেছেন যারা, তারা সম্পদ বিক্রয় বা ব্যাংকঋণ গ্রহণ করেছেন অধিক হারে।	এ শিল্পে সেই ধারা অব্যাহত থাকবে না, তার নিশ্চয়তা কী?	ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়ায় ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ কি ঘটেনি?

পাট উৎপাদনকালে হেক্টরপ্রতি ৫-৬ টন পাটপাতা মাটিতে পড়ত। এতে প্রচুর নাইট্রোজেন ক্যারোটিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকায় প্রতিবছর গড়ে ৯৫৬.৩৮ হাজার টন পাটপাতা ও ৪২৩. ৪০ হাজার টন পাটগাছের শেকড় মাটিতে মিশে জৈবসার তৈরি হতো	এখন ওইসব জমিতে জৈবসার ঘাটতিজনিত সমস্যা প্রকট হয়েছে	লাভ/ক্ষতির হিসাব কত?
বিশ্বে বছরে প্রায় ৪৭.৬৮ মিলিয়ন টন কাঁচা সবুজ পাটগাছ উৎপাদিত হয়, যার প্রায় ৫.৭২ মিলিয়ন টন কাঁচা পাতা। পাটের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণক্ষমতা ০.২৩-০.৪৪ মিলিগ্রাম	পাট গাছের অনুপস্থিতিতে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি ও অক্সিজেন হ্রাস	পরিবেশের ক্ষতির হিসাব কত?
সিনথেটিক থেকে প্লাস্টিক তৈরি হয় । ১ টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগা জুল তাপ ও ১৩৪০ টন কার্বন-ডাই অক্সাইড মিশে যায়	তন্তু থেকে চটের ব্যাগ তৈরি হয়। ১ টন পাট থেকে তৈরি থলে-বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগা জুল তাপ ও ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে	তুলনামূলক ক্ষতির মাত্রা কেমন?
এতদিনে পাটখাত লোকসান করেছে ১০ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা।	এই সময়ে সরকার খেলাপি ঋণ মওকুফ করেছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা	অথচ পাট শিল্প বন্ধ করা হলো!

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি

খুলনা বিভাগ কেন্দ্রীক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। পদ্মা, মধুমতি, বলেশ্বর, সোনাই, ইছামতি, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী এলাকার ১০ জেলা আর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ চিরসবুজ অনুপম ঐশ্বর্য্য ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অধিকাংশটা নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সৃষ্টি। এর দক্ষিণাংশ নিচু ভূমি এবং লবণাক্ততাযুক্ত বাকি অধিকাংশ সমভূমি। কৃষিশষ্য উৎপাদনের মধ্যে আউশ-আমন ইরি-বোরো উৎপাদন হয়। এ ছাড়া রবিশস্যসহ প্রায় সব শস্য উৎপাদনের উর্বরক্ষেত্র এটি। পাট চাষের উর্বর ক্ষেত্র বিধায় এই অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি অনেক পাটকল গঠে উঠেছে। খুলনা বিভাগের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিতি সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা। এই অঞ্চল নদীর দ্বীপ বা গ্রেটার বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশবিশেষ। অন্যান্য নদীর মধ্যে রয়েছে মধুমতি নদী এবং ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদ। এ ছাড়া এখানে বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপও রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান 21°40 উত্তর অক্ষাংশ হতে 24°12© উত্তর অংশে এবং 88°34 পূর্ব দ্রাঘিমা হতে 89°57 পূর্ব দ্রাঘিমায়।

মানচিত্র

পাট চাষের ইতিকথা

পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশের মধ্যে মাত্র ডজন খানেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাটের আবাদ হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, মিয়ানমার, থ াইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ব্রাজিল। তবে একটা সময় ছিল, যখন বাংলাদেশ বাণিজ্যিক দিক থেকে এক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসাবে বিবেচিত হত। বিশ্ব বাজারের ৮০ শতাংশ পাট আমাদের দেশ থেকে সরবরাহ করা হতো। বিগত শতাব্দীর ৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ্ব পর্যন্ত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের শীর্ষ অবস্থান বজায় ছিল। ১৯৭৮ সাল নাগাত ভারত পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রথম স্থান দখল করে। আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়তে। বাণিজ্যিক ভাবে আমাদের এ অঞ্চলের পাট চাষের সূচনা করে বৃটিশরা। ১৮৭৩ সালে এইচ. সি কারকে চেয়ারম্যান করে পাট বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী। এই কমিশন পাট চাষের সূচনা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়। কমিশন বাংলায় পাটচাষ এবং ব্যবসার উপর প্রতিবেদন শিরোনামে ১৮৭৭ সালে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের ৪ এর দশক ও তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের রংপুরে পাটের আবাদ শুরু হয়। ক্রমশ তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট চাষের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ ভূখণ্ডের কৃষক। কৃষি অর্থনীতিতে জায়গা দখল করতে থাকে সোনালী আঁশ, যার ওপর ভরসা করে পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে পাট শিল্প।

পাট ও পাট শিল্প

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। এ দেশের ২০ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়, যা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫ শতাংশ। পাটের ওপর দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। তার সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের আগপর্যন্ত এ ভূখণ্ডে কোনো পাট শিল্প গড়ে ওঠেনি। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী জুটমিল। ধারাবাহিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে পাটকল গড়ে ওঠে। নিকট অতীতে চালু পাটকলগুলোতে প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য তেরি হতো, যা বিদেশে রপ্তানি করে প্রায় ৩০০

মিলিয়ন ডলার আয় হতো। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও দাম বেড়েছে। স্বাধীনতাত্তোর রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ছিল ৭৮টি। ২০০৪ সাল নাগাদ লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয় প্রায় ৬০টি। গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা খুলনা-যশোর অঞ্চলের বিজেএমসির নিয়ন্ত্রিত ৯টি পাটকলের অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। শ্রমিকদের জীবনজীবিকাও ছিল দুর্বিষহ।

পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র এই ভূখণ্ড

বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। এ দেশের মাটি, পানি, জলবায়ু, পরিবেশ পাট চাষের উপযোগী। তুলনামূলক সুবিধা ও বিদ্যমান বাস্তবতায় এ দেশের কৃষি এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রচেষ্টায় এ এলাকায় পাটের উৎপাদন যেমন বেশি, তেমনি কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য, যা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল।

বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশসমূহের পাট চাষাধীন মোট জমি, মোট উৎপাদন ও একর প্রতি উৎপাদনের চিত্র, ২০০০-২০০৪ সময়ে

দেশসমূহ	২০০০-২০০১					২০০১-২০০২				
	জমি মে. একর	উৎপাদন মে. টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান	জমি মে. একর	উৎপাদন মে. টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। বাংলাদেশ	১.১১	০.৮১	০.৭৪	৩১.০	II	১.২৮	০.৯২	০.৭২	৩০.০	II
২। ভারত	২.১৬	১.৬২	০.৭৫	৬১.০	I	২.৪২	১.৮৯	০.৭৮	৬২.০	I
৩। চীন	০.১২	০.১৩	১.০২	০৫.০	III	০.১২	০.১১	০.৮৬	০৪.০	III
৪। মিয়ানমার	০.০৭	০.০৩	০.৩৬	০১.০	IV	০.১৩	০.০৫	০.৩৮	০২.০	V
৫। নেপাল	০.০৪	০.০২	০.৪২	০১.০	V	০.০৩	০.০২	০.৫৯	০০.০	VI
৬। থাইল্যান্ড	০.০৫	০.০৩	০.৬২	০১.০	IV	০.০৯	০.০৬	০.৬২	০২.০	IV
সর্বমোট	৩.৫৫	২.৬৪	০.৭৪	১০০.০		৪.০৭	৩.০৫	০.৭৫	১০০.০	

দেশসমূহ	২০০২-২০০৩					২০০৩-২০০৪				
	জমি মে. একর	উৎপাদন মিঃ টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান	জমি মে. একর	উৎপাদন মে. টন	একর প্রতি উৎপাদন, টন	অংশ, %	স্থান
১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১। বাংলাদেশ	১.০৫	০.৭৮	০.৭৪	২৫.০	II	১.০৫	০.৭২	০.৬৮	২৪.০	II
২। ভারত	২.৫৩	২.০৬	০.৮১	৬৬.০	I	২.৩৭	১.৯৮	০.৮৩	৬৭.০	I
৩। চীন	০.১৪	০.১৬	১.১২	০৫.০	III	০.১৪	০.১৭	১.১৫	০৬.০	III
৪। মিয়ানমার	০.১৫	০.০৪	০.২৯	০১.০	V	০.১৫	০.০৪	০.২৯	০১.০	IV
৫। নেপাল	০.০৩	০.০২	০.৫৯	০১.০	V	০.০৩	০.০২	০.৫৯	০১.০	V
৬। থাইল্যান্ড	০.০৮	০.০৬	০.৬৭	০২.০	IV	০.০৬	০.০৪	০.৫৯	০১.০	IV
সর্বমোট	৩.৯৮	৩.১২	০.৭৮	১০০.০		৩.৮০	২.৯৭	০.৭৮	১০০.০	

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন এবং এলাকার পরিমাণ

সময়	উৎপাদন (০০০ টন)	এলাকা (০০০একর)
১৯৯৩-৯৪	৮০৮	১১৮২
১৯৯৪-৯৫	৯৬৪	১৩৮৩
১৯৯৫-৯৬	৭৩৯	১১৩৩
১৯৯৬-৯৭	৮৮৩	১২৫৩
১৯৯৭-৯৮	১০৫৭	১৪২৭
১৯৯৮-৯৯	৮১২	১১৮১
১৯৯৯-২০০০	৭১১	১০০৮
২০০০-০১	৮২১	১১০৭
২০০১-০২	৮৫৯	১১২৮
২০০২-০৩	৮০০	১০৭৯
২০০৩-০৪	৭৯৪	১০০৮
২০০৪-০৫	১০৩৫	৯৬৫
২০০৫-০৬	৮৩৮	৯৩৯
২০০৬-০৭	৮৭৯	১০৩৪
২০০৭-০৮	৮৩২	১০৮৯

বিশ্বে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, ১৯৯৮-২০০৩

বছর সমূহ	কাঁচা পাট								পাটজাত পণ্য							
	বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব		বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব	
	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %	স্থান	মে. টন	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯৯৮-১৯৯৯	০.৩২	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩৪	১০০.০	০.৪০	৫৩.০	I	০.২৪	৩২.০	II	০.৭৫	১০০.০
১৯৯৯-২০০০	০.৩০	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩২	১০০.০	০.৪৩	৬২.০	I	০.১৬	২৩.০	II	০.৬৯	১০০.০
২০০০-২০০১	০.২৮	৯০.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩১	১০০.০	০.৩৮	৫৯.০	I	০.১৮	২৮.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০১-২০০২	০.২৫	৮৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩০	১০০.০	০.৪১	৬৪.০	I	০.১৫	২৩.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০২-২০০৩	০.৪১	৯৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৪৪	১০০.০	০.৪০	৫৯.০	I	০.১৯	২৮.০	II	০.৬৮	১০০.০

পাট রপ্তানির তুলনামূলক চিত্র

সময়	মোট রপ্তানি (কোটি টাকা)	পাট রপ্তানি (কোটি টাকা) (কাঁচা পাট এবং পাটপণ্য)	মোট রপ্তানিতে পাটের অংশ (%)
১৯৯৩-৯৪	৯৭৯৯	১২১২	১২.৩৭
১৯৯৪-৯৫	১৩১৩০	১৬২১	১২.৩৫
১৯৯৫-৯৬	১৩৮৫৭	১৫৩৪	১১.০৭
১৯৯৬-৯৭	১৬৫৬৪	১৮৬৮	১১.২৮
১৯৯৭-৯৮	২০৩৯৩	১৮১২	৮.৮৯
১৯৯৮-৯৯	২০৮৫১	১৪৩৮	৬.৯০
১৯৯৯-২০০০	২৪৯২৩	১৫০১	৬.০২
২০০০-০১	৩২৪১৯	১৬৭৬	৫.১৭
২০০১-০২	৩০৯৩৪	১৭৭৭	৫.৭৪
২০০২-০৩	৩৩২৪২	১৬৭৩	৫.০৩
২০০৩-০৪	৪০৫৮১	১৭২৫	৪.২৫
২০০৪-০৫	৫০৮৩৫	২২৪১	৪.৪১
২০০৫-০৬	৬২৬০১	৩০১৯	৪.৮২
২০০৬-০৭	৭৮৯৩১	৩৫৭৯	৪.৫৩
২০০৭-০৮	৮৬২৮৩	৩৬৩০	৪.২১

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিজেএমসি-নিয়ন্ত্রিত জুট মিল: নিকট অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি

মজুরির সাথে শ্রমিকের জীবনজীবিকার সম্পর্ক নিবিড়। একজন শ্রমিক তার কায়িক এবং মানষিক শ্রমের যদি যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হবে তার জীবন জীবিকাও দুর্বিষহ হতে বাধ্য। আমরা লক্ষ্য করি, বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ একটি মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। বিশেষ করে পাট শিল্পের শ্রমিকেরা মজুরি ও বিভিন্ন দাবিতে উৎপাদন বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছিল। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত জুটমিলের নিকট অতীতের অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়। চরম দুঃখ এবং নির্মম সত্য বিভিন্ন সংকটের মধ্যে চলমান মিলগুলোর ক্ষেত্রে সকল জল্পনাকল্পনা শেষ করে, শ্রমিক-কর্মচারী ও দেশের বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশাকে ম্লান করে গত ২০২০ সালের ২ জুলাই থেকে দেশের ২৫টি চালু জুটমিল বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। শ্রমিক কর্মচারীদের শর্তমাফিক পাওনাও এখনো সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়নি বিভিন্ন কৌশলের বেড়াজালে, যা কারো কাম্য নয়। এখনো এ শিল্প নতুন করে চালুর দাবিতে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

বিজেএমসি-নিয়ন্ত্রিত খুলনা-যশোর অঞ্চলের পাটকলসমূহের
প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন শুরু, জাতীয়করণ এবং তাঁত সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (সাল)	উৎপাদন শুরু (সাল)	তাঁত সংখ্যা			মোট
			হেসিয়ান	সেকিং	সি.বি.সি	
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	১৯৫২	১৯৫৪	৬৯৪	৩৩৯	১০৩	১১১৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	১৯৫৫	১৯৫৮	৬০২	২৭৩	৮২	৯৫৭
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	১৯৫২	১৯৫৪	৫১৬	৩২৪	৮৩	৯২৩
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	১৯৬৪	১৯৬৭	১৫৫	১০১	৩৫	২৯১
আলীম জুট মিলস লি.	১৯৬৪	১৯৬৮	১৬২	৮৮	-	২৫০
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	১৯৬৩	১৯৬৫	-	-	৮৬	৮৬
জে. জে.আই	১৯৬৬	১৯৭০	৩০০	১০০	৫৬	৪৫৬
স্টার জুট মিলস লি.	১৯৫৬	১৯৫৮	৫৬০	২০০	-	৭৬০
দৌলতপুর জুট মিলস লি.	১৯৫৪	১৯৫৫	১৭০	৮০	-	২৫০

** ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৭ বলে সংশ্লিষ্ট পাটকলসমূহ জাতীয়করণ করা হয়।*

উপকরণ (পাট) মজুদ/ক্রয়ের বাস্তব অবস্থা

প্রতিষ্ঠানের নাম	০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	দৈনিক পাটের চাহিদা	দৈনিক আমদানি (২০/০৪/২০১৫) (কুইন্টাল)	০১/০৭/২০১৪ থেকে ২০/০৪/২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ক্রয়	অর্জিত হার (ক্রয়ের হার)	২০/০৪/২০১৫ পর্যন্ত মজুত					
						মিল ঘাট		ক্রয় কেন্দ্র		সর্বমোট	
						পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুই ন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুই ন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)
ক্রিসেন্ট জুট মিলস	২৭,৯,৪৫৮ কুই.	৯৩৬ কুই.	৮০	৭১,৫৪৩	২৬%	৪,২৩৫	৫	১,২৭৬	১	৫,৫১১	৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	২১,৭,৪৬৮ কুই.	৭৫১ কুই.	-	৫২,০০৫	২৪%	৩,৭৮৫	৫	১,৬৭৯	২	৫,৪৬৪	৭
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	১৯,৮,৫২৯ কুই.	৬৯২ কুই.	-	৮৬,৩৭৭	৪৩%	১৬,৬৪৫	২৪	৩,০৩৭	৪	১৯,৭১৮	২৮
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	৭১,৩২৭ কুই.	২৫২ কুই.	১৬০	২৪,২৭৫	৩৪%	১,৮১১	৭	৭২১	৩	২,৫৩২	১০
আলীম জুট মিলস লি.	৫৭,২৯৫ কুই.	১৯৮ কুই.	-	১১,৮৩৮	২০%	-	-	-	-	-	-
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	৩১,৩৭২ কুই.	১১২ কুই.	-	২২,২৯০	৭১%	১,৪৭৯	৫	৭৩	১	১,৫৫২	৬
স্টার জুট মিলস লি.	১,৩৮,০২৬ কুই.	৪৭৭ কুই.	-	৩২,০১৯	২৩%	৪,৭৪০	১০	২,৫২৮	৫	৭,২৬৮	১৫
দৌলতপুর জুট মিলস	৬১,১৮৯ কুই.	২০৯ কুই.	-	১৭,৭৫০	২৯%	৬৪৬	৩	৫৬১	৩	১,২০৭	৬

ঢাকা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিজেএমসির জুট মিলের পাট মজুত/ক্রয় পরিস্থিতির খতিয়ান
(এপ্রিল ২০১৪ সময়ে হিসাব)

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানের নাম	পাট মজুদের পরিমাণ (দিন)
চট্টগ্রাম	আমীন জুট মিলস্ লি.	৫ দিন
চট্টগ্রাম	হাফিজ জুট মিলস্ লি.	৩১ দিন
চট্টগ্রাম	এম. এম জুট মিলস্ লি.	১৭ দিন
চট্টগ্রাম	বি. ডি. সি. এফ লি.	৩২ দিন
চট্টগ্রাম	গুল আহ্মেদ জুট মিলস্ লি.	১৫ দিন
চট্টগ্রাম	আর আর জুট মিলস্ লি.	৪১দন
ঢাকা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লি.	২৮ দিন
ঢাকা	জাতীয় জুট জুট মিলস্ লি.	২২ দিন
ঢাকা	করিম জুট মিলস্ লি.	২২ দিন
ঢাকা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লি.	৬৪ দিন
ঢাকা	রাজশাহী জুট মিলস্ লি.	৫০ দিন
ঢাকা	ইউ. এম. সি জুট মিলস্ লি.	৪২ দিন

** খুলনা ও চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকা অঞ্চলের ২-১টি মিলের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির আয় থেকে কখনো কখনো পাট ক্রয় করা হয়।*

মজুরি ও জীবন-জীবিকা

একজন শ্রমিকের মজুরি প্রচলিত বাজারব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয়হীন হলে জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হয়। মজুরির সাথে উৎপাদনশীলতা ও জীবন-জীবিকার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মজুরি কম হলে জীবনজীবিকার সংকট বাড়ে। অর্থাৎ মজুরির সাথে জীবন-জীবিকার সংকটের সম্পর্ক নেতিবাচক। কতগুলো সূচকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়—

মজুরির অবস্থা	ক্যালরি হিসাবে খাদ্যগ্রহণ	শিক্ষার প্রবণতা	ক্রয় ক্ষমতা	চিকিৎসা সেবা	পোশাক পরিচ্ছদ	জীবন-জীবিকার ঝুকি	সঞ্চয় প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	অপরাধ প্রবণতা
মজুরি কম/ বকেয়া	নিম্নমুখী	নিম্নমুখী	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে	নিম্নমুখী	নিম্নমুখী	বাড়বে
সঠিক মজুরি/ নিয়মিত মজুরি	স্বাভাবিক	উর্ধ্বমূখী	বাড়বে	স্বাভাবিক	স্বাভাবিক	কমবে	উর্ধ্বমূখী	উর্ধ্বমূখী	কমবে

মজুরি-উৎপাদনশীলতা-রপ্তানি-জীবন-জীবিকা একটি চক্রাকার প্রবাহ

মিলের শ্রমিকদের মজুরি কম বা না পাওয়া (বকেয়া) থাকার কারণে উৎপাদনশীলতা নিম্নমুখী। উৎপাদন কমার ফলে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কম হবে। রপ্তানি কমের কারণে রপ্তানি আয় কমবে, মিলের স্বাভাবিক

গতি ব্যহত হবে। শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হবে। শ্রমিকেরা উৎপাদনে আগ্রহ হারাবে এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এটি একটি চক্রাকার প্রবাহের মতো আবর্তিত হবে।

বকেয়া মজুরি — শ্রমিক অসন্তোষ — নিম্ন উৎপাদন — কম রপ্তানি — কম আয় — জীবন-জীবিকার সংকট — উৎপাদনে অনাগ্রহ — উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি — বকেয়া মজুরি।

শ্রমজীবী মানুষের মজুরি ভোগান্তি সদাচলমান

(বকেয়া মজুরি/বেতনের হিসাব আগস্ট ২০০৬-ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকদের অপরিশোধিত সাপ্তাহিক মজুরি		কর্মচারীদের অপরিশোধিত বেতন		গত ০৬/০৭ সালের পাওনা
	সময়	টাকা	সময়	টাকা	ঈদুল আযহার উৎসব বোনাস
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	১১ সপ্তাহ	৫ কোটি ৭৯ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	১৪ সপ্তাহ	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ	৫ মাস	১ কোটি ৭৯ লক্ষ	২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
পিপল্স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	১৬ সপ্তাহ	৬ কোটি ৬ লক্ষ	৬ মাস	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	১৯ সপ্তাহ	২ কোটি ২০ লক্ষ	৫ মাস	৭৫ লক্ষ	৫৬ লক্ষ টাকা
আলীম জুট মিলস লি.	২৭ সপ্তাহ	২ কোটি ৫১ লক্ষ	৮ মাস	৮৬ লক্ষ	৫৩ লক্ষ টাকা
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	১৪ সপ্তাহ	১ কোটি ৪ লক্ষ	৪ মাস	৫২ লক্ষ	৩০ লক্ষ টাকা
জে.জে.আই	১৫ সপ্তাহ	২ কোটি ২৫ লক্ষ	৩ মাস	৬৭ লক্ষ	৯১ লক্ষ টাকা
স্টার জুট মিলস লি.	১৪ সপ্তাহ	৫ কোটি ২১ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ১২ লক্ষ	১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা

- ৬-৭ থেকে কোথাও ৮ মাস বকেয়া।
- এ সময়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবারে চলছিল নীরব দুর্ভিক্ষ।
- প্রতিবাদে খোরা-থালা ও ঝাড়ু মিছিল হয়েছিল।
- বুভুক্ষু শ্রমিকেরা মহাসড়কে ঈদের নামাজ পড়েছিল।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বঞ্চনার শেষ কোথায়? কেউ জানে না

পাট শিল্পের সাথে শ্রমজীবী মানুষ অস্থায়ী, স্থায়ী মিলিয়ে যৌবনজীবনের প্রায় সবটুকু শ্রম-ঘাম নিঃশেষ করেছেন, নিজের অর্জিত পিএফ ও গ্র্যাচুইটি বাবদ পাওনা কখন পাবেন, কীভাবে পাবেন, কার মাধ্যমে পাবেন, মৃত্যুর পর (?) এ অর্থের মালিক কে হবেন, ভোগই বা করবেন কে? তার হিসাব এখন আর

মেলানো যাবে না। সবই অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা আর বাকির খাতার হিসাব। ২০২০ সালের জুলাইয়ে বন্ধ হওয়া কালে বলা হলো দ্রুত সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু ২০২২ সাল। এখনো শ্রমজীবী মানুষ কোভিড-১৯ এর মধ্যে পাওনাহীন অনিশ্চিত জীবনের পথে, নেই কর্ম, আবাসন আর খাদ্যের নিশ্চয়তা।

বিগত বছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের অবসরে যাওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের পিএফ ও গ্র্যাচুইটির বিবরণী

ক) গ্রাচুইটি

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৭০	৩০১.৩৩	২৬.৯৫	২৭৪.৩৮	৫৮	২৬৪.৪৩	৪.০৮	২৬০.৩৫
কর্মচারী	৯	৭৭.৭৭	০.১৬	৭৭.৬১	১৫	৮৯.১৩	২.১৭	৮৬.৯৬
কর্মকর্তা	২	৩০.৫২	২.১২	২৮.৪০	০	০	০	০.০০
মোট	৮১	৪০৯.৬২	২৯.২৩	৩৮০.৩৯	৭৩	৩৫৩.৫৬	৬.২৫	৩৪৭.৩১

বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৬৩	৩১০.৭১	০	৩১০.৭১	৭৭	৩৪৩.৮৯	০.০৭	৩৪৩.৮২
কর্মচারী	৫	৩৪.০৪	২.১২	৩১.৯২	১৬	১৪৭.০৯	০	১৪৭.০৯
কর্মকর্তা	০	০	০	০.০০	৩	৯১.৩৫	০	৯১.৩৫
মোট	৬৮	৩৪৪.৭৫	২.১২	৩৪২.৬৩	৯৬	৫৮২.৩৩	০.০৭	৫৮২.২৬

খ) পিএফ

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৪২	১৩৬.০১	৮১.৫৫	৫৪.৪৬	৪০	১২৫.৬৮	৫৪.২৯	৭১.৩৯
কর্মচারী	৮	৫৬.৬৭	২১.৫০	৩৫.১৭	১৩	৫০.৪৭	১৪.৭৯	৩৫.৬৮
কর্মকর্তা	০	-	-	-	০	-	-	-
মোট	৫০	১৯২.৬৮	১০৩.০৫	৮৯.৬৩	৫৩	১৭৬.১৫	৬৯.০৮	১০৭.০৭

বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৫৩	১৪৪.১৩	২২.৫১	১২১.৬২	৭৩	২৩০.১৪	৬.৫৫	২২৩.৫৯
কর্মচারী	৬	২২.৫৫	৭.১০	১৫.৪৫	১১	৬৩.০৬	১.৫৫	৬১.৫১
কর্মকর্তা	২	১২.২৯	৪.৩০	৭.৯৯	৬	৪৭.৬২	১৮.৯০	২৮.৭২
মোট	৬১	১৭৮.৯৭	৩৩.৯১	১৪৫.০৬	৯০	৩৪০.৮২	২৭	৩১৩.৮২

উল্লিখিত মিলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত ও বকেয়া গ্র্যাচুইটির বিবরণ

(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/ পরিশোধ	অবশিষ্ট/ বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৬৮	৪৫	৫	৩১৮	১৬৯০.২৬	৩৭.৬৭	১৬৫২.৫৯
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লি.	১৪৬	৩৩	-	১৭৯	৯২১.১৮	৭৬.৫৩	৮৪৪.৬৫
ষ্টার জুট মিলস্ লি.	৩১১	৫৪	১৭	৩৮২	১৯৬১.৬৩	৫৭০.২০	১৩৯১.৪৩
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪০৬	৬৩	১৭	৪৮৬	২৭৯৬.৩১	২৫৫৪.২৫	২৪২.০৬

উল্লিখিত মিলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত ও বকেয়া গ্র্যাচুইটির বিবরণ

(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/ পরিশোধ	অবশিষ্ট/ বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ	২০৮	৩৮	৮	২৫৪	৮৮৮.৬২	২৩৩.০৪	৬৫৫.৫৮
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লি.	-	-	-	১৭৮	৯৬১.০০	৪১৬.৯১	৫৪৪.০৯
ষ্টার জুট মিলস্ লি.	২২৪	২৭	১৭	২৬৮	৭৫৫.৯২	২৫৮.৮৩	৪৯৭.০৯
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪৩৭	৬২	২৪	৫২৩	১৩১০.৮৯	৭৫৩.৯১	৫৫৬.৯৮

উৎপাদনের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধান অনেক

(২০ এপ্রিল ২০১৫ এর পরিসংখ্যান)

প্রতিষ্ঠানের নাম	তাঁত হেসিয়ান, সেফিং, সি.বি.সি		চালু থাকার হার (%)	স্থায়ী শ্রমিক (কর্মরত) জন	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন	উৎপাদনের হার
	চালু থাকার কথা	চালু ছিল					
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	১০৬১	৫১৪	৪৮.৪৪%	৩৪৯৬	৮৯.১১ মেঃ টঃ	২৫.০৮ মেঃ টঃ	২৮.১৪%
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	৭৮৯	৫৪৬	৬৯.২০%	৩৩৪২	৭১.৫৫ মেঃ টঃ	১২.১০ মেঃ টঃ	১৬.৯১%
পিপল্‌স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	৬২০	৪৬৭	৭৫.৭২%	২৭৩৭	৬৫.৯১ মেঃ টঃ	৩১.১২ মেঃ টঃ	৪৭.২১%

ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	২৩৩	১৪৭	৬৯.০৯%	১০৫৭	২৪.০১ মেঃ টঃ	১২.৩৪ মেঃ টঃ	৫১.৩৯%
আলীম জুট মিলস লি.	২০৬	৬০	২৯.১২%	৫৫৩	১৮.৮২ মেঃ টঃ	০৬.০৪ মেঃ টঃ	৩২.০৯%
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	৬০ (শুধু সি.বি. সি)	৫২ (শুধু সি.বি. সি)	৮৬.৬৬%	৫৯২	৯.৩৫ মেঃ টঃ	০৫.০১ মেঃ টঃ	৫৩.৫৮%
জে.জে.আই	৩৮২	১৯৪	৫০.৭৮%	১২৯৮	৩১.৯৩ মেঃ টঃ	০৭.৭১ মেঃ টঃ	২৪.১৪%
স্টার জুট মিলস লি.	৫৫৫	৩৯৫	৭১.১৭%	২১৭৬	৪৫.৪৬ মেঃ টঃ	১২.০৭ মেঃ টঃ	২৬.৫৫%
দৌলতপুর জুট মিলস	১৮৫	৬১	৩২.৯৮%	৫১১	১৯.৯২ মেঃ টঃ	০৬.৩৪ মেঃ টঃ	৩১.৮২%

** উৎপাদনের হার গড়ে ৩৪.৫৫ শতাংশ*

স্থায়ী-অস্থায়ী এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের কর্মে নিযুক্তির খতিয়ান (২০-০৪-২০১৫ইং)

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মরত শ্রমিক		মোট	হার %	মন্তব্য
	স্থায়ী	অস্থায়ী/ দৈনিক	(জন)		
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি.	৩১২৯	৩৬৭	৩৪৯৬	৭৫%	
প্লাটিনাম জুট মিলস লি.	২৯১৫	৪২৭	৩৩৪২	৮৪%	
পিপল্স জুট মিলস লি. (খালিশপুর জুট মিল)	-	২৭৩৭	২৭৩৭	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লি.	৯৫৯	৭০	১০২৯	৮৪%	
আলীম জুট মিলস লি.	৫৫০	৩৪	৫৮৪	৬৫%	
কার্পেটিং জুট মিলস লি.	৩৪৩	২৪৯	৫৯২	৯৬.৮৯%	
জে.জে.আই	১০০৮	২৯০	১২৯৮	৭১%	
স্টার জুট মিলস লি.	১৭৮৯	৩৮৭	২১৭৬	৭৪%	
দৌলতপুর জুট মিলস লি.	-	৫১১	৫১১	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।

** এখানে শতকরা হিসাব হলো স্থায়ী , অস্থায়ী , দৈনিকভিত্তিক যে শ্রমশক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকার কথা ছিল বাস্তবে তার কত ভাগ নিযুক্ত ছিল সেই হার। (কাঁচামাল , যন্ত্রাংশ নষ্ট ইত্যাদির কারণে কর্মে নিযুক্ত হতে পারেনি)*

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রয়াত্ত জুটমিলের সংকটের আর্থসামাজিক প্রভাব
(পাট শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতি বিশেষ করে পাটচাষিদের ওপর প্রভাব)

মূলত পাট শিল্পের কাচাঁমাল হলো পাট। এ পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হতো। এখন বলা হয় সোনালী আঁশ কৃষকের গলার ফাঁস। কারণ পাট শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষসহ অন্যান্য কারণে পাট শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে পাটের চাহিদা কমছে। পাটের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে। পাটচাষিরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নিম্নে পাট চাষাধীন জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখান হলো—

অর্থকরী ফসল	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
পাট	১১ লক্ষ ২৮ হাজার একর	৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মে.টন
চা	১ লক্ষ ২০ হাজার একর	৫৭ হাজার মে.টন
আখ	৪ লক্ষ ২ হাজার একর	৬৫ লক্ষ ২ হাজার মে.টন
তুলা	৫ হাজার একর	৫ হাজার মে.টন
তামাক	৭৫ হাজার একর	৩৮ হাজার মে.টন

পাট শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি এবং স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব

প্রকৃতপক্ষে খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাটকলের ওপর নির্ভর করে এ অঞ্চলে কতকগুলো বাজার গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ৯টি পাটকলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা যুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন ও সেবাখাত সর্বোপরি কৃষিপণ্য ও তার বাজার সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকেরা মজুরি না পেলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে এবং অন্যান্য খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য শিল্পনগরী খুলনার প্রাণ খালীশপুর এখন হাহাকারযুক্ত এক নীরব-নিথর অন্ধকার নগরী।

কেস স্টাডি

শ্রমিকের নাম: কওসার বিশ্বাস (৪০)
পিতার নাম: ইব্রাহিম বিশ্বাস
নারায়ণপুর, চৌগাছা, যশোর।

আলীম জুটমিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক কওসার বিশ্বাস। ১৯৯৪ সালে এখানে বদলি শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করে এবং তিন বছর পর স্থায়ী হয়। এখন সে চাকরিহারা। এক ছেলে ও দুই মেয়ে স্কুলে পড়ে। নিজের বাড়ি না থাকায় ভাড়া থাকেন। বর্তমানে পেশা পরিবর্তন করে দিন মজুর হিসাবে ১৭০-২০০ টাকা আয় করে। দিনমজুরের কাজও প্রতিদিন জোটে না। মিলের বকেয়া পাওনাও পায়নি। এ অবস্থায় অর্ধাহারে-অনাহারে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছেন। মিল বন্ধের পর দেখা যায় খাদ্য গ্রহন, কাজের নিশ্চয়তা, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। জীবন জীবিকার ঝুঁকি, গ্রামীন ও শহরে শ্রম বাজারে চাপ অপরাধ প্রবনতা বেড়েছে।

শ্রমিকদের চাকুরিরত ও চাকরিচ্যুত অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

	খাদ্যগ্রহণ (ক্যালরি)	কাজের নিশ্চয়তা	শিক্ষা	ক্রয়ক্ষমতা	স্বাস্থ্য	সামাজিক মর্যাদা	সামাজিক সম্পর্ক	জীবিকার ঝুঁকি	গ্রামীণ শ্রমবাজারে চাপ	শহরের শ্রমবাজারে চাপ	অপরাধ প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	সঞ্চয় প্রবণতা
চাকরিরত অবস্থা	১৭০০	৮০%	৯৫%	৮০%	৮০%	৮০%	৯০%	২০%	৬০%	৬২%	৫৫%	৭৫%	১০%
চাকরিচ্যুত অবস্থা	১৪০০	৫০%	৫০%	৬০%	৪০%	৩০%	৩০%	৮০%	৮০%	৭৮%	৮০%	৫০%	০০%

পাটখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমহ্রাসমান

স্বাধীনতার পরে ৭৮টি জুটমিল পরিচালনার জন্য বিজেএমসি দায়ভার গ্রহণ করে। ১৯৭৭-১৯৮৬ সময়কালে ৪৪টি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং একটি একীভূত হয়। ফলে বিজেএমসির অধীন পাটকল সংখ্যা দাঁড়াল ৩৮টিতে। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যংকের পাটখাতে সংস্কার কর্মসূচির ফলে ১১টি বন্ধ-বিক্রি-একীভূত করা হয়। এতে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭। অবশ্য বিজেএমসি-নিয়ন্ত্রিত পাটকল ও সহায়ক কারখানা ঢাকা অঞ্চলে ৬টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০টি, খুলনা অঞ্চলে ৯টি ছিল নিকট অতীতে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রস্তাবিত দাবি, কর্মসূচি ও তার অভিঘাত: জুলাই ২০১৪ উত্থাপিত দাবি-সুপারিশ, কর্মসূচি ও অভিঘাত

দাবিসমূহ

১. বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনকে (বিজেএমসি) হোল্ডিং কোম্পানিতে এবং এর অধীন মিলসমূহ সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

২. সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম পাটপণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদান বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. বিজেএমসির আর্থিক দৈন্য দূর করার লক্ষ্যে পাটপণ্যের বাধ্যতামূলক মোড়কীকরণ আইন ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. পঞ্চাশের দশকে স্থাপিত মিলগুলোর উৎপাদনদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলগুলো বিএমআরই করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে।

৫. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির ওপর বিদ্যমান ১০ শতাংশ সাবসিডি আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৬. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির ওপর প্রাপ্য ডিউটি ড্র-ব্যাক বিজেএমসি কর্তৃক আদান সহজীকরণ করার জন্য ডেডো অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৭. ১০০ শতাংশ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির মিলসমূহকে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বিক্রিত মিলসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

৯. সরকার কর্তৃক বেপজাকে হস্তান্তরিত আদমজী জুটমিল বাবদ প্রাপ্য অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

১০. শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

কর্মসূচি	অভিঘাত
• ০২/০৭/২০১৪ইং থেকে ০৫/০৭/২০১৪ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০.০০ টায় গেট সভা করে ২ ঘণ্টা বিক্ষোভ • ০৬/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় রাজপথে ১ ঘণ্টা মানববন্ধন • ০৭/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় মিলের প্রধান কার্যালয় ঘেরাও • ০৮/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় ১ ঘণ্টা রাজপথ অবরোধ • ০৯/০৭/২০১৪ইং তারিখ সকাল ১০টায় ৫ ঘণ্টা মিলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি • ২৫/০৬/২০১৪ইং থেকে ০১/০৭/২০১৪ইং তারিখ পর্যন্ত সব মিলে দাবি আদায়ে বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৬/০৬/২০১৪ইং তারিখ রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল অবস্থিত এমন জেলার ডিসিকে স্মারকলিপি প্রদান ও বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীকে ফ্যাক্সে স্মারকলিপি প্রদান	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

২৪ মার্চ ২০১৫ উত্থাপিত দাবি, সুপারিশ, কর্মসূচি ও অভিঘাত

দাবিসমূহ

১।

(ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে অবিলম্বে মিলগুলো পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজারদরে মানসম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে পাটক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য সর্বপর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

(খ) পাটপণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রণীত আইন ২০০2 ও ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট-২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাটপণ্য বহুদাকরণ করে বিদেশে বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

(গ) সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী পাটশিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করত; ২ শতাংশ বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলো বিএমআরই করতে হবে।

২।

(ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন বোর্ড গঠন করে একই দিন ও একই তারিখ তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) ১ জুলাই ২০১৩ সালে ঘোষিত ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা, যা সরকাডর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টরের কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে, তা অবিলম্বে ওই তারিখ হতে রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলের শ্রমিকদের জন্য অ্যারিয়াসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) পাট-কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়া হচ্ছে, যা আইনসিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ওই শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজে প্রদান করতে হবে।

(ঘ) আলীম জুটমিলকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুটমিলস্ কোম্পানি লিমিটেডসহ যেসব মিলে শ্রমিকদের চাকরির নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর, জাতীয় জুটমিল ও কর্ণফুলী জুটমিল বিজেএমসির পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলের শ্রমিকদের বিজেএমসির অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের ন্যায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণসহ প্রাপ্য প্রদান করতে হবে।

৩।

(ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মিলসমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় মিলসমূহের কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং- ০৭০০০০০০ (১৬১) ০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখঃ ৩০/১২/১৩ মোতাবেক PRL ও LUMP Grant সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি (বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩, যা পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/(১৫)/১২৭, তারিখ-৭/২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) মিলের যেসব শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরিতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসাবে সমন্বয় ও নিয়োগ করে পূর্বের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিলপ্রশাসনের নিকট ন্যস্ত করতে হবে।

৪।

(ক) ১ জুলাই ২০০৯ থেকে চাকরিচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা পিএফ ও গ্র্যাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যেসব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসেবে উত্তোলন করেছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে, অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ওই টাকার লভ্যাংশ প্রদান করে সমুদয় অর্থ স্ব-স্ব ফান্ডে ফেরত দিতে হবে।

(গ) মজুরি কমিশন গেজেট ২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা ও অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫।

(ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক-কর্মচারী মারা গেলে, মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্য আকারে প্রদান করা হয়। এ অনিয়ম দূর করে সবাইকে প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূল মজুরির সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টিবি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

(খ) মিলসমূহের সেট-আপ সংশোধন করে জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলি শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

(গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেওয়া এবং সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি এবং এর অধীন মিলের সম্পদ ও পরিসম্পদের পুণরায় মূল্যায়ন করতে হবে।

জুটমিলের করুণ অবস্থার কারণ

- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়ন না হওয়া।
- আন্তর্জাতিক বাজারে পেমেন্ট সিস্টেমের জটিলতা (বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে)।
- নাইজেরিয়া, মালি, ঘানাসহ কিছু দেশে চাহিদা থাকলেও মূল্য (টাকা) পাওয়ায় ঝুঁকি থাকায় রপ্তানি না করা।
- কখনো কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চাহিদার তুলনায় জোগান কম হওয়ায় আস্থার সংকট।
- অত্যান্ত নিম্নমানের পাটক্রয়।
- সঠিক সময়ে পাটক্রয়ের টাকা ছাড় না হওয়া।
- প্রায় অনুপোযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের চেষ্টা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
- সমন্বিত কৃষি ও শিল্পনীতির অভাব।
- ব্যবস্থাপনার ত্রুটি।
- সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহের অভাব।
- শক্তিসম্পদের অভাব।

- উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি।
- শ্রমিক অসন্তোষ।
- উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান।
- বাজার সংকোচন।
- পাটপণ্যের বিকল্প ব্যবহার।
- যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব।
- লুটপাট ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতি।

সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

- রাজস্ব আয় হ্রাস।
- বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব।
- জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বৃদ্ধি।
- শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা।
- কর্মের অনিশ্চয়তা।
- সঞ্চয় প্রবনতা কমে যাওয়া।
- ভোগ প্রবণতা কমে যাওয়া।
- বেকারত্ব বৃদ্ধি।
- শিক্ষার হার হ্রাস।
- পুষ্টিহীনতা।
- কাপড়ের ব্যবহার হ্রাস।
- সামাজিক সম্পর্কের অবনতি।
- অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি।
- পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।

সম্ভাবনার অপমৃত্যু

এই ভূখণ্ডে পাটের সোনালী অতীত ছিল। ছিল পাট শিল্পের যৌবন। রপ্তানি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল এ শিল্প। ছিল আরও বিপুল সম্ভাবনা। কিন্তু সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছে। রাষ্ট্র আবারও উদ্যোগী হলে সৃষ্টি হতে পারে নতুন কোনো সম্ভাবনা।

- আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সিবিসি)।
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।
- সরকারি খাদ্যগুদামে পাটের বস্তার ব্যবহার বাড়ছে। ২০২১ সালে বিজেএমসির সোয়া ৩ কোটি বস্তা

বিক্রি হয়েছে।

- হেসিয়ান ক্লাথ, যা কনস্ট্রাকশন কাজে নিরাপত্তা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
- বুয়েট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি 'সয়েল সেভার' মাটির ক্ষয়রোধের চটের ব্যবহার বেড়েছে (সওজ ও এলজিইডিতে)
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদীভাঙ্গন রোধে সয়েল সেভার হিসাবে চটের ব্যবহার বেড়েছে।
- পাট শিল্প এখন বস্তা, চট, দড়ি থেকে বেরিয়ে আকর্ষণীয় কার্পেটসহ কারুকার্যময় জুট ম্যাট বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করেছে।
- নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে

সুপারিশসমূহ

পাট শিল্প বন্ধ ঘোষণার সময় দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ শিল্পের আধুনিকায়নের মাধ্যমে পুনরায় চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক, লাভজনক প্রতিষ্ঠান ও স্বচ্ছলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো—

- পাট ও পাটকলের উপর দক্ষ, যোগ্যতা সম্পন্ন ও সৎ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বিজেএমসি ও মিলসমূহ পরিচালনা করা।
- পাট মৌসুমে অর্থ ছাড় দেওয়া এবং বাজারমূল্যে মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা, সাথে সাথে পাট ক্রয়ে ও বিক্রয়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা।
- ৫০ দশকের মেশিনগুলোর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে অবিলম্বে অন্তত প্রতিটি মিলে মিল সাইড বিএমআরই করা।
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট-২০১০ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা।
- প্রণীত শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী পাটকলকে কৃষিভিত্তিক শিল্প ঘোষণা করে ২০ শতাংশ ভতুর্কি প্রদান।
- বিজেএমসি ও এর অধীনস্থ মিলসমূহের সম্পদ-পরিসম্পদ বিজেএমসিকে ফেরত দেওয়া ও ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন করা।
- সর্বোপরি অর্থায়নের পর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাট শিল্পকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- সময়োপযোগী পাট ও পাট শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএর দুর্নীতি রোধ করা।
- শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো।
- সঠিক সময়ে ভালো মানের উপকরণ সরবরাহ।
- উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।
- পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি।

- আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান
- শক্তিসম্পদ বিশেষ করে বিদ্যুতের নিশ্চয়তা বিধান
- বেসরকারি চাতাল মালিকদের পাটের বস্তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে প্রতি বছর ৫০ কোটি বস্তা চাহিদা সৃষ্টি হবে।

উপসংহার

বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে গড়ে ওঠা পাট শিল্প স্বাধীনতাত্তোর জাতীয়করণ হয়। প্রত্যাশা ছিল এই শিল্প বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোকে বিকশিত করবে। জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান কম নয়। ১৯১৩-১৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাধীন পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৩৩৭.১৪ কোটি টাকা ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও আয় ছিল যথাক্রমে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৩৬৩.১৮ কোটি টাকা। বিগত প্রায় দেড় যুগ এ শিল্প মৌলিক বেশকিছু সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়। ফলে সৃষ্টি হয় শ্রমিক অসন্তোষ আর আন্দোলন। সামাজিক ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পয়ে জাতীয় অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা আমাদের মুক্তি সংগ্রাম অর্জিত ১৯৭২-এর মূল সংবিধানসহ স্বাধীন বাংলাদেশের মৌল মানবিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিহীন, পরিকল্পিত অর্থনীতি ও নীতিনৈতিকার পরিপন্থী। এ অবস্থার অবসান জরুরি। প্রশ্ন হলো, করবে কে? রাষ্ট্র না জনগণ? রাষ্ট্রকেই এ দায়িত্ব আগে নিতে হবে। জনগণকে উদ্যোগী করতে হবে, সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মে, যে রাষ্ট্র শুধু পাট শিল্প নয় সমস্ত শিল্প পরিকাঠামোকে সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে। যে আকাঙ্ক্ষায় মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যে প্রত্যাশায় স্বাধীনতাত্তোর পাট শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল বিভিন্ন অজুহাতে বিশেষ করে লোকসানের কারণ দেখিয়ে ২ জুলাই ২০২০ তা বন্ধ করে দেওয়া হলো। লোকসানের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন এবং তার যৌক্তিক সমাধান না করে স্বাধীনতাত্তর ১৯৭২ সালের জাতীয়করণকৃত পাট শিল্প ৪৮ বছর পর বন্ধ করা হলো। কোভিড-১৯ কালীন শ্রমিক-কর্মচারীদের কোনো বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া পাট শিল্প বন্ধ এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ৩ কোটি মানুষকে মহাসংকটে ফেলে দিল। এখন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কী? কি-ই বা হবে এ শিল্পের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের? নাকি অতীতের মতো বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ও বন্ধ হওয়া প্রতিষ্ঠানের মতো চলে যাবে নতুন কোনো শিল্পগোষ্ঠীর হাতে—নতুন মোড়কে নতুন কোনো রেন্টসিকার-শোষক-পুঁজিপতির হাতে? তবে কি রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যাবে সবল পুঁজিপতিদের কাছে? নতুন শিল্পমালিকদের কব্জায় যাওয়া এই সম্পদ দেখিয়ে নতুন কৌশলে ঋণের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পুঁজি ধনীদের দিকে প্রবাহিত হবে না তো, সে নিশ্চয়তা কে দেবে? প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার মতো ফিরিয়ে দেওয়া উচিত পাট শিল্পের সেই সোনালী অতীত। ধোঁয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি নিরসন করে ইতিবাচক দিকে যেতে হলে প্রয়োজন হবে নতুন ভাবনা-পুনর্ভাবনা।

তথ্যসূত্র

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বারকাত, আবুল (২০১৮) *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ-বঙ্গবন্ধু "বেঁচে থাকলে" কোথায় পৌঁছাত বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভব্যতা প্রসঙ্গে*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাটের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ড. মোয়াজ্জেম হোসেন খান, অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম শিকদার অধ্যক্ষ, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, ঢাকা।

JUTE INDUSTRY: GLOBAL SCENARIO & FUTURE PROSRECT FOR BANGLADESH,

Nirmal Chandra Bhakta, Md. Mostafizur Rahman Sardar, Hasan Tareq Khan, Amitabh Chakroborty

Golden handshake to Golden fibre, Khalad Rab

আলম, মোঃ জাহাঙ্গীর, *পাট শিল্পের বর্তমান সংকট আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, অর্থনীতি বিভাগ, ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৫।

পাট শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষিত এবং নাগরিক ভাবনা-এ্যাড. কুদরত-ই-খুদা

পাট ও পরিবেশঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ-সুতপা বেদজ্ঞ

বাংলাদেশের পাট শিল্প ও পাট শিল্প শ্রমিকদের জীবন-জীবিকাঃ অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষন- মাহফুজ চৌধুরী।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১-০২-২০০৭।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ২২-০৩-২০০৭।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১৭-০৪-২০০৭ এবং ১৮-০৪-২০০৭ ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯-০৪-২০০৭ ।

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ।

দৈনিক যুগান্তর, ২৬-০৪-২০১৪।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮-০৪-২০১৫ ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪।

পাট সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ।

পাটকল সংগ্রাম পরিষদ।

জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলস সিবিএ, নন সিবিএ ঐক্য পরিষদ।

কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ।

আইআরভি, খুলনা।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৬৯-১৭৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠনে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ*

সারসংক্ষেপ *স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন স্বয়ং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনায়, কর্মে ও হৃদয়ে এ বিষয়টি সদা জাগ্রত ছিল। এ দেশকে 'সোনার বাংলা' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হওয়ার পেছনে আরেকটি প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইচ্ছা। ঐতিহাসিকভাবেই আমরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সতীর্থরা বুঝতে পেরেছিলেন এ দুর্দশার প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন; সেটি রুখতে হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও তখনকার বাঙালিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আমাদের মাটি, পানি, আমাদের সব সম্পদ আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারব। আমাদের সবই আছে, কিন্তু কীভাবে এগুলো কাজে লাগাব—এ প্রশ্ন থেকেই পরিকল্পনার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মাথায় আসে। সদ্য স্বাধীন দেশটির একটি অন্যতম প্রয়োজন ছিল এর অর্থনীতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি দিগ্‌দর্শন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। দেশের বরেণ্য একদল অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও অত্যন্ত মেধাবী ও অঙ্গীকারবদ্ধ কর্মকর্তা এ কমিশনে যোগ দেন। এ সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এ কমিশনের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় বাংলাদেশেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, তাদের দেওয়া সম্মানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখে এ কমিশন ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মতো এ পরিকল্পনা গ্রন্থটিও এ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক দলিল। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুরুত্বই শুধু তুলে ধরা হয়নি, বরং এ জাতীয় একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হবে, সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রফেসর নুরুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত এ পরিকল্পনা দলিলের ভূমিকাটি একটি অনন্যসাধারণ রচনা, যা আজও এ দেশে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। বঙ্গবন্ধু তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনায় মোটা দাগে দুটি বিষয় চেয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলার দুঃখী মানুষ খেয়েপরে বাঁচুক। দ্বিতীয়ত, বাঙালিরাই বাংলাদেশ শাসন করুক। স্ব-ভূমিতে চিরতরে বিদেশি শাসনের অবসান ঘটুক। তাঁর দুটি লক্ষ্যই প্রায় অর্জিত হয়েছে। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে আমরা একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছি। এই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ২০৪৬ সালে স্বাধীনতার*

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি, প্রেষণে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

> *হীরকজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে 'উন্নত রাষ্ট্রে' পরিণত করা, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম সেরা অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং ২১০০ সালে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সকল সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে সুরক্ষিত করাই হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েজেন তা অবশ্যই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব।*

ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভাবনা, চিন্তা, রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন স্বয়ং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনায়, কর্মে ও হৃদয়ে এ বিষয়টি সবসময় জাগ্রত ছিল। এ দেশকে 'সোনার বাংলা' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হওয়ার পেছনে আরেকটি প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইচ্ছা। ঐতিহাসিকভাবেই আমরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থ ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পেরেছিলেন এ দুদর্শার প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন; অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হলে সেটি রুখতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও তখনকার বাঙালিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আমাদের মাটি, পানি, আমাদের সব সম্পদ আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারব। আমাদের সবই আছে, কিন্তু কীভাবে এগুলো কাজে লাগাব—এ প্রশ্ন থেকেই পরিকল্পনার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মাথায় আসে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুর লেখনিতে এবং বক্তৃতায় বহুবার 'সোনার বাংলা' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়। তিনি সবসময়ই 'সোনার বাংলার' গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন এবং সে মতো কাজও করেছেন। সোনার বাংলা তাঁর কাছে নিছক কোনো রাজনৈতিক 'বুলি' ছিল না। এই ভূখণ্ডের অতীত গৌরবের ইতিহাস সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের জীবনমানের সমতুল্য ছিল। বঙ্গবন্ধু এই গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যথাযথ সংগ্রামের মাধ্যমে অতীতের সেই গৌরবময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই স্বাধীনতার বহু বছর আগেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন।

অবাস্তব রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একচোখা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে) ঠকিয়েছে এবং শোষণও করেছে। এই শোষণ ও বৈষম্যের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা সচেতন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে এই বৈষম্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মাত্রাও ছিল। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫০টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্থানে ৪৭টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে কৃষির অধিকতর বিকাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য বেশি পরিমাণে বরাদ্দ দিয়েছিল। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) কৃষকেরা অতি উন্নতমানের পাট উৎপাদন করত। অথচ এই পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে, যা আয় হতো তার শতকরা ৯০ ভাগই

ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য। পাকিস্তানে তখন চলছে কতিপয় পরিবারতন্ত্র। প্রায় সব ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল ২২টি পরিবারের হাতে। আর পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে ওই পরিবারতন্ত্রের সমর্থক কেন্দ্রীয় শাসকেরা মোটেও ভাবত না।

বঙ্গবন্ধু এই ভয়াবহ বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এ দেশের দুঃখী মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি ছিলেন দুঃখী মানুষের বন্ধু। তিনি সবসময় দুঃখী মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাইতেন। আর তাই তিনি এ অধিকার আদায় করতে গিয়ে বারবার জেল খেটেছেন, অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কিন্তু দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর ক্ষেত্রে কখনো বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। তাই তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন, তখন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এ দেশের শিল্প বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবনা অনুসারে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এ দেশীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আসার কথা। পূর্বের প্রতি পশ্চিমের বৈষম্যের সূত্রগুলো খুঁজে বের করার জন্য তিনি একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবনা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনও করেছিল। সেই ভাবনা থেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই একঝাঁক দেশপ্রেমিক, নিবেদিতপ্রাণ অর্থনীতিবিদ নিয়ে গঠন করলেন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

পাকিস্তানের দুই অংশে যে দুটো অর্থনীতি বিরাজমান, এই ধারণা প্রথম তোলা হয় ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬০) জন্য উন্নয়ন কৌশল তৈরির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদেরা ১৯৫৬ সালের ২৪-২৮ আগস্ট একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক এবং পরিকল্পনা বোর্ডের অর্থনীতিবিদেরা অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাজহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের শেষে বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সুপারিশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, পাকিস্তানকে একটি 'দুই অর্থনীতির' দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। আর তখন থেকেই দুই অর্থনীতির তত্ত্ব শুরু।

পাকিস্তানি যুগে প্রথম যে আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুসহ দেশপ্রেমিক বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তা হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। বাংলাদেশের প্রথম প্রতিবাদ শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা তথা মাতৃভাষার দাবি আদায় নিয়ে বিশ্বে প্রথম এই প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদেও বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলায় কথা বলার দাবি আদায় আমরা করেছিলাম। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পেছনেও বঙ্গবন্ধুসহ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা কম ছিল না। সে সময়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি চিহ্নিত করে অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন দেয়ালপত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটি আরও বড় করে তোলা এবং এ দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বিকল্প কাঠামো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাঙালি অর্থনীতিবিদসহ বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অসামান্য। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুসহ প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, যার বেশির ভাগই কোনো অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত নয়, বরং তা দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক

নীতি অনুসরণের ফলাফল। তখন থেকে ‘দুই অর্থনীতি তত্ত্বের’ জন্ম, যার মূল কথা ছিল যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান; দীর্ঘদিনের শোষণের ফলে পাকিস্তানি অর্থনীতি বর্ধিষ্ণু ও বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ দুটো অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের জন্য পৃথক নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা পেলাম এক দেশ, দুই অর্থনীতি। শোষক আর শোষিতের অর্থনীতি। পাকিস্তান হলো শোষক, আমরা হলাম শোষিত।

প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক বাঙালি অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক (১৯৭০-৭৫) পরিকল্পনার ওপর পাকিস্তানের দুই অংশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে যে বিশেষজ্ঞ পর্ষদ গঠিত হয়েছিল, তাতে বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা তাঁদের পাকিস্তানি প্রতিপক্ষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে একটি একক প্রতিবেদনের পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের একটি ভিন্ন নিজস্ব প্রতিবেদন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, বাংলাদেশকে শোষণ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়সমূহই আলোচিত হয়েছিল। এ পৃথক প্রতিবেদনটি তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি অনন্যসাধারণ প্রতিবাদ হিসেবে বাঙালির ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

মূলত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার ও আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা সবাই জানলেও সংবাদপত্রগুলো তা নানা কারণে প্রকাশ করার সাহস রাখত না। সে সময় বাঙালি অর্থনীতিবিদসহ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সভায় শাসকগোষ্ঠীর ‘এক দেশ, দুই অর্থনীতি’র বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। সে সময় প্রফেসর রেহমান সোবহান ছিলেন ২৬ বছরের একজন বিপ্লবী দেশপ্রেমিক তরুণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি সবেমাত্র ১৯৫৬ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবসময় বাঙালির দাবি নিয়ে স্পষ্ট কথা বলতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনীতির মানুষজনকেও এই দ্বৈত অর্থনীতির বিষয়ে সচেতন করে তোলা, প্রতিবাদী করে তোলা। বিশেষ করে তখনকার দেশপ্রেমিক তরুণ ছাত্রসমাজকে শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরেও রাজনৈতিক দীক্ষা-শিক্ষা দিতেন এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করতেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হওয়ার ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আলাদা অর্থনীতির দাবিও ওঠে। ঠিক এই সময় প্রফেসর রেহমান সোবহান ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের লাহোরে গিয়ে দুই অর্থনীতি তত্ত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান পৃথক অর্থনীতির দাবিকে কঠোর ভাষায় নাকচ করে দিয়ে এক অভিন্ন অর্থনীতির কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সে সময় পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছিল, আইয়ুব বলছেন ‘এক অর্থনীতি’, একই সময়ে আরেকটি পত্রিকায় সংবাদের শিরোনাম ছিল, ‘রেহমান বলছেন দুই অর্থনীতি’। পত্রিকায় এই পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হলে ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের কাছে আইয়ুব খানের সরাসরি প্রশ্ন ছিল, ’এই রেহমান সোবহানটা আবার কে?’

ঠিক একই সময়ের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন খ্যাতিমান অধ্যাপক আইয়ুব খানের সাথে সরাসরি কথা বলার আমন্ত্রণ পান। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তানের

অনুন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার। এই দলে ছিলেন ড. এম এন হুদা, ড. এফ এ হুসেইন, ড. আবদুল্লাহ ফারুক ও ড. নুরুল ইসলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি একটি লিখিত স্মারকলিপি দিতে বললেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে সেই স্মারকলিপিটি তাঁর কাছে পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপির সুপারিশ দ্রুতই হিমাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তা আর আলোর মুখ দেখেনি।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল পাকিস্তানে বিদ্যমান 'দুই অর্থনীতির তত্ত্ব'। তদানীন্তন পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং তার ফলস্বরূপ দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে দুই অর্থনীতির তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তী সময়ে এর ভিত্তিতেই গড়ে তোলেন ছয় দফা কর্মসূচি। তিনি অনুভব করেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে এতটা পার্থক্য যে এর ফলে দুই অংশের মধ্যে পুঁজি ও শ্রমের সহজ চলাচল সম্ভব নয়। আর এ দুই অংশের জন্য এক অর্থনীতি কাজ করতে পারে না। তিনি প্রশাসনে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন শোষণটা কীভাবে হয়। তাই তিনি বলেছিলেন, দুই অর্থনীতি এভাবে একত্রে চলতে পারে না। সে জন্যই ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন। বাঙালির ইতিহাসে লাহোর একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৪০ সালে এই লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৬১ সালে এই লাহোরে প্রফেসর রেহমান সোবহান দুই অর্থনীতির তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। আবার এই লাহোরেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসনদ উপহার দিলেন। বঙ্গবন্ধু মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই ছয় দফাকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাঁকো।

ঐতিহাসক ছয় দফার মধ্যে একটি ছিল ফেডারেল স্টেট অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে। প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতায়ন করা হবে। অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কর আহরণে প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। প্রাদেশিক সরকার যতটুকু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে সেটি দিয়েই তাকে চলতে হবে। প্রদেশের আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা থাকবে। দুই প্রদেশের আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভব না হলেও তারা আলাদাভাবে পরিচালিত হবে। প্রদেশের নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারি বাহিনী থাকবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূলত একজন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ নন। তবু তিনিই প্রথম পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অর্থনীতির প্রস্তাবনা হাজির করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে ১৫০০ মাইলের ব্যবধান তা ভৌগলিক সত্য। কাজেই এই দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই।" এভাবে তিনি ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধীনতার সাঁকো তৈরি করলেন।

একদিকে চলছে মাঠে-ময়দানে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রাজনীতির লড়াই। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ। অন্যদিকে 'ফোরাম'-এ ছাপা হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য আর বঞ্চনা নিয়ে শাণিত সব প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ। ফোরামে যাঁরা লিখতেন, তাঁরা হলেন ড. অমর্ত্য সেন, ড. নুরুল ইসলাম, ড. আনিসুর রহমান, ড. আখলাকুর রহমান, ড. এ আর খান, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, কে জি মুস্তাফা। ফোরামের আজীবন গ্রাহক হলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালের ২২ নভেম্বর রমনার সবুজ চত্বরে ফোরামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়ে। ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ১০০০ টাকা দিয়ে ফোরামের আজীবন গ্রাহক হন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে একটা সংবিধান তৈরি করা। এতদিন যা ছিল দাবি, এখন

তা হয়ে দাঁড়ায় দায়িত্ব। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটা অনানুষ্ঠানিক হাইকমান্ড ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁদের নিয়ে বারবার বৈঠক করেন। কিন্তু সংবিধান তৈরির জন্য দরকার বিশেষজ্ঞের। বঙ্গবন্ধু এই কাজে তাঁর দেশপ্রেমিক, পরীক্ষিত, নিবেদিতপ্রাণ সহযোগীদের একত্রিত করলেন, যাঁরা এতদিন বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্রন্টে স্বাধিকারের জন্য লড়াই করে আসছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন ড. নুরুল ইসলাম, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড. খান সরোয়ার মুরশিদ, ড. আনিসুর রহমান, ড. কামাল হোসেন এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। একাত্তরের উথাল-পাতাল দিনগুলোতে লোকচক্ষুর আড়ালে চলত তাঁদের আলোচনা। তাঁরা খসড়া সংবিধান তৈরি করে বঙ্গবন্ধুকে দেখাতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সংলাপ দর-কষাকষির জন্য একটা খসড়া সংবিধান তৈরির কাজটা বঙ্গবন্ধু মুজিব আগেভাগেই করে রাখলেন।

২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার সামান্য পরেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাজউদ্দীন আহমদসহ প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দ্বৈত অর্থনীতির বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। তাই খুব দ্রুতই তাঁরা দেশ ছেড়ে ভারতের পথে রওনা হয়ে যান। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে দিল্লী পৌঁছালে আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ভারতের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, অর্জন সেনগুপ্ত, অশোক মিত্রসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে প্রফেসর নুরুল ইসলামের সাথে দেখা হয়। হার্ভার্ডে তাঁর সতীর্থ পি. এন. ধরের সাথেও সে সময় সংযোগ ঘটে। প্রফেসর নুরুল ইসলাম এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান পি. এন. হাকসারের সাথেও দেখা করে তাঁকে ঢাকায় যে গণহত্যা ও নির্যাতন চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরে তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শমতো প্রফেসর নুরুল ইসলাম ও প্রফেসর রেহমান সোবহান এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে এবং এপ্রিলের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের পাশাপাশি প্রবাসী বাঙালিদেরও সংগঠিত করেন।

স্বাধীনতার পরপরই তাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমাদের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা অন্যতম প্রধান যে কাজটি করেছিলেন, সেটি হলো বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি এই কমিশন গঠন করেন। এর লক্ষ্য ছিল একটি পরিকল্পিত রাষ্ট্র গঠন। বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের চিন্তায় সমসাময়িক অর্থনৈতিক ভাবনা চিরজাগরূক ছিল। সমাজতন্ত্র অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, পীড়াদায়ক বৈষম্য-শোষণ রোধ এবং অভ্যন্তরীণ লুণ্ঠন আইনের মাধ্যমে পরিহার করা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু যাঁদের চিনতেন এবং দুই অর্থনীতির তত্ত্ব ও ছয় দফায় যাঁদের ভূমিকা ছিল তাঁদেরই কয়েকজনকে নিয়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন। প্রফেসর ড. নুরুল ইসলামকে ডেপুটি চেয়ারম্যান পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদাসহ, প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর ড. আনিসুর রহমানকে সদস্য তথা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় কমিশনে নিয়োগ দেন। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি দিয়েছিলেন। অনেক তরুণ দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত অর্থনীতিবিদদেরও তখন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

সদ্যস্বাধীন দেশটির একটি অন্যতম প্রয়োজন ছিল এর অর্থনীতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি দিগ্‌দর্শন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও একদল অত্যন্ত মেধাবী ও অঙ্গীকারবদ্ধ কর্মকর্তা এই কমিশনে যোগ দেন। এ সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এ কমিশনের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে তাঁরা প্রাপ্ত সম্মানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখে ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মতো এ পরিকল্পনা গ্রন্থটিও এ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক দলিল। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুরুত্বই শুধু তুলে ধরা হয়নি, বরং এ জাতীয় একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হবে, সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রফেসর নুরুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত এ পরিকল্পনা দলিলের ভূমিকাটি একটি অনন্যসাধারণ রচনা, যা আজও এ দেশে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমা ১৯৭৮ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার আগেই বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সুবিশাল কর্মযজ্ঞে বড় ধরনের কুঠারাঘাত এল। যেসব নিবেতিপ্রাণ উজ্জীবিত ব্যক্তি কমিশনে সংযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরাও কমিশন ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

নতুন শাসক যারা এলেন, তারা যেমন বাংলাদেশকে হত্যা করল, তেমনিভাবে স্বাধীন পরিকল্পনা কমিশনকেও হত্যা করল। হয়তো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হত্যা করল না, কিন্তু অযত্নে-অবহেলায় সংস্থাটিকে এক পাশে ফেলে রেখে দিলো। ফলে কমিশন ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাল। পর্যায়ক্রমে প্রতিপক্ষ শাসকগোষ্ঠী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা থেকেও সরে এলো। শক্তিশালী বৈশ্বিক গোষ্ঠী সংস্থার (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ) পরামর্শে তারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বাদ দিয়ে বাজার অর্থনীতির দিকে পা ফেলতে শুরু করল। 'দাতাদের' পরামর্শে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করল। প্রাসঙ্গিকভাবে নতুনত্বের কিছু চমকও দেখা গেল। 'অর্থ কোনো সমস্যা নয়' এ ধরনের চমক নতুন শাসকগোষ্ঠী ছড়াতে লাগলেন। নতুন শাসকগোষ্ঠী এসেই রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি করাটা কঠিন করে তুললেন। কিন্তু অচিরেই এর অন্তর্নিহিত নেতিবাচক চরিত্র (প্রাতিষ্ঠানিক লুণ্ঠন, বিরাজনীতিকরণ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি) প্রকাশ পেতে শুরু করল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত টানা দুই দশক স্বাধীনতাকেন্দ্রীক সার্বিক কল্যাণমূলক উন্নয়নের আকাঙ্খা রুদ্ধ হলো।

১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় এল। শেখ হাসিনা আবার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা পুনরুজ্জীবিত করলেন। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ চাঙ্গা হলো। তবে স্বাধীনভাবে নয়, সরকারের একটি অন্যতম মন্ত্রণালয় হিসেবে। পুরনো জঞ্জাল গুছিয়ে অর্থনীতি একটা পর্যায়ে পৌঁছাল। কিন্তু ২০০১ সালে আবার সূক্ষ্ম কূটচালের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হলো। গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুরনো প্রতিক্রিয়াশীলতার দর্শন ফিরে এল। ২০০৫ সাল পর্যন্ত এভাবেই চলল। ২০০৬-২০০৮ সময়কাল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নামে এক ধরণের অসংজ্ঞায়িত, অগণতান্ত্রিক শাসন চলল।

২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে উপহার দিলেন 'দিন বদলের সনদ' তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'মধ্যম আয়ের দেশ'। এ লক্ষ্যে পুরো

জাতিকে স্বপ্ন দেখালেন এবং প্রণয়ন করলেন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে হাঁটলেন। প্রণয়ন করলেন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)। তাই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে, উন্নয়নের রোলমডেল। বাংলাদেশ এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়ন এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের। এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে রোল মডেল। এসডিজি ২০৩০ লক্ষ্য অর্জনেও বর্তমান সরকার যথাযথ ও কার্যকরী পরিকল্পনা ও নীতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের নামীদামি বিভিন্ন সমীক্ষায় এবং গবেষণায় বলা হচ্ছে, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়ার তিনটি দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ হবে এবং সে দেশগুলো হলো চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশও এশিয়ার দেশ হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতিতে আগামীতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করবে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। এই সাহসী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই সাহসী ও দেশপ্রেমিক সিদ্ধান্ত নেন স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে। এর ফলে আমাদের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১.৫ শতাংশ। খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নয়নের এক নতুন জোয়ার শুরু হবে। দুর্নীতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আনতে পারলে আমাদের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১ শতাংশ এবং কর্মক্ষেত্রে যদি নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে আসা যায়, তাহলে প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১.৫ শতাংশ। অর্থাৎ আগামীতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে দুই ডিজিটের।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনায় মোটা দাগে দুটি বিষয় চেয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলার দুখী মানুষ খেয়ে পরে বাঁচুক। দ্বিতীয়ত, বাঙালিরাই বাংলাদেশ শাসন করুক। স্ব-ভূমিতে চিরতরে বিদেশি শাসনের অবসান ঘটুক। তাঁর দুটি লক্ষ্যই প্রায় অর্জিত হয়েছে। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে আমরা একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছি। এই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ২০৪৬ সালে স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে 'উন্নত রাষ্ট্রে' পরিণত করা, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম সেরা অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং ২১০০ সালে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সব সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে সুরক্ষিত করাই হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে আমাদের প্রত্যাশা এই যে, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন আমাদের দেখাচ্ছেন, তা অবশ্যই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব।

গ্রন্থপঞ্জি

নুরুল ইসলাম, 'ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি', প্রতিচিন্তা, ০৮ আগস্ট, ২০২১।

সেলিম জাহান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০১০-২০২১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০২১-২০৪১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আব্দুল বায়েস, 'জাদুকর শিক্ষক, মানবিক সমাজবিজ্ঞানী জন্মদিন', কালের কণ্ঠ, ১২ মার্চ, ২০১৭।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সকল বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১)।

রূপকল্প- ২০২১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রূপকল্প- ২০৪১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আতিউর রহমান, অ্যান ওডেসি: প্রফেসর নুরুল ইসলামের আত্মজৈবনিক এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, চ্যানেল আই অনলাইন, ০৬ নভেম্বর, ২০১৮।

আতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অর্থনৈতিক মুক্তি', সচিত্র বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০১৬।

আতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা এবং আগামী দিনের বাংলাদেশ', দৈনিক ইত্তেফাক, ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

আতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণের অর্থনীতি' প্রতিচিন্তা, ০৮ আগস্ট, ২০২১।

আনিসুর রহমান, পথে যা পেয়েছি (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), অ্যাডর্ন পাবলিকেশনস, ঢাকা।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫, ২০১৬-২০২০, ২০২০-২০২৫), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এম এ মান্নান, 'জাতির জনক ও পরিকল্পনা কমিশন', বণিক বার্তা, ১৫ আগস্ট, ২০২০।

Islam, Nurul. Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale, Dhaka: UPL, 2003.

Islam, Nurul. An Odyssey: The Journey of My Life, Dhaka: Prothoma Prokashon, 2018.

Sobhan, Rehman. Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment, New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd, 2016.

Sobhan, Rehman. From Two Economics to Two Nations: My Journey to Bangladesh, Dhaka: Daily Star Books, 2016.

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৭৯-১৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নারীর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: উত্তরণের উপায়

মনজু আরা বেগম*

সারসংক্ষেপ *কোভিড-১৯ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মারণঘাতি ভাইরাস। এ ভাইরাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। বিশেষ করে প্রবীণ ও নারী জনগোষ্ঠীর ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে এটি বাংলাদেশে দেখা দেয়। করোনার প্রভাবে স্বাস্থ্যখাতের দুরবস্থা, দুর্নীতি, সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণের অব্যবস্থা, প্রবীণ নারী ও পুরুষের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও সমাজে প্রবীণদের সম্মানজনক অবস্থান না থাকায় তাদের নির্যাতিত ও বিপর্যস্ত জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত ও করোনার প্রভাব থেকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উত্তরণের সুপারিশ-পরামর্শ রয়েছে।*

ভূমিকা

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীতে আমরা অন্যরকম এক বাংলাদেশকে দেখছি। যে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে মাথা উচুঁ করে বেঁচে থাকার এক বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে। আমাদের মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, সার্বজনীন শিক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার, কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো বিদ্যুৎ, প্রযুক্তি, প্রবাসী আয় ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছিল অবিরত। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০২১ সময়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বাংলাদেশের অর্থনীতি সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও বিশ্বে ৪১তম স্থান করে নিয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যের হার ২০০৭ সালে ছিল ৪৩ শতাংশ। বর্তমানে তা ২০ শতাংশেরও নিচে। আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্রই ছিল দেশের মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকে মুক্তি, মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের এ অর্জনকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছে কোভিড-১৯ নামক এক মারণঘাতি ভাইরাস। বিজ্ঞানী তথা গবেষকদের মতে, আগামী ২০২৪

* সাবেক মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন; কলামিস্ট। ই-মেইল: monjuara2006@yahoo.com

সাল পর্যন্ত এ ভাইরাস চলতে পারে। করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখার এখন পর্যন্ত একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ভ্যাকসিন গ্রহণ। যদিও ভ্যাকসিন তেমন একটা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এ ভাইরাসের রূপ বা গতিপ্রকৃতি খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এ ভাইরাস যে শুধু আমাদের দেশে বা আমাদের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে, তা নয়। বিশ্বজুড়ে পড়েছে এর ক্ষতিকর প্রভাব। ক্ষুদ্র এ ভাইরাসের কাছে বিশ্বের বড় বড় পরাশক্তিধররাও নতজানু হয়ে পড়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়া প্লেগ মহামারির পর এই কোভিড-১৯ মহামারি মানুষের জীবন এবং অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে চলা কোভিডের কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক শ্লথ হয়ে গেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের মৌলিক খাত কৃষি, শিল্প ও সেবা এই তিনটি খাতের মধ্যে শিল্প ও সেবা এ দুটি খাত স্থবির হয়ে গিয়েছিল। জিডিপিতে এ দুটি খাতের অবদানই প্রায় ৮৩ শতাংশ। কৃষি খাতের উৎপাদন অব্যাহত থাকলেও পরিবহন সংকটে পণ্যের বিপণন স্বাভাবিক না থাকায় করোনার ধাক্কায় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি স্বাভাবিক ছিল না। ব্যবসাবাণিজ্য ছিল স্থবির। করোনা মোকাবিলায় ব্যবসায়ীদের জন্য যে প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়নি। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে এই সংক্রমণ ধরা পড়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০২০-এর ১১ মার্চ হতে কোভিড-১৯ কে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ভাইরাসটি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের ১৮৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে বিশ্বের বড় বড় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোতেও এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। কোভিড-১৯ মানব ইতিহাসে বিশ্বে ভয়াবহতম একটি ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই মহামারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এই ভাইরাস পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে জনজীবনকে বিচ্ছিন্ন এবং পঙ্গু করে দেয়। সরকার লকডাউন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউন চলার কারণে দোকানপাট শিল্প-কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানিসহ বহির্বিশ্বের সাথে সবধরনের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে। কোভিডের ভয়াবহতা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতে গৃহবন্দী মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছে। এই ভাইরাস রক্তের সম্পর্কগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে। হাসপাতালে উপচেপড়া রোগীর ভীড় জীবনের গতিকে থেমে দিয়েছে। ভয়ে-আতঙ্কে মা-বাবা সন্তানের কিংবা সন্তান মা-বাবার মৃত্যুসংবাদ শোনার পরও দেখতে যায়নি বা দাফন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়নি। কোনো হাসপাতালেই তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। করোনা আক্রান্ত রোগীকে এ হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতাল করতে করতেই কতজন যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, সে হিসাব করতে গেলে এখনও গা শিহরে ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউন দিয়ে, মুখে মাস্ক পড়ে, সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে, হাটবাজার এড়িয়ে চলে ভ্যাকসিন দিয়ে সবরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেও কোনো পার পাওয়া যায়নি। এই নৃশংতম ভয়াবহ দিনগুলো আমরা ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও কেটে উঠছি। জানি না এটি কতদিন কাটাতে পারব। শোনা যাচ্ছে আসছে শীতে আমাদের দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আবার বাড়বে। ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে এরই মধ্যে করোনা 'অমিক্রন' নাম ধারণ করে তীব্রভাবে হানা দেওয়া শুরু করেছে। শুরু হয়েছে আবার লকডাউন। লকডাউনের কারণে জনজীবন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। অফিস-আদালত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা একসময় বন্ধ হয়ে যায়। জীবন হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত।

অর্থনৈতিক প্রভাব

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দারুণ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এ সময়ে শ্রমবাজারে নতুন করে আসা কর্মীদের যেমন চাকরির সুযোগ ঘটেনি, তেমনি আগের চাকরিজীবীদের অনেকেই চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। পত্রিকার তথ্যানুসারে সব মিলিয়ে এই সময়ে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩ লাখ। (দৈনিক যুগান্তর ০৯.১০.২১)। এই বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যেভাবে বিনিয়োগ দরকার, সেভাবে বিনিয়োগ বাড়ছে না। গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাংকের সহযোগী সংস্থা আইএফসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে অর্থনীতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে। করোনার পূর্বে বাংলাদেশে মোটামুটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল, যা দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করছিল। ২০১৯ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২ শতাংশ। করোনার কারণে ২০২০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩.৮ শতাংশে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক জরিপে দেখা গেছে, করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে পরিবারপ্রতি গড়ে ৪ হাজার টাকা করে আয় কমে গেছে। বিবিএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মে নিয়োজিত, যা মোট জনশক্তির প্রায় ৮৫.১ শতাংশ। করোনার কারণে প্রায় ৮০ শতাংশ দিনমজুর কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আবুল বারকাতের সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক গবেষণায় জানা যায়, দেশে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ৬ কোটি ৮২ লাখ ৮ হাজার মানুষ কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। শুধু করোনায় লকডাউনের কারণে কর্মহীন হয়েছেন ৩ কোটি ৫৯ লাখ ৭৩ হাজার ২৭১ জন। অর্থাৎ মোট কর্মক্ষম মানুষের ৫৯ শতাংশই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বেকার হয়েছেন সেবাখাতে। বিবিএসএর হিসাবে প্রতিবছর গড়ে শ্রমবাজারে যুক্ত হয় ২৪ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ। এ হিসাবে গত দেড় বছরে শ্রমবাজারে এসেছে সাড়ে ৩৬ লাখ মানুষ। করোনার কারণে সরকারি চাকরিতে যেমন কর্মসংস্থান হয়নি, তেমনি বেসরকারি খাতেও তেমনভাবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। ফলে ওই সাড়ে ৩৬ লাখের মানুষের বেশির ভাগই বেকার। এর সাথে নতুন করে কাজ হারানোর তালিকায় আছে ১৬ লাখ ৭৫ হাজার মানুষ। সরকারি হিসাবেই দেখা যায়, শুধু করোনাকালীন বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ লাখ। সরকার করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রায় ৩৫ লাখ পরিবারকে ২ লাখ ৫০০ টাকা করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ১ লাখ কৃষক পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথাও জানা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে করোনার আঘাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে একটি পরিবারের কতদিন চলবে? এ ছাড়া আছে চিকিৎসা ব্যয়, বাড়িভাড়াসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়। বিবিএসের তথ্যনুসারে গত নভেম্বরে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে হয়েছে ৫.৯৮ শতাংশ, যা গত অক্টোবরে ছিল ৫.৭০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির এই হার জনজীবনে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষকে চরম দুর্দশায় ফেলেছে। অবশ্য মূল্যস্ফিতির এই হার সারা বিশ্বেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে বিগত ৪৯ বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়েছে। হঠাৎ করে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এর কারণ হতে পারে। করোনা ছাড়াই বাজারে প্রতিটি দ্রব্যের এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি ছিল। তার সাথে যোগ হয়েছে করোনার প্রভাব। এসব ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে

স্বল্প আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ ভাইরাসের কারণে অনেকে চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। দারিদ্র্য বেড়েছে। গরিবরা আরও গরিব হয়েছে। করোনার আঘাতে নতুন করে আড়াই কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে এবং বেকার হয়েছে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ। এ কারণে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো হয়েছে। জানা যায়, ২০২১-২২ অর্থ বছরে নতুন করে ৫৭ লাখ বয়স্ক মানুষকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হবে। বর্তমানে ৮৯ লাখ মানুষকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

আইএলও থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। করোনার কারণে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। তাদের হিসাবে আগামী ২০২৩ সাল পর্যন্ত শ্রমেরবাজারে করোনার প্রভাব থাকবে। এতে করে কাজ হারানোর সংখ্যা আরও বাড়বে। কমবে নতুন কর্মসংস্থান। ফলে বাড়বে দারিদ্র্য। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্রাক ইন্সটিটিউট অব গর্ভন্যান্স এন্ড ডেভলপমেন্টের এক জরিপে বলা হয়, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর আগে গত মার্চে নতুন দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪৫ লাখ। সানেমের গবেষণায় বলা হয়, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ছিল ২০.৫ শতাংশ। করোনার কারণে এ হার বেড়ে প্রায় ৪১ শতাংশে। সিপিডির তথ্যানুসারে করোনায় ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে, যাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। করোনার ক্ষতি মোকাবিলা করতে সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, করোনাকালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির থাকলেও বিগত ১ বছরে দেশে নতুন কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজারে। জানা যায়, ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি আমানতকারী ছিল মাত্র ৫ জন। ১৯৭৫ সালে ৪৭ জন, ১৯৮০ সালে ৯৮ জন, ১৯৯০ সালে ৯৪৩ জন, ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫ শত ৯৪ জন, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২ জন, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭ জন, ২০০৮ সালে ১৯ হাজার ১৬৩ জন। (১৩.১০.২১ দৈনিক যুগান্তর)। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, করোনার প্রভাবে দারিদ্র্যের হার বাড়লেও ধনীক শ্রেণির সংখ্যাও সমহারে বেড়েছে অর্থাৎ এই সময়ে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে। ফলে শ্রেণি বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। দেশের অর্থনীতির আকার বড় হলেও আয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। করোনা মহামারি চলাকালীন বিশ্বে ধনী-গরিব বৈষম্য বেড়েছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট এ বলা হয়েছে ২০২০ সালে বিশ্বে ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যারিসভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি ল্যাবের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ শতাংশ ধনীর হাতে কুক্ষিগত হয়েছে ৭৬ শতাংশ সম্পদ। এই সময়ে অতিরিক্ত ১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যে ডুবে গেছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে বৈশ্বিক আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ সম্পদ। গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বের ৫২ জন ধনী ব্যক্তির সম্পদ গত ২৫ বছরে বেড়েছে ৯.২ শতাংশ। চলতি বছর অতিধনীদের পারিবারিক সম্পদের সম্মিলিত পরিমাণ বেড়ে বৈশ্বিক সম্পদের ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২০ সালে করোনা শুরুর পূর্বে ছিল ২ শতাংশের কিছু বেশি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র অনুযায়ী, উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলোতে পর্যটন, ভ্রমণ ও দেশীয় বাণিজ্য খাতে উৎপাদন মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। গবেষণাপত্রের অনুমান, এই মহামারিতে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.১ শতাংশ থেকে ০.৪ শতাংশ। (এডিবি-২০২০)। মহামারি চলাকালীন এশিয়ার দেশগুলো প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার লোকসানের মুখে পড়তে পারে। এই অনুমান থেকে এটি স্পষ্ট, ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সরকারের স্বাস্থ্য খাত

২০১২ সালে সরকারের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০ বছর মেয়াদি (২০১২-২০৩২ সাল) একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, ব্যাক্তিপর্যায়ের চিকিৎসা ব্যয় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০৩২ সালে ৩২ শতাংশ করা হবে। বাকিটা সরকার বহন করবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ব্যয় তো কমছেই না, বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ সালে এ ব্যয় বেড়ে ৬৯ শতাংশ হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ তথ্য থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। ২০১২ সালে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কৌশলপত্র প্রণয়নের সময় ব্যাক্তির নিজস্ব চিকিৎসা ব্যয় ছিল ৬৪ শতাংশ। ২০১৫-২০১৭ সময় এ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬৭ শতাংশে। ২০২০ সালের গবেষণায় এই ব্যয় আরও বেড়ে হয়েছে ৬৮.৫ শতাংশ। তাই করোনাকালীন চিকিৎসা খরচ বহনে প্রবীণ নারী-পুরুষসহ সাধারণ মানুষ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯৭ সাল থেকে দেশে মোট স্বাস্থ্যব্যয়ে সরকারের ভাগ ক্রমান্বয়ে না বেড়ে বরং কমেছে। এতে হিমশিম খাচ্ছে রোগীর পরিবার।

২০১৭ সালের স্বাস্থ্যবিষয়ক এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যক্তির স্বাস্থ্যব্যয় মালদ্বীপে ১৮, ভুটানে ২৫, শ্রীলংকায় ৪২, নেপালে ৪৭, পাকিস্তানে ৫৬ এবং ভারতে ৬২ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে এ ব্যয় সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৬৮.৫ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশেই ব্যক্তির স্বাস্থ্যব্যয় সবচেয়ে বেশি। এ কারণে স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। গবেষকদের মতে, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার তিনটি দিক রয়েছে । প্রথমত, প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনানুযায়ী রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা। এসব লক্ষ্য অর্জন থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে।

দুর্নীতির প্রভাব

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রভাব পড়েছে। গত অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৩৪১ কোটি টাকা বিতরণ সম্ভব হয়নি। ফলে দুঃস্থদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটেছে। এ ছাড়া ৮৭ হাজার ভুয়া ভাতাভোগী চিহ্নিত হয়েছে। টিআইবির এক গবেষণায় বলা হয়েছে, সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্যভান্ডারে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে ১০০ থেকে ২০০ শত টাকা ঘুষ দিতে হয়। এমনকি অতিদরিদ্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম সঠিক ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বহু মানুষ করোনাপরবর্তী দুরবস্থা এবং দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, সেই সাথে শ্লথ হয়ে পড়া অর্থনীতির গতি সচল হবে—এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

করোনায় প্রবীণ নারী ও পুরুষ

কোভিড-১৯ এ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত, বিপন্ন ও আক্রান্ত হয়েছেন প্রবীণ নারী ও পুরুষ। আমাদের পারিবারিক কাঠামো যৌথপরিবারভিত্তিক হলেও সময়ের পরিক্রমায় প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা, আকাশ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে যৌথ পারিবারিক কাঠামো ধীরে ধীরে শিথিল হচ্ছে। তবে গ্রামীণ পরিবারগুলো এখনো যৌথভাবে চলছে। আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। ফলে পরিবারের সর্বময়

কর্তা পুরুষ ব্যক্তি হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার ওপরই ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সন্তান যখন বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নেয়, তখন আর বৃদ্ধ মা-বাবার পরিবারে তেমন কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। গ্রামের কৃষকেরা করোনাকালীন উৎপাদন অব্যাহত রাখলেও লকডাউনের কারণে বাজারব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় অধিকাংশ পরিবারই বিশেষ করে প্রবীণ নারী পুরুষেরাই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় দিন অতিবাহিত করেছেন। চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের দেশে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধ্যমতো কোনো না কোনো কায়িক শ্রম করে থাকেন। এরপরেও তারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন; বৃদ্ধ বয়সে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারান, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই অবস্থা করোনায় আরও প্রকট হয়েছে। একইভাবে পরিবারে মহিলারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কায়িক শ্রম দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না, তারা পারিবারিক বা সামাজিক মর্যাদা পান না। উপরন্তু তারা বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন বেশি। আমাদের মতো দারিদ্র্যপ্রবণ দেশে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান সমস্যাসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় প্রবীণ নারী ও পুরুষেরা এমনিতেই প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছেন। করোনাকালীন প্রবীণ নারী ও পুরুষদের দুর্দশা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁচেছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রবীণ পুরুষদের চেয়ে প্রবীণ নারীরাই বেশি দুঃখ-কষ্ট-বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন এবং হচ্ছেন। অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তিই অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ প্রবীণ। এ দেশ এ সমাজের জন্য যারা একসময় বিরাট অবদান রেখেছেন, দেশের অর্থনীতিকে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে আসার পেছনে যারা তাদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছেন, দেশ-সমাজ গড়ার কারিগর ছিলেন, সর্বোপরি পরিবারে যাদের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য—আজ তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। তাদের কথা তেমন করে এ সমাজ বা পরিবার ভাবে না। মানবজাতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ধক্য। বার্ধক্য মানবজীবনের প্রধান চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন, সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সহনশীল আচরণ করার জন্য এবং এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ১ অক্টোবরকে আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে কাজের কাজ কিছুই হয় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্যানুসারে ২০৩০ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ হবে প্রবীণ। ২০২৫ সালে এ সংখ্যা হবে ২ কোটি ৮০ লাখ এবং ২০৫০ সালে হবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ প্রবীণ। আমাদের সমাজে প্রবীণরা অবহেলিত, নির্যাতিত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। অথচ আমরা অনেকে ভুলে যাই যে, বার্ধক্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। বেঁচে থাকলে বার্ধক্যের স্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। বার্ধক্য মানবজীবনের অনিবার্য পরিণতি। এ বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মটা অধিকাংশ প্রবীণের জীবনে বয়ে আনে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট। আজ যারা নবীণ, তাদের অনেকেই প্রবীণদের যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা প্রদর্শন করে না।

আমাদের সংবিধানে জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ বেশ কয়েকটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা আছে। কিন্তু বাস্তবে প্রবীণ জনগোষ্ঠী কি এসব মৌলিক অধিকার বা সুবিধাগুলো যথাযথভাবে পাচ্ছে বা ভোগ করছেন? বিজ্ঞানপ্রযুক্তি তথা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নের ফলে আমাদের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় একদিকে শিশুমৃত্যুর হার কমছে, অন্যদিকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা হলো জনসংখ্যার বার্ধক্য। এটি আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার কতটা প্রস্তত? এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে

সরকারকে চলমান করোনা পরিস্থিতি, চিকিৎসা এবং দুর্মূল্যের বাজারকে বিবেচনায় নিয়ে প্রবীণদের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে সার্বজনীন বয়স্কভাতা এবং সার্বজনীন চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে । শুধু তা-ই নয়, করোনার ক্ষতিকর মারাত্মক প্রভাব যে কতটা ভয়াবহ, মানুষকে কতটা পঙ্গু আর নিষ্ক্রিয় করে দেয়, করোনাপরবর্তী সময়ে এর জটিলতা শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারেন, যারা একবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাই করোনাপরবর্তী যারা বেঁচে আছেন, তাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়টিও সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। তা না হলে কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমরা দ্রুত সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারব বলে মনে হয় না। এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১০০ কোটিতে পৌঁচেছে। অথচ ১৯৫০ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ কোটি। বাংলাদেশে এ সংখ্যা এখন প্রায় দেড় কোটি। বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপ্রবণ দেশে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ বিভিন্ন সমস্যায় প্রবীণেরা প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছেন। বিশেষ করে পুরুষ প্রবীণদের চেয়ে প্রবীণ নারীরা দুঃখ-কষ্ট-বৈষম্য-বিড়ম্বনার শিকার হন বেশি। সামাজিক ও পারিবারিক কারণে প্রবীণ নারীরা অর্থ-সম্পদহীন হওয়ায় শুধু জীবনের শুরুতেই নয় শেষ জীবনেও বিড়ম্বনার শিকার হন আরও বেশি। তাই তো করোনাকালীন প্রবীণ নারী ও পুরুষের দুরবস্থা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটি কমবেশি সবাই জানে। নতুন করে বলার কিছু নেই।

বর্তমান সরকার প্রবীণদের সার্বিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালে পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ ও প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময় সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বিগত আট বছরেও এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। এ নীতিমালা সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। ১৯৮২ সালে প্রবীণবিষয়ক সম্মেলন ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বার্ধক্য, স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা একাকীত্ব ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু বাস্তবতা হলো ২০২১ সালে এসেও প্রবীণেরা তাদের সামাজিক মর্যাদা বা স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রবীণ নারী-পুরুষেরা করোনার প্রথম ধাপে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। উন্নত বিশ্বের বড় দেশগুলো পৃথিবীতে হানাহানি করার জন্য আনবিক বোমাসহ বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র তৈরি করছে, কিন্তু বিগত দেড় বছর ধরে চলা এই অণুজীবের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা এখনো কেউ অবিষ্কার করতে পারছে না। ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এটি আদৌ কোনো কাজ করছে বলে মনে হয় না। কারণ, করোনা মোকাবিলায় ডাবল ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েও করোনা আক্রান্ত মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।। মুখে মাস্ক পরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরও আক্রান্ত হচ্ছে। করোনার ভয়ে পারিবারিক সামাজিক যোগাযোগসহ সব ধরনের যোগাযোগ, আনুষ্ঠানিকতা দীর্ঘদিন ধরে প্রায় বন্ধই ছিল। এখন পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতে সবসময় একটা আতঙ্ক, আশঙ্কা কাজ করে। এটি এমনই এক ভাইরাস, যা পারিবারিক-সামাজিক সামাজিকতাসহ সব বন্ধনকে নষ্ট করে দিয়েছে। পরিবারের স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হত্যা করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসার জায়গাগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে। মানুষের দুর্দশা ও দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হাসপাতালগুলো তাদের রমরমা ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে। আইসিইউতে রাখা রোগীর বিল দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। যাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল

না তারা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। বিরাট অংকের বিলের ভয়ে রোগীকে হাসপাতালে নিতেও স্বজনেরা দ্বিধাগ্রস্ত। সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষগুলো।

করোনা আমাদের অর্থনৈতিকভাবে অনেক দুর্বল করে দিয়েছে। দারিদ্র্যের হার আগের চেয়ে বেড়েছে। আয় বৈষম্য বেড়েছে। জীবনযাত্রার মানের অবনতি হয়েছে। অনেকের আয় রোজগার নেই। তার ওপর ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। বাজারে প্রতিটি পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। তারপরও চড়া মূল্য কেনা পণ্যের প্রায় সবটাই ভেজালে ভরা। ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জন্য চিকিৎসা এখন বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। জানা যায়, দেশে ৮৬ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা নেয় বেসরকারি হাসপাতাল থেকে। বাকি ১৪.৪১ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতালে যায়। সরকারি হাসপাতালগুলো থেকে যথাযথ সেবা পায় না বলে চিকিৎসা ব্যয় বেশি হলেও নিরুপায় হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়। এ কারণে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে প্রতিবছর ৮৬ লাখেরও বেশি মানুষ আর্থিক দিক থেকে দুরবস্থার শিকার হচ্ছে। ফলে ৩ কোটিরও বেশি মানুষ প্রয়োজন হলেও চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে হাসপাতালে যান না বা যেতে পারেন না।

ব্রিটিশ সরকার এ দেশে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন প্রথা চালু করলেও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো ভাতা প্রচলন করেনি। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার দুস্থ ও বয়স্ক প্রবীণদের জন্য সার্বজনীন ভাতার প্রচলন করে এবং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৫৯ বছর করে। সরকার দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বয়স্কভাতার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এখানেও অনেক শুভঙ্করের ফাঁকি। এর বাইরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং অবসরপ্রাপ্ত যেসব প্রবীণ রয়েছেন, যারা অর্থকষ্টে পড়ে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে? সমাজে অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রবীণ রয়েছেন, যারা তাদের মেধা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজের ও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে চান—তাদের কথা সরকার ভাবছে না। অথচ আমাদের পাশ্ববর্তী দেশে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের জাতীয়পর্যায়ে তালিকা করে 'মেনটর' হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে করে তারা নিজেদের কর্মে নিয়োজিত করার পাশাপাশি পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারেন। সমাজে তারা আর বোঝা হিসেবে বিবেচিত হন না। মানসিক দিক থেকেও তারা আর নিজেদের পরিবার বা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় বা বোঝা মনে করেন না। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও মেধাসম্পন্ন প্রবীণদের কাজে লাগাতে হবে। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে হাসপাতালগুলোতে প্রবীণ কর্নার স্থাপন এবং আসন বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ করোনাকালীন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন এই প্রবীণ জনগোষ্ঠী। পাশাপাশি প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে এবং পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। রেলসহ গণপরিবহণে প্রবীণদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রবীণেরা সমাজে বোঝা নয়, তারা সম্পদ—এ বিষয়টি সবাইকে বোঝাতে হবে।

করোনার সময়ে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান

ইউএনএফপিএ, ইউএন উইমেন এবং ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের সমীক্ষা অনুসারে করোনার প্রভাবে আনুষ্ঠানিক খাতে বাংলাদেশের নারীদের কাজের সুযোগ কমেছে ৮১ শতাংশ। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষার মতে, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ১৪ শতাংশ। আনুষ্ঠানিক খাতে ২৪ শতাংশ নারী কাজ করার সুযোগ হারিয়েছেন। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নারীরাই বেশি কাজ করছেন। অর্থাৎ নারী উদ্যেক্তার সংখ্যাই সব থেকে বেশি। নারীরা ঘরে বসে স্বচ্ছন্দ্যে-নির্বিঘ্নে কাজ করেন। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে ঘর থেকে বের হতে না পারায় যোগাযোগের অভাবে তারা তাদের কাজের সুযোগ হারিয়ে বিরাট আর্থিক সংকটে পড়েন। বিশেষ করে নারী নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলোর দুর্দশা ছিল সীমাহীন। এর সাথে সাথে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সন্তানদের শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় এক অনিশ্চিত জীবনের আশংকায় দিন অতিবাহিত করা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে সরকার ২০০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করলেও মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫ শতাংশ, যা একবারেই অপ্রতুল।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এটা আমরা সবাই জানি। পাঁচ দশকের ব্যবধানে এই খাতের রপ্তানি আয় প্রায় ৯৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের অধিকাংশই নারী। প্রায় ৪০ লাখ গ্রামীণ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সহযোগী শিল্পের বিকাশসহ অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এই পোশাক শিল্প। চীনের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তনিকারক দেশ হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এই পোশাক শিল্প। অথচ করোনায় এই নারীকর্মীরা গৃহবন্দী হয়ে কেউ বা চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবন পার করছেন। করোনা সংকট মোকাবিলায় কর্মসংস্থানের জন্য ২ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে এমনিতেই নারীর অংশগ্রহণ কম তার ওপর করোনার থাবা এই অংশগ্রহণ আরও সংকুচিত করেছে। আমাদের দেশে অনেক যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন নারী ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চান। কিন্তু পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা এবং সন্তান দেখভালের অনিশ্চয়তার কারণে তা পারেন না। এ জন্য অর্থনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সাথে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাণিজ্যিক খাতে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ নারীরা যে খাতগুলোতে বেশি নিয়োজিত সে খাতগুলোতেই করোনার প্রভাব বেশি পড়েছে। এ নিয়ে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মসংস্থান বাড়াতে বিনিয়োগের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে শ্রমঘন শিল্পখাতে বেশি জোর দিতে হবে। তা না হলে জনশক্তি সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সেইসাথে যেহেতু করোনায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেহেতু এই দুই শ্রেণির জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের মোট জনশক্তি ১৬ কোটি ৮২ লাখ। এর মধ্যে কর্ম উপযোগী মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৯১ লাখ। কাজে নিয়োজিত আছেন ৬ কোটি ৮ লাখ মানুষ। বাকি ৪ কোটি ১১ লাখ মানুষ কাজের বাইরে আছেন বা বলা যায় বেকার। কৃষিতে নিয়োজিত আছেন ২ কোটি ৪৭ লাখ। যাদের বেশির ভাগই সারাবছর কাজ পান না। শিল্পে নিয়োজিত আছে ১ কোটি ২৪ লাখ এবং সেবা খাতে আছে ২ কোটি ৩৭ লাখ। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ৩টি খাতই, যাদের মধ্যে নারীশ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রায় ৩৬ শতাংশ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ১৮

শতাংশ কাজে ফিরে যেতে পেরেছেন। বাকি ১৮ শতাংশ কাজে ফিরে যেতে পারেননি। করোনাপরবর্তী উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলে কিছুটা হলেও হয়তো মানব উন্নয়ন সম্ভব হবে।

করোনাপরবর্তী অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়-প্রতিকারসমূহ

১. করোনার প্রভাবে যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্মে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য করোনা-উত্তর দেশে বিনিয়োগে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. প্রণোদনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠুভাবে এবং যথাযথভাবে বিতরণ করতে হবে।

৪. করোনাকালীন হাসপাতালগুলোর সংকট মোকাবিলার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সারা দেশে হাসপাতালগুলোর আইসিইউর বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এককথ ায় স্বাস্থ্য খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রবীণ নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

৬. প্রবীণদের কর্মে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসহ উন্নত দেশসমূহে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে, আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ এবং প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অবিলম্বে যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. বয়স্ক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র প্রবীণ ছাড়াও যেসব প্রবীণ ব্যাক্তি রয়েছেন, যারা বয়স্ক ভাতার আওতায় পড়েন না, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. প্রবীণ কল্যাণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে।

১০. ষাট বছর বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিদের সিনিয়র সিটিজেন কার্ড প্রদান এবং সরকারি-বেসরকারিপর্যায়ে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করতে হবে।

১১. প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও দুস্থ মহিলাদের সুবিধাদি প্রদানের সাথে সাথে তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. নারীর পারিবারিক কাজের মূল্যায়ন করার পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, সম্মান, ও মর্যাদা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বাস করে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, গ্রামের অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্যসেবা থেকে প্রায় বঞ্চিত। এ জন্য গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সেবা, কর্মী ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি-উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. শুধু শহরকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো উন্নয়ন না করে গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

১৫. মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমকে সোচ্চার হতে হবে এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৬. করোনাপরবর্তী দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে হবে।

১৭. স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

১৮. ওষুধের সহজলভ্যতা, মূল্যহ্রাস ও চিকিৎসার মান নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. গরিব ও নিম্ন আয়ের রোগীদের বিশেষ করে প্রবীণ নারী ও পুরুষদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০. সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ ও অস্ত্রপচারের অস্বাভাবিক চিকিৎসা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে রোগীর নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

২১. স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন খাতের সীমাহীন দুর্নীতি রোধ করে করোনাকালীন বিপর্যস্ত জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। দুর্নীতি জিরো টলারেন্সে আনতে না পারলেও সহনীয় পর্যায়ে আনার ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাগুলোকে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে।

২২. সর্বোপরি দুর্নীতিকে নির্মূল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন। এটি করতে পারলে একদিকে যেমন মানব উন্নয়ন সম্ভব হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশের অথনীতিতে আবার গতিশীলতা ফিরে আসবে।

তথ্যসূত্র

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, ঢাকা; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত তথ্য

দৈনিক যুগান্তর ০৯.১০.২০২১ সহ বিভিন্ন সময়ে প্রকশিত দৈনিক যুগান্তরসহ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্রিকায় সংগৃহীত তথ্য ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ প্রতিবেদন ২০২০ ও ২০২১

সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৭

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০১২-২০৩২

দ্য ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৯১-২০২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব: বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা

হান্নানা বেগম*

পূর্বকথা

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৫। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০২০ সালে বাংলাদেশ দুই ধাপ উপরে উঠে ১৩৩তম স্থান লাভ করে। ২০২০ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫০। মহামারি আসার পরে ২০২১ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে, ৬৫-এ দাঁড়ায়। সুতরাং আশঙ্কা করা যেতে পারে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অনেক অর্জনকেই ম্লান করে দিতে পারে।

আমাদের দেখতে হবে একটি রাষ্ট্রে তথা বিশ্বে জেন্ডার সমতার গুরুত্ব কতখানি এবং এক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তার গভীরতা কত? তবে এটি নিশ্চিত যে আমরা যদি এই তথ্য বিশ্লেষণে যাই, এ থেকে আমাদের আগামীর পথচলার নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা অর্জনে কতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, তা তুলে ধরা। এটি কোনো গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ক তথ্য ও গবেষকদের মতামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি এ উপস্থাপনা করছি।

এ বছরের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস যে বাণী দিয়েছেন তার মর্মকথা হলো, কোভিড-১৯ মহামারি জেন্ডার সমতার কয়েক দশকের অগ্রগতি বিনষ্ট করে ফেলেছে। তিনি বলেন, "কর্মহীনতার উচ্চহার থেকে শুরু করে অবৈতনিক সেবার ব্যাপক বোঝা, স্কুল বিঘ্নিত হওয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক সহিংসতা ও শোষণের ক্রমবর্ধমান সংকট পর্যন্ত নারীদের জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও অধিকার হয়েছে বিঘ্নিত। মায়েরা বিশেষ করে একক নারীপ্রধান পরিবারের মায়েরা তীব্র উদ্বেগ এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। এর পরিণতি মহামারি শেষ হওয়ার পরও বহু দিন চলতে থাকবে।"

* অধ্যক্ষ (অব.), ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ। ই-মেইলঃ hannanabegum@yahoo.com

তবে মহামারি মোকাবিলায় নারীরা প্রথম সারির ভূমিকা পালন করছেন। মহামারির এই সময়ে তারা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অর্থনীতি, সম্প্রদায়সমূহ এবং পরিবার একত্রে ধরে রাখার জন্য অত্যাবশ্যক কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, তারা সেইসব নেতাদের অংশীজন, যারা মহামারির প্রসার হ্রাস করেছে এবং দেশগুলোকে এর ক্ষতি থেকে উত্তরণে ভূমিকা রেখেছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি নারীদের সমান অংশীদারিত্বের রূপান্তরকারী শক্তিকে তুলে ধরে তিনি বলেন, “এ বিষয়টি জাতিসংঘে আমরা নিজেরাই অবলোকন করছি, এবং আমি গর্বিত যে আমরা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের উচ্চ নেতৃত্বে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছি। এর প্রমাণ স্পষ্ট।” নারী নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, “নারী যখন সরকারে নেতৃত্ব দেয়, তখন আমরা সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ করি। নারী যখন সংসদে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন জাতি আরও কঠোর জলবায়ু নীতি গ্রহণ করে। নারী যখন শান্তির আলোচনায় অংশ নেয়, তখন চুক্তিগুলি আরও স্থায়ী হয়। এবং এখন যখন জাতিসংঘের শীর্ষ নেতৃত্বে নারীরা সমান সংখ্যায় কাজ করছেন, আমরা শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য আরও বেশি সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ অবলোকন করছি।”

তবে জেন্ডার সমতা স্থাপনের জন্য পুরুষদের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে মহাসচিব বলেন, পুরুষ-অধ্যুষিত সংস্কৃতির সাথে একটি পুরুষ-অধ্যুষিত বিশ্বে জেন্ডার সমতা মূলত শক্তির একটি প্রশ্ন। নারীদের সমান অংশগ্রহণকে এগিয়ে নিতে এবং দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কোটা স্থাপন করার জন্য দেশসমূহ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলোকে আহ্বান জানান তিনি। মহামারি থেকে পুনরুদ্ধার হওয়ার সময় সমর্থন ও প্রণোদনা প্যাকেজগুলো অবশ্যই নারী এবং কন্যাশিশুদের লক্ষ্য করে তৈরির পরামর্শ দেন, যার মধ্যে রয়েছে নারী মালিকানাধীন ব্যবসাসমূহ এবং সেবাভিত্তিক অর্থনীতি।

মহামারি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আমাদের অসমতার প্রজন্মকে পেছনে ফেলে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশ পরিচালনা, ব্যবসা অথবা যেকোনো আন্দোলন হোক, নারী সব ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখছে, যা সবার জন্য সহায়ক এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, “সকলের জন্য সমান ভবিষ্যৎ গড়ার এখনই সময়। সবার কল্যাণের জন্য কাজটি করা সবার দায়িত্ব।”

জাতিসংঘের মতে, গত ৭৫ বছরে বিশ্ব এ ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়নি। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) বর্তমান পরিস্থিতিকে একটি নতুন মন্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং ২০০৯ সালের ইউরোপের আর্থিক সংকটের সাথে এটির তুলনা করেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে সাথে মহামারিটি উন্নয়ন, সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সাল থেকে গোটা পৃথিবী শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহতম সময় পার করছে। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক যে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো এখনো এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লড়াই করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ মোকাবিলায় লড়াই করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

যেহেতু প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলাদা, সেহেতু কোভিড-১৯ দ্বারা সকল দেশ একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মহামারিটি দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। করোনা চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সরবরাহ না থাকায় এবং টেস্ট কিটের অভাবে দরিদ্র দেশগুলো করোনার যুদ্ধে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলিতে পর্যটন, ভ্রমণ ও দেশীয় বাণিজ্য খাতে উৎপাদন মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে। গবেষণাপত্রে অনুমান করা হয় যে, মহামারিটির অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪৭ বিলিয়ন ডলার যা বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ০.১ শতাংশ থেকে ০.৪ শতাংশ (ADB 2020)। মহামারি চলাকালীন সময়ে এশিয়ার দেশগুলি প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে (ADB 2020)। অনুমানগুলো এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী বিশাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটবে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের (বিআইডিএস) বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষায় “বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ’ শিরোনামে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাতেমা রৌশন জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; খান তাহদিয়া তাসনিম মৌ, মাস্টার্স শিক্ষার্থী, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; নাজিয়া নাজনিন, মাস্টার্স শিক্ষার্থী, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই গবেষণা প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারি কীভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং বাংলাদেশের মানুষ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তিত করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা এবং এই পরিবর্তনকে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। তাদের মতে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত লকডাউনের কারণে দেশের স্থানীয় উৎপাদন ও বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে; দ্বিতীয়ত: তৈরি পোশাক খাতে (আরএমজি) রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। মহামারি চলাকালীন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়েছে এবং নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উত্থান দেখা দিয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব

দেশের রপ্তানি খাতের ৮০ শতাংশই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) থেকে আসে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প করোনা সংকটে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০২০-এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে পোশাকখাতে মোট ২.৩ বিলিয়ন অর্ডার বাতিল করা হয়। অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক পোশাক কর্মী তাদের চাকরি হারান। অনেক পোশাক কারখানা কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই তাদের কর্মীদের চাকরিচ্যুত করে। পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল ওয়াকার্স রাইটস্ এবং ওয়ার্কার্স রাইটস্ কনসোর্টিয়াম ডব্লিউআরসি কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্ডার বাতিলের কারণে বাংলাদেশে ১ মিলিয়নেরও বেশি পোশাক শ্রমিকের চাকরি চলে গেছে। ২৫ মার্চ ২০২০-এ বাংলাদেশ সরকার পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাবদ ৫৮৮ মিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন প্যাকেজ এবং বেল আউটের জন্য ৭৭,৭৫০ কোটি টাকার ফান্ড ঘোষণা করে। এই প্যাকেজটি শ্রমিকদের জন্য কেবল এক মাসের বেতনের সংস্থান করতে পারে। এটি ছাড়া শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় কোনো সুরক্ষা নীতি নেই, যেখানে তারা নির্ভর করতে পারে। (সিদ্দিকী ২০২০)।

একই গবেষণায় ২০২০ সালের অক্টোবরে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, তৈরি পোশাক কারখানাগুলো মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে তাদের জনশক্তি ৮ শতাংশ কমিয়ে দেয়, আর চাকরি হারানো পোশাক কর্মীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৬১ শতাংশ। কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার আগে

তৈরি পোশাক কারখানায় মহিলাদের সামগ্রিক অনুপাত ছিল ৬২ শতাংশ। এটি এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৫৭ শতাংশে। (AHMED 2021)।

আমরা দেখেছি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কৌশলটি ছিল ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাময়িকভাবে পোশাক কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। পরবর্তীতে পোশাক শিল্প রক্ষার লক্ষ্যে কারখানাগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যবসায়ি, কর্মীরা এবং কারখানার মালিকরা এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেও মানবাধিকার কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে।

কোভিড-১৯ এর জেন্ডার তাৎপর্য

হেলেন লুইস তাঁর রচিত গ্রন্থ "Difficult Women: A History of Feminism in 11 Fights"-এ যুক্তি দিয়েছেন, যেকোনো মহামারি পুরুষ ও নারীদের ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে উইলিয়াম শেকস্পিয়র এবং আইজ্যাক নিউটনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা ১৬৬০ সালে ইংল্যান্ডে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় তাদের সবচেয়ে ভালো কাজ করেছিলেন। হেলেন উল্লেখ করেন যে, পুরুষ ব্যক্তিরা তাদের সময়কে ব্যবহার করতে পারে সৃজনশীল কাজে। কারণ তাদের সন্তানদের লালনপালন ও যত্ন নেওয়াসহ কোনোও গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজের দায়িত্ব নিতে হয় না। শেকস্পিয়র প্লেগের সময় লন্ডনে একা থাকতেন, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা প্লেগের সময় ওয়ারউইকশায়ারে অবস্থান করছিলেন। নিউটন এ সময়টাতে অবিবাহিত ছিলেন।

করোনাকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বর্তমান পরিস্থিতির আরও জটিল রূপ পরিলক্ষিত হয়। করোনাসংকট বাংলাদেশি নারীদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং শ্রমবাজার ও গৃহ উভয় ক্ষেত্রেই জেন্ডার সম্পর্ককে পরিবর্তন করেছে। জরুরি অবস্থার মধ্যে বেশির ভাগ আইনি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নারীরা একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছে। লকডাউন শুরু হওয়ার সাথে সাথে এটি দরিদ্র শ্রমজীবী সমাজের নারীদের, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করেছে। গর্ভবতী নারী এবং শিশুরা খাদ্য ও পুষ্টি সংকটে পড়েছে, যা মা ও শিশুদের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে তুলেছে (প্রথম আলো, ৩০ জুলাই, ২০২০)।

নারীর প্রতি সহিংসতা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশ করে যে, ১৪টি দেশীয় পত্রিকা এর তথ্যনুসারে ২০১৯ সালে ৪,৬২২ জন নারী ও মেয়ে শিশু সহিংসতার শিকার হন (দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২০২০, জানুয়ারি মাসের অনলাইন রিপোর্ট)। করোনা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পর চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৬ মার্চ থেকে ৩ জুনের মধ্যে সহিংসতার মোট ১৯৭টি মামলা করা হয়েছিল। মামলার মধ্যে ৫৬টি ধর্ষণের মামলা, ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এমন মামলা ১৪টি, যৌতুক সম্পর্কিত সহিংসতা মামলা ৫১টি, অপহরণের মামলা ৩৬টি, যৌন হয়রানির ঘটনা ১৮টি এবং শারীরিক সহিংসতার ঘটনা ৭টি (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ জুন, ২০২০)। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মহামারির জন্য বাইরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করায় তারা নারীদের প্রতি সহিংসতাসম্পর্কিত মামলায় কম মনোযোগ দেন। মহামারি ছড়িয়ে পড়ার পরে আদালতও কয়েক মাস বন্ধ ছিল। এসব ঘটনা নারীদের পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করেছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, লকডাউন সময়কালে দেশে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'বিশ্বে এই করোনার সময় লকডাউনে নারী নির্যাতন ২০ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। তিনি বলেন, "এই সময় নারীর অভিযোগ জানানোর সুযোগ কমে গেছে। সে ঘরের বাইরে যেতে পারে না। আবার স্বামীসহ সবাই ঘরে থাকায় টেলিফোনেও অভিযোগ করতে পারেন না।" মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অর্পিতা দাশ বলেন, "আমরা ১৬৭২ জন নারীকে পেয়েছি, যারা আগে কখনো নির্যাতনের শিকার হননি। এটা প্রমাণ করে যে লকডাউনের মধ্যে নির্যাতন বাড়ছে। আর এই নির্যাতনে স্বামীরাই প্রধানত জড়িত। কারণ, তাদের কোনো কাজ নেই। অধিকাংশের আয় নেই। খাবার নেই। তারা বাইরে যেতে পারছে না, আড্ডা দিতে পারছে না। এই সবকিছুর জন্য তারা আবার নারীকেই দায়ী করছে। নারীকে দায়ী করার এই মানসিকতার পেছনে নির্যাতনের প্রচলিত মানসিকতাই কাজ করছে। এর বাইরে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ভূমিকা আছে।" লকাডাউনের মধ্যে বাল্যবিবাহের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রথমত করোনার কারণে মানুষের দারিদ্র্য বেড়েছে। তাই অভিভাবকেরা বিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য থেকে বাঁচার হয়তো একটা পথ খুঁজছেন। আর এই সময়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচার এবং তৎপরতার কমে যাওয়ায় এটাকে কেউ কেউ সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।"

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে হটলাইন ১০৯ ও পুলিশি সহায়তার জন্য ৯৯৯ কে আরও বেশি কার্যকর করা। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীরা যাতে আশ্রয় পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা। করোনা পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল চলমান রাখার জন্য 'ভার্চুয়াল কোর্ট অর্ডিন্যান্স' দ্রুত পাস করা।

ইউএনএফপিএ: ইউএনএফপিএর হিসাব অনুসারে করোনাকালীন পারিবারিক সহিংসতা বিশ্বজুড়ে ২০ শতাংশ বেড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে লকডাউনের প্রথম সপ্তাহে ৯০,০০০ এরও বেশি অভিযোগ লিঙ্গ বা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ৭ মে, ২০২০)। পারিবারিক সহিংসতা ফ্রান্সে ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যে লকডাউনের প্রথম চার সপ্তাহে ১৩ জন নারী নিহত হয়েছেন। গার্ডিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনলাইনে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করার হার বিশ্বব্যাপী ১২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও মহিলাদের হয়রানি ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন অক্টোবর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২০-এর মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে করা টুইটের সংখ্যা ৯৩ শতাংশ বেড়েছে (Ahmed 2021)।

এসটিইপিএস গবেষণা: বাংলাদেশেও মহামারিকালীন লিঙ্গ বা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। এসটিইপিএস পরিচালিত ৭,০০০ গ্রামীণ পরিবার নিয়ে কেস স্টাডি করে দেখা গিয়েছে, মোট ৪,৫০০ পরিবারের নারীরা সহিংসতার শিকার হয়েছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ৩ জুলাই, ২০২০)। কর্মসংস্থানের অভাব, আয় হ্রাস, ব্যবসা বন্ধ, খাদ্যের অভাব এবং পারিবারিক ঋণ বৃদ্ধিসহ নানান কারণে দেশে পারিবারিক সহিংসতা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ব্র্যাক কর্তৃক ১১টি জেলায় নারীদের অবস্থা নিয়ে পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৩২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, তাদের পরিবারে চাকরি ও আয় হ্রাসের কারণে গৃহকর্মী সহিংসতা বেড়েছে। দেশে যদিও মাত্র ৯০টি ভিকটিম সেন্টার রয়েছে, মহামারির কারণে সবই বন্ধ হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ ভুক্তভোগী নারীদের বাড়িতে থাকায় সহিংসতার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে।

টিআইবি: টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন যেমন অসম্ভব, তেমনি নেতৃত্বে

নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া জেন্ডার সমতা ও সুশাসন নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়।" চলমান কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে ড. জামান বলেন, করোনা অতিমারি থেকে উত্তরণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমানতালে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অনেক; সম্প্রতি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণাদায়ী নারী নেতৃত্বের স্বীকৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু এমন সময়েও নারীদের প্রতি সহিংসতা কিংবা নারীদের অবদমনের প্রক্রিয়া বন্ধ নেই।

টিআইবির এক বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, কোভিড-১৯ অতিমারিকালে ৩০ দশমিক ৫৪ শতাংশ নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ২২ দশমিক ৯৯ শতাংশ নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, ৭৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ নারীর দৈনন্দিন জীবনাচার নিয়ন্ত্রণ এবং ৩৫ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ নারী অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। আর ৪৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ নারী শারীরিক ও যৌন উভয় ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকায় এবং পারিবারিক উপার্জন হ্রাস পাওয়ায় বাল্যবিবাহ এবং ঝরে পড়া নারী শিক্ষার্থীর হার বাড়ছে। অথচ টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন জরুরি।

ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ এ নারীদের সমঅধিকার এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই সব পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন অর্জন অসম্ভব।

গৃহস্থালি, সেবা ও অবৈতনিক কাজের ভার

বিশ্বের অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনযাত্রা প্রায়শই নারীর অবৈতনিক কাজের ওপর নির্ভর করে। মহামারির আগে বিশ্বব্যাপী নারীরা অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজের দুই-তৃতীয়াংশ করতেন (UN Women 2020)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লকডাউন, সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা এবং স্কুল বন্ধ থাকায় নারীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ায় প্রায় ৪২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী ঘরে অবস্থান করে। ফলে নারীর ওপর গৃহস্থালি কাজ এবং শিশুযত্নের অতিরিক্ত চাপ পড়ে (UNICEF 2020)। ব্র্যাক পরিচালিত জরিপ অনুসারে, মহামারি চলাকালীন ৯১ শতাংশ নারীর অবৈতনিক কাজের পরিমাণ বেড়েছে (দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জুন, ২০২০)। প্রায় ৮৯ শতাংশ মহিলা কোনোও অবসর সময় পান না। স্কুল বন্ধ হওয়ায় যেসব মেয়েশিশুর ছোট ভাইবোন আছে তাদেরও অবৈতনিক কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ইউএন ওমেনের 'কোভিড-১৯ বাংলাদেশ র‍্যাপিড জেন্ডার বিশ্লেষণ' শীর্ষক এক প্রতিবেদন অনুসারে, লকডাউন সময়টি মহিলাদের বাড়িতে থাকার জীবনকে আরও করুণ করে তুলেছে, নারীর ভোগান্তি বাড়িয়ে তুলেছে এবং এতে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মহামারির আগে মহিলারা ঘরের পুরুষদের তুলনায় ৩.৪৩ গুণ বেশি কাজ করেছেন। যেহেতু স্কুল বন্ধ এবং পরিবারের সমস্ত সদস্য বাড়িতে, সেহেতু মহামারির সময় মহিলাদের অবৈতনিক কাজ অনেক বেড়ে গেছে। লকডাউন পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক ফলাফল নিয়ে এসেছে। অনেক পুরুষ গৃহকর্মের কাজ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে, কিন্তু লকডাউনের সময় বেশির ভাগ গৃহস্থালি কাজ সম্পাদন করেছে নারী। পুরুষেরা ঘরে থাকার সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল ও শখের কাজে মনোনিবেশ করেছে, যেমন কবিতা এবং ছোটগল্প লেখা এবং ফেসবুকে লাইভে যোগদান। অন্যদিকে নারীরা কোনো শখের জন্য ব্যয় করার সময় খুব কমই পান। মহামারি চলাকালীন কোনো গৃহকর্মীর সহায়তা না থাকায়

শ্রমজীবী মহিলাদের রান্না করা, পরিষ্কার করা, শিশু ও বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়াসহ সব গৃহস্থালির কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। শ্রমজীবী মহিলাদের ওপর অবৈতনিক কাজের অতিরিক্ত বোঝা প্রায়ই বৈবাহিক বিরোধ ও পারিবারিক সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ সাক্ষাৎকার: হোসেন জিল্লুর রহমান

নারীর সমতা ও দারিদ্রের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব নিয়ে কথা বলেছেন অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান। তিনি বলছেন, পরিকল্পনা কমিশনের জন্য একটি নীতিপত্র তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় পরিবার পরিকল্পনা সেবা অনেকাংশে ভেঙে পড়েছিল। এমনকি শুধু বেসরকারিই নয়, সরকারি সেবার ক্ষেত্রেও তাই। এ ছাড়া নারীরা বেশি কাজ করেন সেবাখাতে, যেটি বিশাল ধাক্কা খেয়েছে। পিপিআরসি এবং বিআইজিডি গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় নারীদের জীবিকা ফিরে পাওয়া কঠিন হচ্ছে, যা প্রধান কারণ নারীর পেশার ধরন। যেমন পোশাক শিল্পে যারা কাজ করতেন, তারা হয়তো অনেকেই ফিরে এসেছেন। যদিও বা করোনাকালীন সময়ে তাদের রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু যারা গ্রামে চলে গেছেন, তাদের ফিরে আসা কঠিন হচ্ছে। জীবিকা ফিরে পাওয়া নির্ভর করে কাজের ধরনের ওপর। যেমন রিকশাচালকেরা কাজ বন্ধ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু তারা আবার ফিরে এসেছে। অনেক নারী রাস্তার পাশে খাবার দোকান দিয়েছিলেন। ব্যবসাটি আবার সেভাবে চালু করা কঠিন। নারীদের অধিকাংশই অতিদরিদ্র, নিঃসহায় নারী, অনেকেই স্বামীর সাথে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন। এসব মহিলার ক্ষেত্রে আবার উঠে দাঁড়ানো বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে অন্য অংশটি দারিদ্র্যরেখার উপরে থাকা নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষ তারাও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত। তারা বর্তমানে নতুন দরিদ্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ ছাড়া গত বছরের মার্চ থেকে বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল বেতন দিতে পারছে না। কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যায়, এই খাতে কর্মীদের একটি বড় অংশ নারী। বিউটি পার্লারগুলো কর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই নারী। ধীরে ধীরে কিছু বিউটিপার্লার খুলছে। এ ছাড়া ছোট এনজিও, বিশেষত আঞ্চলিক এনজিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা সাধারণত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করতেন। তাদের তহবিল সংকট বেড়েছে। এদের বড় অংশ চাকরি প্রথমবারের মতো চলে গেছে হয়তো ফিরে পেতেও পারেন। বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত একটি সেবাদানকারী বড় খাত। এখন দেশজুড়ে অনেক বেসরকারি ক্লিনিক আছে। তাদের অনেকেই চাকরি ফিরে পাবেন কি না, সঠিক বলা যায় না। কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তরা চরম ক্ষতিতে পড়েছে। এদের ক্ষতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর সাথে নিয়োজিত নারী কর্মীরা।

আমরা দেখেছি, সরকার শিল্পের প্রণোদনা দিতে বেশ উদার হয়েছে। কিন্তু অনায়াসে বলা যায়, ঝোঁকটা ছিল বড় উদ্যোক্তাদের প্রতি। এক্ষেত্রে প্রণোদনা বিতরণের ভার দেওয়া হয়েছে ব্যাংককে। যেখানে নারীদের উপস্থিতি কম। নারী উদ্যোক্তাদের বড় সমস্যা হচ্ছে। তারা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। এক্ষেত্রে এসব নারীর সহযোগিতা দেওয়ার উপায় কী। উপায় হলো সরকারি সংগঠনগুলোকে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করা। প্রথমত, এ খাতে বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ দিতে হবে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে স্থানীয় সরকারকে। স্থানীয় সরকারের কাছে তথ্য থাকা স্বাভাবিক উচিতও বটে। সার্বিকভাবে সর্বত্রই মানবিক কাজে মানুষকে অগ্রগামী হতে হবে। আমরা দেখছি, বাজেটের মূল ঝোঁক সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা। সেই বরাদ্দ দুর্নীতি মুক্তভাবে সদ্ব্যবহার করা হলো কি না সেটি তদারকির জন্য বাজেট রাখা চাই।

করোনাকালে ব্যাংকে নারীর কর্মসংস্থান কমেছে

দেশের ব্যাংকিং খাতে নারী কর্মসংস্থান হারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে করোনা ভাইরাস। চলতি বছরের প্রথমার্ধে ব্যাংকে নারী কর্মসংস্থান উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ১ বছর আগের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশের বিপরীতে এ বছরের জুন পর্যন্ত নারী কর্মীর অনুপাত কমে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন সাদেকা হালিম বলেন, "করোনা মহামারিতে অনেক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করোনা সংকট মোকাবিলায় পরিবারের নারী সদস্যদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এ ছাড়া অনেক নারী চাকরিপ্রার্থী ব্যাংকে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পরিবারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাননি।"

শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণ

বিশ্বব্যাপী পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি চাকরি হারিয়েছেন। সিটিআই ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনানুষ্ঠানিক চাকরি খাতে ৪৪ মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে ৩১ মিলিয়ন নারী সম্ভবত তাদের চাকরি হারাবেন (বিজনেস ইনসাইডার, ২৫ মার্চ, ২০২০)। বাংলাদেশের লকডাউন নিম্ন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে সাধারণভাবেই নারীদের অংশগ্রহণের হার কম। ২০২০ সালে শ্রমবাজারে পুরুষদের অংশগ্রহণ ছিল ৮৪ শতাংশ, নারীদের মাত্র ৩৬.৪ শতাংশ (গঁলবৎর ২০২১)। করোনাকালীন লকডাউনের কারণে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার আরও কমে গেছে। তৈরি পোশাক খাতে বিপুলসংখ্যক পোশাক অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক নারীশ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মতে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাণিজ্যিক খাতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর অন্যতম কারণড়মহামারি দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেসব খাত বা সংস্থা যেমন টেক্সটাইল, পোশাক, জুতা ও টেলিযোগাযোগড়সেখানে নারীদের বড় একটি অংশ কাজ করে (ডব্লিউটিও ২০২০)। নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম উপার্জন করায় তা নারীদের দারিদ্র্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ইউএনএফপিএ, ইউএন-উইমেন ও ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে, করোনার প্রভাবে আনুষ্ঠানিক খাতে বাংলাদেশে নারীর কাজের সুযোগ কমেছে ৮১ শতাংশ, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ১৪ শতাংশ। এমনকি অনানুষ্ঠানিক খাতে ২৪ শতাংশ নারী কাজ করার সুযোগ হারিয়েছেন। উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় প্রায় ৩৭ শতাংশ নারী ঝুঁকির মধ্যে পড়েছেন, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ। সর্বোপরি, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে ১০ শতাংশ নারী পরিসেবা খাতগুলোতে বাণিজ্য বিঘ্নের কারণে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬ শতাংশ (অযসবফ ২০২১)। সেবাখাত, যেমন পর্যটন এবং ভ্রমণ পরিসেবা শিল্পে, নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়েও বেশি এবং করোনা মহামারিতে ভ্রমণ বিধিনিষেধ তাদের আয়ের উৎস বন্ধ করে দিয়েছে। নারীর আয়ের সুযোগ হ্রাসের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় বন্ধ এবং শিশুযত্ন সংস্থাগুলো অস্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া বড় প্রভাব ফেলেছে। এসব কারণে নারীর কাজের সময়সূচিতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমন তাদের কাজের সময়ও হ্রাস করতে হয়েছে। পাশাপাশি তাদের গৃহস্থালি ও সেবাকাজের পরিমাণেও বৃদ্ধি ঘটেছে।

নারী মালিকানাধীন বা পরিচালিত সংস্থাগুলোর একটি বড় অংশ হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এমএসএমই)। নিম্নস্তরের আর্থিক সংস্থান এবং সরকারি তহবিলের সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে এ ধরণের ব্যবসাগুলোতে ঝুঁকির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (সিএমএসএমই)

জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এসএমই ফাউন্ডেশন ২০২০ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বর মাসে ২২০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। তবে ২৮২ জন ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৫ জন মহিলা ছিলেন (অয়সবফ ২০২১)। গত বছরের অক্টোবরে ব্র্যাকের প্রকাশিত পৃথক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে ১ শতাংশ সরকারের দেওয়া প্রণোদনা প্যাকেজ সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেননি, ৪৪ শতাংশ প্যাকেজের আওতায় ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন এবং বাকি ব্যক্তিরা হয়রানির ভয়ে তা করা থেকে বিরত ছিলেন (Ahmed ২০২১)।

কোভিড-১৯ মহামারি গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদেরও বড় সংকটে ফেলেছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ উদ্যোক্তার মহামারিকালীন সময়ে কোনোও আয় হয়নি। কোনো আয় ছাড়া ছোট ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা বাঁচার তাগিদে তাদের বেশির ভাগ সঞ্চয় খরচ করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়, উদ্যোক্তাদের অনেককেই তাদের আগের গৃহিণী ভূমিকায় ফিরে যেতে হতে পারে। এটি গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে।

এক কথায় বলা যায়, কোভিড ১৯ বাংলাদেশ তথা বিশ্বময় মানুষকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করেছে। আমরা উদ্বিগ্ন। তার আগে আমাদের জানা দরকার আমাদের প্রকৃত শত্রু কে? এটি সত্য ঘটনা প্রকৃতি রুদ্র হয়েছে। রুদ্র প্রকৃতিকে শান্ত করতে হলে আমাদের জানতে হবে গোড়ার শত্রু প্রকৃতি অথবা আমাদের অসংযমশীল লোভ পিপাসাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। লেখক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "মানুষের ইতিহাস—তুলনামূলক সুস্থভাবে সুস্থ পরিবেশে টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষার লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। এ লড়াই-সংগ্রাম নিরন্তর। মানুষ এ লড়াই করেছে কখনও একা একা, কখনও বা যূথবদ্ধভাবে। এ লড়াইয়ের শুরুটা মানুষের সাথে মানুষের লড়াই দিয়ে নয়। শুরুটা সম্ভবত হয়েছিল মানুষের সাথে তার চারিপাশের প্রকৃতির সাথে; অসীম প্রকৃতিতে টিকে থাকার লড়াই। তবে আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতি ততক্ষণ মানুষের প্রতি বিরাগভাজন হয়নি, যতক্ষণ না মানুষ তাকে মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত করেছে, আসলে প্রকৃতি কখনও বিরাগভাজন হয়নি—সে তার নিজ নিয়মে কাজ করেছেমাত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সম্ভবত সবচেয়ে বড় লড়াইটার শুরু শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্তির উত্তরোত্তর অধিকতর প্রয়োজনীয়তা থেকে। এ লড়াইয়ের শুরুতে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রকৃতিই মানুষকে না চাইতেও খাইয়েছে। কারণ, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গাছের ফলমূল, তৃণলতা, পোকামাকড়, মৃত-জীবিত পশুপাখী, জলের মাছ, নির্মল বাতাস– এসব তো মানুষ না চাইতেই প্রকৃতিতে পেয়েছে। আর প্রাণিজগতে অন্যদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানেও তেমন কোনো বাধা ছিল না– প্রকৃতির দিক থেকে। আসলে মানুষ নিজেই এ বাধা সৃষ্টি করেছে– সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে, আর মানুষ সমুদ্রকে শত্রু ভেবেছে; জঙ্গলে আগুন ধরেছে, আর মানুষ আগুনকে শত্রু ভেবেছে; শৈত্য প্রবাহ হয়েছে, আর মানুষ শৈত্য প্রবাহকে শত্রু ভেবেছে; বন্যা হয়েছে, আর মানুষ বন্যাকে শত্রু ভেবেছে; আকাশে মেঘের গর্জনসহ তুমুল ঝড়বৃষ্টি হয়েছে, আর মানুষ তার মাথার উপরের আকাশকে শত্রু ভেবেছে। প্রকৃতিকে এই শত্রু ভাবা দিয়েই প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের শুরু। লড়াইটা বলা চলে একতরফা। কারণ—লড়াইটা ঘোষণা করেছে মানুষ– প্রকৃতি নয়। এ লড়াই নিরঙ্কুশ অসম লড়াই, এবং এ লড়াইয়ে মানুষ কোনো দিনও

জিতবে না—জিততে পারে না। কারণ আপনি আপনার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলেও করতে পারেন, কিন্তু কখনও জিতবেন না; আর জিতলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারাতে হবে অথবা নিজেকেই হারাতে হবে। প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রকৃতির বিরুদ্ধেই লড়াই ঘোষণা—মানুষের দিক থেকেই এক নিরঙ্কুশ অন্যায্য-অসম ঘোষণা। মানুষ হিসেবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে আমরা যে বোকামি করেছি, তা সম্ভবত কয়েক কোটি বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা বুঝিনি, বুঝতে চাইনি, বোঝার প্রয়োজনও বোধ করিনি। উল্টো আমরা প্রকৃতিকে বশ করতে চেয়েছি। অর্থাৎ যার অস্তিত্বের ওপর আমাদের নিজ অস্তিত্বটাই নির্ভর করছে—আমরা তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাকেই বশ করতে চেয়েছি। প্রকৃতিকে বশীভূত করার অবাস্তব এই প্রক্রিয়ায় আমরা লড়েছি প্রকৃতির আকাশ-মহাকাশ, আলো-বাতাস, জল-স্থল-ভূতল–সবকিছুর বিরুদ্ধে। অসীম প্রকৃতির অসীম হৃদয় আমাদের অন্যায় আচরণে বিরক্ত হয়নি। বিরক্ত হয়নি তার বিরুদ্ধে 'বোকা মানুষের যুদ্ধ' ঘোষণায়। কিন্তু, মানুষ নাছোড়বান্দা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে যখন কিছুই করা সম্ভব হয়নি, তখন 'বোকা মানুষ' নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফল হয়েছে আত্মধ্বংসী (self-destructing)। মানুষের নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধটা ঠিক সেই দিন-তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, যেদিন মানুষ মানুষেরই ওপর কর্তৃত্ব-আধিপত্য (domination-hegemony অর্থে) করতে চেয়েছে। আর এই কর্তৃত্বের শুরুটাই গায়ের জোর, বুদ্ধির জোর অথবা অন্য যা দিয়েই হোক না কেন তা বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হলো—"অন্যের শ্রমফল আত্মসাৎকরণ", অর্থাৎ 'মানুষের মানুষ শোষণ'। এটাই হলো মানব ইতিহাসের চরমতম প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণের নির্মোহ সত্য ইতিহাস। মানুষে-মানুষে শোষণ—মানুষের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব-আধিপত্যের একই সাথে কারণ ও পরিণাম। এই-ই সেই প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেরা নিজেদেরই সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়েছি—আর এ থেকেই প্রকৃতির সাথেও মানুষের চূড়ান্ত বিচ্ছেদের শুরু।"

ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে আরও বলছেন, "প্রকৃতির কাছে পরাভূত হয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রক্রিয়ায় যা করেছি, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম-ইতিহাস এ রকম: (১) শুরুতে আমরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ছোট-ছোট গোষ্ঠী বানিয়েছি; বানিয়েছি দলপতি, যার আদেশ-নির্দেশ মান্য করে যূথবদ্ধ জীবন যাপন করেছি; একপর্যায়ে দলপতি কিছু সম্পদের মালিক হয়েছেন—পরে আরো সম্পদের মালিক হয়েছেন—পরে আরো সম্পদের মালিকানার জন্য তার যা করার প্রয়োজন তাই-ই তিনি করেছেন—প্রয়োজনে প্রতিবেশী ছোট গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করেছেন—লড়াইয়ে জিতে পরাজিত গোষ্ঠীর সবকিছুর মালিক হয়েছেন। আর এখান থেকেই শুরু ভ্রাতৃসুলভ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভাঙন—শোষক-শোষিতে সমাজবিভক্তি।"

ড. বারকাত যথার্থই বলেছেন। সত্যিই, আমরা এখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধেই লড়াই করছি। কিন্তু নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছি জলবায়ু পরিবর্তনে। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি কনফারেন্স অব পার্টির (কপ-২৬) প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি নিয়ে। বিশ্বের উষ্ণতা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্বের মানুষ এখন ধ্বংসের মুখোমুখী। জলবায়ু নিয়ে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, রাষ্ট্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। বিশ্ব এখন ধনী দরিদ্র্য দুই ভাগে বিভক্ত। এ বিভক্তি সৃষ্টির কারণ থেকেই আমরা করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ঙ্কর মহামারিকে ডেকে এনেছি। প্রকৃতি নয়, জলবায়ু নয়, মানুষই মানুষের শত্রু। আমরা দেখছি ৩১ অক্টোবর ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের ২৬তম কনফারেন্স অব পার্টি (কপ-২৬) শুরু হয়েছে। এ সম্মেলনে ১২০টি দেশের সরকারপ্রধানেরা উপস্থিত হয়েছেন এবং দুই শতাধিক দেশের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

সম্প্রতি নেচার জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের শতকরা ৮৯ ভাগ কয়লার মজুদ, শতকরা ৫৮ ভাগ তেলের মজুদ এবং শতকরা ৫৯ ভাগ মিথেন গ্যাসের মজুদ প্রকৃতিতে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিতে হবে। কপ-২৬ এ আমরা কিছু আশার আলো দেখতে পাই। এই সম্মেলনে ৪টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ক) জলবায়ু অর্থায়ন, খ) কয়লার ব্যবহার বন্ধ করা, গ) পরিবহন খাতে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করা, ঘ) বনাঞ্চল সংরক্ষণ। গত ২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে শতাধিক দেশ যারা পৃথিবীর শতকারা ৮৫ ভাগ বনাঞ্চলের অধিকারী, তারা ঘোষণা দিয়েছে যে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বনাঞ্চল ধ্বংসের কার্যক্রম বন্ধ করবে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ৩০টি ফুটবল মাঠের সমান বনাঞ্চল প্রতি মিনিটে ধ্বংস হচ্ছে। আগামী ৫ বছর বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের জন্য ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত এক বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য, যারা এ বনাঞ্চল রক্ষায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে।

এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, মিথেন গ্যাসের নিঃসরণকে আগামী এক দশকের মধ্যে ২০২০ সালের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা। এতে ৯০টি দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি দেশ কয়লাচালিত বিদ্যুতের প্লান্টগুলো ২০৩০-২০৪০ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

শেষের কথা

২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির আহ্বানে নারী নেতাদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। এই সভায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতাদের সামনে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে তিনটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখেন। প্রথম প্রস্তাবে তিনি বলেন, 'আমি লিঙ্গ সমতার বিষয়ে উপদেষ্টা বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের প্রশংসা করি। এখন এটিকে স্থানীয়করণ করা দরকার। আমাদের প্রত্যেক পর্যায়ে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে লিঙ্গ চ্যাম্পিয়ন প্রয়োজন এবং আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে পারি।" দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেন, "নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রয়োজন। এ ধরনের প্রচেষ্টায় সহায়তার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।" তৃতীয় ও শেষ প্রস্তাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমি লিঙ্গ সমতার জন্য আমাদের সাধারণ কর্মসূচিকে জোরদার করতে নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন ডাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। শুধু আমরা নয়, সব নেতার এতে যোগদান করা উচিত এবং লিঙ্গ সমতার অগ্রগতির জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করা উচিত।'

পরিশেষে বলতে চাই এখন পর্যন্ত যতখানি জানা যায়, করোনা ভাইরাসের মূলে হলো একধরনের প্রকৃতির প্রতিশোধ। এটি কোনো একক দেশের ভুলের কারণে নয়। এটি বিশ্ব জনগণের সচেতনতার বিষয়, যৌথ উদ্যোগের বিষয়। এ উদ্যোগ গড়ে তোলা বিশ্বের প্রতিটি নীতিবান মানুষের দায়িত্ব। আসুন আমরা উদ্যোগে শামিল হই।

তথ্যসূত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অ্যান্তনিও গুতেরেসের বাণী; জেন্ডার সমতার কয়েক দশকের অগ্রগতি নষ্ট করেছে করোনা: জাতিসংঘ মহাসচিব; দৈনিক কলের কণ্ঠ, ৭ মার্চ, ২০২১।

লিঙ্গ সমতার জন্য নারী নেতৃবৃন্দের নেটওয়ার্ক গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১, দৈনিক যুগান্তর।

বাংলাদেশে করোনাকালেও থামেনি নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, ৬ মে ২০২০, ডিডব্লিউডটকম।

নারী নেতৃত্ব ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের আহ্বান টিআইবির, ৮ মার্চ, ২০২১, জাগোনিউজ২৪.কম।

বিশেষ সাক্ষাৎকার: হোসেন জিল্লুর রহমান, কোভিডকালে নারীর সমতার জন্য নিবিড় যত্ন চাই, ১৩ এপ্রিল ২০২১, দৈনিক প্রথম আলো।

করোনাকালে ব্যাংকে নারীর কর্মসংস্থান কমেছে, ৩১ অক্টোবর ২০২১, দ্যা ডেইলি স্টার।

বারকাত, আবুল (২০২০) *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

কপ-২৬: প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি, ১০ নভেম্বর ২০২১, দৈনিক কালের কণ্ঠ।

ফাতেমা রৌশন জাহান, খান তাহদিয়া তাসনিম মৌ নাজিয়া নাজনিন; *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব: একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ*; খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২৭, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২০৩-২০৬
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড-১৯ মহামারি

মোঃ মোরশেদ হোসেন*

সারসংক্ষেপ *কোভিড-১৯ মহামারি প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যের ওপর হুমকিস্বরূপ হলেও বর্তমান বিশ্বে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছে। এ নিবন্ধে রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও কোভিড- ১৯ মহামারির প্রভাব চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে মাধ্যমিক পর্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। কারণ কোভিড- ১৯ এর ট্রান্সমিশন মেকানিজম অনুযায়ী এর প্রভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে, ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে, এর ফলে খানার গড় ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, খানার গড় ব্যয় হ্রাসের ওপর বন্টনগত প্রভাব পড়েছে, ফলে দারিদ্র্য সংঘটন হয়েছে। রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও গড়ে উঠেনি কোনো শিল্পাঞ্চল। কোভিড- ১৯ এর কারণে এ অঞ্চলের কৃষি খাতের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে কৃষকেরা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাননি, সার-বীজ সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। এ অঞ্চলের অনেক কৃষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কৃষিশ্রমিক হিসেবে শ্রম দেন। কিন্তু চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা অন্য অঞ্চলে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হয়। এ অঞ্চলের অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ রাজধানী, বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অনানুষ্ঠানিক নানা খাতে কাজ করেন। তারা নির্মাণ শ্রমিক, রিকশা-ভ্যান চালানো, পরিবহন শ্রমিক, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কোভিড- ১৯ এর কারণে কর্মহীন হয়ে তারা গ্রামে ফিরে এসেছেন। জুন ২০২০ এর শেষে বেসরকারি একটি উন্নয়ন সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ শহর থেকে কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে গেছে এবং ৭৩ শতাংশ দরিদ্র বা হতদরিদ্র পরিবার কোভিড-১৯ এর কারণে আয়হীন হয়ে খাদ্যসংকটে ভুগেছে, ৫৩ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নিকট হতে অর্থ ধার করে জীবন বাঁচাচ্ছে এবং ৩৭ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চিত সম্পদ বিক্রয় করে খাদ্য সংগ্রহ করছে। এ অঞ্চলের মৎস্য খামার কিংবা পোলট্রি খামারের মালিকেরা তাদের পণ্যের সরবারাহ সংকটের কারণে যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় অনেকেই পুঁজি হারিয়েছেন। কোভিড-১৯ এর দারিদ্র্যকরণ প্রভাব ও এ অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে চলে আসা বঞ্চনার অবসান করতে হলে প্রয়োজন কিছু স্বল্পমেয়াদি ও কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে হলো খাদ্য ও কৃষিবাজারের Supply Chain কার্যকর করা, চাকরি হারানো নতুন বেকার, দেশে ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের স্বল্পসুদে ও সহজ*

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; ই-মেইলঃ morshed122009@yahoo.com

শর্তে ঋণ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমালিকদের প্রণোদনা দেওয়া, হতদরিদ্রদের সহায়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ছয় মাসের জন্য Employment Guarantee Scheme চালু করা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হলো রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা।

মূল শব্দ *রংপুর · দারিদ্র্য · সরবরাহ ব্যবস্থা · কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য · সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি · খাদ্য সংকট*

কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৯-এ সর্বপ্রথম চীনে কোভিড-১৯ চিহ্নিত হয়। এই মহামারি প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যের ওপর হুমকিস্বরূপ হলেও বর্তমানে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বর্তমানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে বহুমুখী সংকটের সৃষ্টি করেছে। কোভিড- ১৯ এর ফলে ২০২০ সালে বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে বলে অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা। তাই আসন্ন মন্দার আশঙ্কায় কম্পমান বিশ্ব অর্থনীতি। অর্থনৈতিক সংকোচনের কারণে বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কাও এখন বাস্তবতা। ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের যে প্রচেষ্টা বৈশ্বিকভাবে অর্জন হচ্ছিল, তা অনেকটাই হোঁচট খাবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে ১ ও ২ নম্বর লক্ষ্য দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণের প্রচেষ্টা অর্জনে পিছিয়ে পড়বে বিশ্ব।

বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ তার ভয়াল থাবা বসিয়েছে। বাংলাদেশে মার্চ ২০২০ এ সর্বপ্রথম কোভিড-১৯ চিহ্নিত হয়। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, দুই মাসের সাধারণ ছুটি, দেশে ও আর্ন্তজাতিকভাবে লকডাউন, পরিবহন-যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, উৎপাদন বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দায় বিশ্বের প্রতিটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জিডিপি পরিমাপের ১৫টি খাতের মধ্যে প্রায় সব খাতই যেমন কৃষি, মৎস্য, শিল্প, (ম্যানুফেকচারিং), নির্মাণ, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, রিয়াল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা , কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তা ৫.২৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ স্থির মূল্যে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২৭ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা। যদিও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল ২০১৯-২০ সালে বাংলাদেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ২-৩ শতাংশ এবং আইএমএফ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৩.৮ শতাংশ।

কোভিড-১৯ ও রংপুর বিভাগের দারিদ্র্য

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। কারণ কোভিড- ১৯ এর ট্রান্সমিশন মেকানিজম (Transmission Mechanism) অনুযায়ী, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে (Declining Economic Activity), ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে (Declining Economic Growth), এর ফলে খানার গড় ব্যয় হ্রাস পেয়েছে (Declining Average Household Expenditure), খানার গড় ব্যয় হ্রাসের ওপর বণ্টনগত প্রভাব পড়েছে (Distributional Impact on Household Expenditure) ফলে দারিদ্র্য সংঘটন হয়েছে (Poverty incidence)। সেন্টার

ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এক গবেষণায় দেখিয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশে ২০১৬ সালের যে উচ্চ দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ, তা ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে জিনি সহগ দিয়ে পরিমাপকৃত আয় বৈষম্য ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৮, তা ২০২০ সালে ০.৫২ হয়েছে এবং ভোগ বৈষম্য ২০১৬ সালে ছিল ০.৩২, যা ২০২০ সালে ০.৩৫ হয়েছে। বলা হচ্ছে প্রায় ১৬.৫ মিলিয়ন মানুষ কোভিড- ১৯ এর কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে এসেছে, এর মধ্যে ৫ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে এসেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষে উচ্চ দারিদ্র্যের হার ছিল ২০.৫ শতাংশ। সে হিসাবে দেখা যায়, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। সানেমের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৬-১২ মিলিয়ন মানুষ কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের চাকরি হারিয়েছে। ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯ এর কারণে ৭৪ শতাংশ পরিবারের আয় কমে গেছে এবং ১.৪ মিলিয়নের বেশি অভিবাসী শ্রমিক তাদের চাকরি হারিয়েছে এবং দেশে ফিরে এসেছে।

কোভিড- ১৯ এ প্রভাবে রংপুর বিভাগে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক নতুন দারিদ্র্য। আন্তর্জাতিক ও জাতীয়পর্যায়ে যখন দারিদ্র্য বেড়েছে, তখন বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরো শোচনীয়। কারণ রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার আগে থেকে অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'খানা আয়-ব্যয় জরীপ-২০১৬' অনুসারে জাতীয়পর্যায়ে দারিদ্র্য হার যেখানে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুসারে ২৪.৩ শতাংশ, সেখানে সব বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে বেশি ৪৭.২ শতাংশ। উল্লেখ্য খানা আয়-ব্যয় জরীপ- ২০১০' অনুযায়ী রংপুর বিভাগে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২.৩ শতাংশ। দেশের জাতীয় দারিদ্র্য হার যেখানে কমছে, অন্য বিভাগগুলোতে দারিদ্র্যের হার কমছে, তখন রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক বিষয় এবং পরিসংখ্যানটা চমকে দেওয়ার মতো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জেলাভিত্তিক দারিদ্র্য পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমাভুক্ত ১০টি জেলার মধ্যে ৫টি উত্তরাঞ্চলের। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ ৭০.৮ শতাংশ। কোভিড-১৯ নতুন করে এ দারিদ্র্যের হার বাড়িয়ে দিয়েছে।

রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও গড়ে উঠেনি কোনো শিল্পাঞ্চল। কোভিড- ১৯ এর কারণে এ অঞ্চলের কৃষি খাতের Supply Chain ভেঙ্গে পড়ার কারণে কৃষকেরা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পায়নি, সার-বীজ সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। এ অঞ্চলের অনেক কৃষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কৃষিশ্রমিক হিসেবে শ্রম দেন। কিন্তু চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা অন্য অঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হন। ফলে নিদারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হন। এ অঞ্চলের অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ রাজধানী, বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে অনানুষ্ঠানিক নানা খাতে কাজ করে যেমন নির্মাণশ্রমিক, রিকশা-ভ্যান চালানো, পরিবহন শ্রমিক, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ। কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মহীন হয়ে তারা গ্রামে ফিরে এসেছে। জুন ২০২০ এর শেষে বেসরকারি একটি উন্নয়ন সংস্থার এক গবেষণায় দেখা গেছে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ শহর থেকে কর্মহীন হয়ে গ্রামে ফিরে গেছে এবং ৭৩ শতাংশ দরিদ্র বা হতদরিদ্র পরিবার কোভিড-১৯ এর কারণে আয়হীন হয়ে খাদ্যসংকটে ভুগছে, ৫৩ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির নিকট হতে অর্থ ধার করে জীবন বাচাঁচ্ছে এবং ৩৭ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চিত সম্পদ বিক্রয় করে খাদ্য সংগ্রহ করছে। এ অঞ্চলের মৎস খামার কিংবা পোলট্রি খামারের মালিকেরা তাদের

পণ্যের সরবারাহ সংকটের কারণে যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় অনেকেই পুঁজি হারিয়েছেন। যারা সাধারণ ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা পণ্য সরবরাহকারী তারাও পণ্য বিক্রয় কম হওয়ায় পুঁজি সংকটে পড়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের মালিকেরা উৎপাদন ব্যাহত, পণ্য বিক্রয় না হওয়া, কারখানা বন্ধ, কর্মী সংকট ইত্যাদি নানা কারণে লোকসানের সম্মুখীন হয়ে পুঁজি সংকটে পড়েছে। রংপুর বিভাগের বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা এমনিতেই অন্যান্য বিভাগ হতে তুলনামূলকভাবে কম, ২০০৫-২০১৮ সময়কালে মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাত্র ১.৭৪ শতাংশ, রেমিটেন্স প্রাপ্তি ০.৮৫ শতাংশ। এসব শ্রমিকদের অনেকেই চাকরি হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন। তারা আবার বিদেশে ফেরত যেতে পারবেন কিন া তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যারা বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়ায় ছিল তারাও এখন হতাশ। সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণার সময়কালে যে ত্রাণসহায়তা, নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা অপ্রতুল। সরকারের ঘোষিত ২০২০-২১ সালের বাজেটের কৃষি খাতের ৯৫০০ কোটি টাকার ভর্তুকির হয়তো খুব সামান্যই পাবে এ এলাকার প্রকৃত কৃষক। ব্যাংকগুলো ঋণসহায়তা করলেও এ অঞ্চলের তরণদের উদ্যেক্তা হওয়ার প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, আগ্রহ না থাকায় স্টার্ট আপ সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত পরস্পর নির্ভরশীল। 'একজনের ব্যয়, আরেক জনের আয়'—এই তত্ত্ব মেনে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চলে। ফলে কোনো পর্যায়ে ব্যয় বন্ধ হলে তা গুণক প্রক্রিয়ায় (Multiplier Process) সব ব্যক্তি ও খাতকে প্রভাবিত করে। কোভিড- ১৯ এর মহামারির ফলে সেই প্রক্রিয়ায় মানুষ আয়হীন, কর্মহীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুপারিশ ও উপসংহার

কোভিড-১৯ এর দারিদ্র্যকরণ প্রভাব এবং এ অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে চলে আসা বঞ্চনার অবসান করতে হলে প্রয়োজন কিছু স্বল্পমেয়াদি ও কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে হলো খাদ্য ও কৃষিবাজারের সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যকর করা, চাকরি হারানো নতুন বেকার, দেশে ফেরত আসা প্রবাসী শ্রমিকদের স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমালিকদের প্রণোদনা দেওয়া, হতদরিদ্রদের সহায়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ছয় মাসের জন্য এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হলো রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা। রংপুর বিভাগে ৯টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেয়েছে, অন্যগুলো প্রস্তাবনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। এ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের তরুণদের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, তেমনি কমতো দারিদ্র্য। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলের কৃষিখাতেরও উন্নয়ন হতো। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানারসের (বিআইপি) এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অনেক কম অংশ বরাদ্দ করা হয় রংপুর বিভাগের জন্য, ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে রংপুর বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩.১৩ শতাংশ, যেখানে ঢাকা বিভাগের বরাদ্দ ছিল ৩৮.৫৪ শতাংশ। রংপুর বিভাগের এ বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। রংপুর বিভাগের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এডিপিতে ন্যায্য বরাদ্দ ছাড়াও বিশেষ বরাদ্দ তাই এখন কোভিড-১৯ পরবর্তী বাস্তবতা।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২০৭-২১৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে ভাবনা: ভাবনায় অর্থনীতি

মোঃ মোস্তফা কামাল*

সারসংক্ষেপ *১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা পেরিয়ে এসেছি ৫০ বছর, পৌঁছে গেছি এর সুবর্ণজয়ন্তীতে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার অবর্তমানে বাংলাদেশ পার করেছে দীর্ঘ ৪৫টি বছর। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক দূর এগিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তির যাঁতাকালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রয়াস রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।*

মূল শব্দ *সুবর্ণজয়ন্তী · রোল মডেল · সামাজিক বৈষম্য · অর্থনৈতিক মুক্তি · কৃষকের অবস্থা · প্রকৃত উন্নয়ন · প্রকৃত ক্ষুধামুক্ত*

"মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"[১] ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি দুঃশাসন, বঞ্চনা আর চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনায় এখানে আমরা এক বিরাট স্বপ্ন দেখতে পারি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটিকে ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি

* প্রভাষক (খণ্ডকালীন), অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
মোবাইল ফোন: ০১৭৫৩৫৭৫৮৫২ ই-মেইল: mostofajnu1988@gmail.com

[১] বাংলাদেশ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৯, ধারা-০২

অর্থবহ হয় না। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির মতোই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি হয়ে যায় তেলবিহীন ইঞ্জিনের মতো। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা পেরিয়ে এসেছি পঞ্চাশ বছর, পৌঁছে গেছি এর সুবর্ণজয়ন্তীতে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। সবাই চায়—আগামীর বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অর্জিত হবে অর্থনৈতিক মুক্তিও। মুছে যাবে কৃষক-শ্রমিক আর মেহনতি মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস।

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো খাদ্য। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধামুক্তি এখনো সম্ভব হয়নি। আজও বাংলার আকাশে শোনা যায় ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি। এমন বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে ক্ষুধার জন্য কোনো হাহাকার শোনা যাবে না। সবাই দু-বেলা শান্তিতে পেটপুরে খেতে পারবে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ঠিকই আমাদের আছে। কিন্তু রয়েছে অব্যবস্থাপনা, সঠিক বণ্টনের অভাব। অভিজাত শ্রেণি নিজেদের বিলাসিতার কারণে যে খাদ্য অপচয় করে, যা দিয়ে কষ্টে থাকা মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণ সম্ভব। আগামীর বাংলাদেশ হবে প্রকৃত ক্ষুধামুক্ত এবং দারিদ্র্যমুক্ত এমনই স্বপ্ন সবার। কৃষিই বাংলাদেশের প্রাণ, কৃষিই এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। একসময় এ দেশের কৃষকের ছিল গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গরু। আজ সেই কৃষি আর কৃষক নানা সমস্যায় জর্জরিত। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকের অবস্থা আজ শোচনীয়। সবার আশা—আগামীর বাংলাদেশে কৃষি আর কৃষকের সেই সমস্যা কেটে গিয়ে কৃষি ফিরে পাবে তার আপন গতি, কৃষক পাবে তার কষ্টার্জিত ফসলের ন্যায্যমূল্য। কৃষকের ঘরে ঘরে উঠবে ধান, নবান্নের উৎসবে ভরে উঠবে বাংলার প্রতিটি ঘর। বাঙালি পরিচিতি পাবে দুধে-ভাতে বাঙালি হিসেবে।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। এ জন্য বাংলাদেশ নদীমাতৃক বাংলাদেশ হিসাবেই পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের মানুষ পরিচিতি পেত মাছে-ভাতে বাঙালি হিসাবে। বাঙালির সেই চিরায়ত ঐতিহ্য আজ বিলিন হওয়ার পথে। খালবিল ভরাট করে চলছে স্থাপনা তৈরির মহোৎসব। অবৈধ দখল আর নদ-নদীভরাটের উৎসবের কারণে নদ-নদীর আজ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। নদীতে চলছে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ আর নাব্য সংকট। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত বাসস্থান তৈরি নদী খাল-বিলের ওপর ভয়ঙ্কর থাবা বিস্তার করছে। নদীর উপর অপরিকল্পিত বাঁধ দিয়ে ব্রিজ-সেতু নির্মাণের ফলে নদ-নদী হারাতে বসেছে তার স্বাভাবিক প্রবাহ। যেসব খাল-বিল-নদী অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোতে দূষণের মাত্রা এত বেশি যে মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহারসহ নানা কারণে হুমকির মুখে পড়েছে জীববৈচিত্র্য। আমরা এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চাই, যেখানে কেউ নদী আর খাল ভরাটে লিপ্ত হবে না। হারানো নদীগুলো পুনরুদ্ধার হবে, নদীর নাব্য বৃদ্ধি পাবে, দূষণরোধ আর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নদী ফিরে পাবে তার আপন গতি, জেলেরা সুদিন ফিরে পাবে, মৎস্য খাত মজবুত করবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত। সর্বোপরি বাঙালি প্রকৃত অর্থেই মাছে-ভাতে বাঙালি হিসেবে পরিচিতি পাবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে।

বছর ঘুরে বাঙালির কাছে ফিরে আসে নববর্ষ। এ যেন বাঙালির নতুন জীবনে প্রবেশ করার-নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়ার এক মূলমন্ত্র। কিন্তু আজকের দিনে নববর্ষ যেনো শহুরে ধনিকশ্রেণির ভোগবিলাস আর বছরওয়ারি পান্তা-ইলিশের আয়োজনে পরিণত হয়েছে। এখানেই আমরা স্বপ্ন দেখি, আগামীর বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে ঘরে বছরজুড়ে ছড়াবে ইলিশের গন্ধ। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই নববর্ষের আনন্দের সমান অংশীদার হবে। নববর্ষ শুধু উৎসবের একটি দিনই নয়, এটি আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য

অংশ—এটাই জাগ্রত হবে সবার মানসপটে। নববর্ষের সাথে আমাদের অর্থনীতির একটি সুদৃঢ় মেলবন্ধন রয়েছে। আগে নববর্ষের দিন দোকানিরা হালখাতার আয়োজন করত। দোকানি ক্রেতাকে মিষ্টিমুখ করাত। আর ক্রেতা তার পুরোনো হিসাব চুকিয়ে নতুন করে আবার নববর্ষের খাতায় নিজের নাম যুক্ত করত। এটি আর আজ সর্বত্র দেখা যায় না। ঋণ-ধার-দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে নববর্ষ হতে পারে আমাদের জন্য পাথেয়। বাংলাদেশে নববর্ষের সেই ঐতিহ্য আবার সেই চিরায়ত রূপ ধারণ করবে, নববর্ষের মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতি ফিরে পাবে নতুন প্রাণ এমনই প্রত্যাশা সবার।

আমাদের রয়েছে ১৮ কোটির (প্রায়) প্রাণ সম্পদ। যেকোনো দেশের জনসংখ্যাই যেন খনির আকরের মণির মতো, এটিকে সুষ্ঠু ব্যবহার না করলে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট (জনমিতিক লভ্যাংশ) এর যুগে এসে পৌঁছেছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশে ১৮ কোটি জনসংখ্যা দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে—গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা।

একসময় বাংলাদেশকে কথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। বাংলাদেশ সেই তিক্ততার ইতিহাস পেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে, সবাই উন্নত জীবন পাবে- বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশ হবে উন্নয়নের রোল মডেল এমনই এক স্বপ্ন সবার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি এগিয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক দল লোকদেখানো রাজনীতির নামে, নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আর বিপর্যস্ত করবে না, সেই স্বপ্নই আমরা দেখতে চাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "যে দেশে ধর্মের মিলেই প্রধানত মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। যে দেশ ধর্মকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে সেটাই সর্বনাশা বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সহজপ্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।" আজ এ কথা মানতেই হবে, এক অশুভ সর্বনাশা 'ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি' দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের এই বাংলাদেশ। এ যেন নতুন রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের উত্থান। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) রাষ্ট্র হিসেবে। ১৯৭৭-১৯৮৮ সময়কালে সংবিধানের বুকে চাকু মেরে তাকে রাষ্ট্রধর্ম বানানোর সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" যুক্ত করে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের বীজ বপণ করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে সংখ্যাগুরুর 'শ্যাবিজম'। বাংলাদেশে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি হলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী অবস্থান থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-বৈষম্য অব্যাহত আছে। এখানেই আমরা স্বপ্ন দেখি—ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, যেখানে সবাই পরিচিত হবে বাঙালি হিসেবে, সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর ভিত্তিতে নয়। সেখানে সবার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হবে, অশুভ ধর্মকেন্দ্রিকতার বৃত্ত ভেঙে যাবে, ধর্মীয় উগ্রবাদ-সন্ত্রাসের নামে বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস হবে না।

বাংলাদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যৌথ প্রয়াসেই প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হয়। সংস্কৃতি দূর করে মানুষের মনের ক্ষুধা আর অর্থনীতি দূর করে পেটের ক্ষুধা। মনের ক্ষুধা আর পেটের ক্ষুধামুক্তির সম্মিলিত প্রয়াসেই সৃষ্টি হয় প্রকৃত ক্ষুধামুক্তি। সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি ভবিষ্যতের বাংলাদেশে দেখতে চাই।

"বাংলাদেশ যৌথ সংস্কৃতির দেশ। এখানে আছে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ—আছে বাঙালি এবং অর্ধশতাধিক আদি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ। সংস্কৃতির বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে একটি অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। মিলিত বাঙালির সম্প্রীতিময় বন্ধন আমাদের জাতিসত্তার গৌরবিত বৈশিষ্ট্য। অথচ নানা সময়েই দেখা গেছে ধর্মান্ধ ব্যক্তি বা দল, কখনো বা রাষ্ট্র-পরিচালনাকারী স্বয়ং, ধর্মীয় প্রভেদ সৃষ্টি করে মিলিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, সৃষ্টি করতে চেয়েছে মানুষে–মানুষে ধর্মে-ধর্মে ভেদ। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর এমন হীন ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত থাকবে আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। আগামীর বাংলাদেশ হবে প্রকৃত অর্থেই এক সম্প্রীতির দেশ। মানুষ স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম পালন করবে স্বপ্নের বাংলাদেশে। ধর্ম স্বার্থান্ধ দল বা গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হবে না, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মকে নিজেদের মতো ব্যবহার বা ব্যাখ্যা করবে না, 'লালসালু'র মজিদের মতো কোনো ব্যক্তি ধর্মকে ব্যবহার করবে না ভন্ডামির উৎস হিসেবে— এমনি স্বপ্ন দেখি আমি।"[২]

সুষ্ঠু মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি বিকাশের ক্ষেত্রে দরকার পরিমিত পুষ্টিকর খাবার, সুপেয় পানীয় জল এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ। বাংলাদেশে আজ ভেজাল খাবারের ছড়াছড়ি। শাকসবজি থেকে শুরু করে ফলমূল, মাছ, গোশত সর্বত্রই যেন কার্বাইড আর ফরমালিনের রাজত্ব। আমি স্বপ্ন দেখি ফরমালিন মুক্ত বাংলাদেশের– যেখানে নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে-যারা সচেতনভাবেই খাবারে এবং পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করবে না। গড়ে উঠবে নৈতিক শক্তিতে সমৃদ্ধ জাতি-গড়ে উঠবে মানবিক বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেক দূর এগিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসব সৃষ্টি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতার ঘোষক, প্রথম রাষ্ট্রপতি, বাঙালির মহানায়ক, বাঙালি জাতির জনক—এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাংলাদেশকে অস্বীকার করারই নামান্তর। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গভীর রাতে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[৩] (বাংলাদেশ সংবিধান, ষষ্ঠ তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ)

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। ইতিহাস বিকৃতির এই ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জেনে নিজেদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবে, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস চর্চা করবে না—ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলেও ইতিহাস বিকৃতির কোনো ইতিহাস সৃষ্টি হবে না—এমনই বাংলাদেশ চাই আমরা, যেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো যথাযথ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা করবে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপরিচালনা করবে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির

---

২ ঘোষ বিশ্বজিৎ (২০১৮), ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনা (সম্পাদিত) গ্রন্থকুটির, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৮।

৩ (বাংলাদেশ সংবিধান, ষষ্ঠ তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ)

সাথে প্রগতিশীল শক্তিগুলো রাজনৈতিক আঁতাত করবে না। প্রগতিশীল শক্তি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন একটি বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই। রাজনৈতিক দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিসমৃদ্ধ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে। আজ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলা হয়। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে কী বোঝায়? সে সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি নীতিই রাষ্ট্রপরিচালনার মূল ভিত্তি। বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনেও মূলভিত্তি ছিল এই চারনীতি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানেই এই চার মূলনীতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশকেই। এই হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতকের নির্মম বুলেট মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যারা সপরিবারে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাকারীদের মধ্যে অনেকের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। একজন খুনি জিম্বাবুয়েতে মারা গেছে, একজন আমেরিকা এবং অন্য আরেকজন কানাডাতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে। বাকি খুনিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর সকল খুনিদের ফাঁসির মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ কলঙ্কমুক্ত বাংলাদেশ আমি দেখতে চাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে যে কলঙ্কিত ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন বাংলার মাটিতে আর সংঘটিত না হয়, এমন একটি বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিল তাদের অনেকেই পরবর্তীতে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে বাংলার মাটি, আকাশ এবং বাতাসকে কলঙ্কিত করেছে। কলঙ্কিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি এই দেশে আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারবে না, যারা বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে সেই মানবতাবিরোধী শক্তি বাংলার মাটি থেকে চিরতরে নস্যাৎ হবে, প্রগতিশীল শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে—এমনই এক বাংলাদেশ সবার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজ সারাবিশ্বে রোল মডেল। এ দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ এই খাত থেকে আসে। তৈরি পোশাক শিল্পখাতের দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেও এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। আজও অনেক ক্ষেত্রেই পোশাক শ্রমিকদের বেতন আর বোনাসের জন্য রাস্তায় আন্দোলন করতে হয়। স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরেও এটি আমাদের জন্য দুঃখজনক। তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন হবে, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সুবিধাসহ তাঁরা উন্নত জীবন পাবে, তাঁদের হাত ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা আরও বেগবান হবে—এমন একটি বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই।

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশকে আর দাতা সংস্থা বা দাতাদেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয় না। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব সক্ষমতা প্রমাণ করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের বিমান ও রেলখাত অব্যাহতভাবে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও অগ্রগতি অর্জন করবে এবং সেই দক্ষতা বাংলাদেশের আছে। শুধু পদ্মা সেতুর দ্বারাই বাংলাদেশের জিডিপি প্রায় ১.২৩ শতাংশ বেড়ে যাবে, যা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেই নির্দেশ করে। ভবিষ্যতের বাংলাদশে যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে এমনই স্বপ্ন আমরা দেখি।

কোনো দেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে কতটা উন্নত তা সে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য দেখলেই অনেকটা অনুমান করা যায়—এমন ধারণাই অনেকে পোষণ করেন। এটি সত্য কি মিথ্যা, তার বাস্তব কোনো ভিত্তি না থাকলেও এটি যে অনেকাংশে সত্যি—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যখাত বিশ্বমানের বা যুগোপযোগী কি না তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হতে পারে। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসাসেবা এগিয়ে যাচ্ছে এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। রাষ্ট্রের সব নাগরিক উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাবে, কোনো মানুষ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না—এমনটাই দেখতে চাই আমাদের ভবিষ্যতের বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় নারীরা অসামান্য অবদান রাখছেন। এ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ এবং তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে নারীরা তাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০-এ বাংলাদেশ ১৫৩টি দেশের মধ্যে ৫০তম স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে উঁচু স্তরে নারীর সমৃদ্ধ ক্ষমতায়ন চোখে পড়লেও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই, যেখানে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং লিঙ্গসমতা অর্জিত হবে এবং বাংলাদেশ হবে নারী ক্ষমতায়নের মডেল।

অর্থশাস্ত্রের জনক কৌটিল্যের মতে, "শিক্ষা হলো শিশুকে দেশ বা জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কৌশল।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" গান্ধিজি শিক্ষা নিয়ে বলেছেন, "ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস।" ব্যাপক অর্থে বলা যায়, শিক্ষা হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যা মানুষের আচরণের পরিবর্তন, মূল্যবোধের বিকাশ এবং উদারনৈতিক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দরকার সৃজনশীল ও জীবনমুখী শিক্ষা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান সৃষ্টিই হবে সেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" তাই আমরা এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে শিক্ষা হবে জীবনমুখী এবং সেই শিক্ষা করবে না কোনো শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি।

আগামীর বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা যথার্থই শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে। শিক্ষাব্যবস্থা হবে প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী। এরই মাধ্যমে বিকশিত হবে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা। সেই শিক্ষা অর্জন করে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম প্রকৃত মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর অগ্রগতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। জ্ঞানার্জন, নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি, কৃষ্টি চেতনা উন্মেষ, চরিত্র গঠন এবং সৃষ্টিশীল মানুষ হিসাবে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে তৈরি হবে সম্ভাবনার এক অন্য বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না শ্রেণি ভেদাভেদ, জাতি-ধর্ম-বর্ণে সৃষ্টি হবে না কোনো বৈষম্য—সর্বোপরি সৃষ্টি হবে এক শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ।

বর্তমান যুগ হলো তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবিলা করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির বিকল্প নেই। সময়ের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পাদপ্রান্তে অবস্থান করছি। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে ই-শিক্ষা,

গ্রিন ব্যাংকিং, ই-বিজনেস, মোবাইল নেটওয়ার্ক 4G-তে উন্নীতসহ অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রেই জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি এবং সাইবার ক্রাইম সংঘটিত হচ্ছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নিজেদের তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হবে, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ হবে এবং আগামীর বাংলাদেশ হবে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এমনই স্বপ্ন আমার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তালগাছ যেমন মাটিকে আঁকড়ে ধরে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি আমরা যদি বাঙালিত্বকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে আবর্তিত হই—তাহলে বিশ্বের বুকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকবে বাংলাদেশ। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনায় আমাদের প্রত্যাশা—আগামীতে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে চার মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে—বাস্তবায়ন হবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনার। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে আগামীর বাংলাদেশে সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে—এর মাধ্যমে কবিগুরুর 'তালগাছ' কবিতার মতো সবকিছু ছাড়িয়ে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে উন্নত সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হিসেবে—গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ বিশ্বজিৎ (২০১৮), ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনা (সম্পাদিত) গ্রন্থকুটির, ঢাকা।

বাংলাদেশ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৯, ধারা-০২

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২১

বাংলাদেশ সংবিধান, ষষ্ঠ তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ

Global Gender Gap Report-2020

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২১৫-২২৬
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

মুজিববর্ষে কোভিড-১৯: করোনাকালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বাজেট কতটুকু সহায়ক হবে?

মিহির কুমার রায়*

ভূমিকা

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে বিগত ৩রা জুন ২০২১ ইং তারিখে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট পেশ করেছিলেন বর্তমান সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যাকে বলা হয় করোনাকালের বাজেট। সেই হিসাবে বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'জীবন জীবিকার প্রাধান্য ও আগামীর বাংলাদেশ'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের তেরতম বাজেট এটি এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মুস্তফা কামালের এটি তৃতীয় বাজেট। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম বাজেট ঘোষণা করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ ১৯৭২ সালের ৩০ জুন, যার আকার ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এটি বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের বাজেটের আকার বেড়েছে ৭৬৭ গুণ। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৯টি বাজেট উপস্থাপন করেছেন ১২ জন ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজন রাষ্ট্রপতি, ৯ জন অর্থমন্ত্রী ও দুজন অর্থ উপদেষ্টা। ব্যক্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি ১২টি করে বাজেট উত্থাপন করেছিলেন প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং ১০টি বাজেট উপস্থাপন করেছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত।

এই বাজেট ঘোষণায় করোনা ভাইরাসের মহামারি থেকে জীবন বাঁচাতে যেমন উদ্যোগ থাকছে, তেমনি জীবিকা রক্ষায় থাকছে নানান প্রণোদনা। প্রথমবারের মতো এবারও করোনা মোকাবিলা করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। এতে করোনা থেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে টিকা আমদানিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে, দরিদ্রদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এবং নতুন কর্মসংস্থানে ব্যবসাবান্ধব বাজেট বলা হয়েছে। করোনা মহামারিতে বাড়ছে ব্যয়, আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে এবং সে হিসাবে কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না রাজস্ব আদায়। এতে আয় ও ব্যয়ের বড় ব্যবধানে বেড়ে যাচ্ছে ঘাটতির পরিমাণও। এমন পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো জিডিপির ৬ শতাংশের বেশি ঘাটতি ধরে করা হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট, যার আকার হচ্ছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ১৭.৪৭ শতাংশ, যা গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় নতুন বাজেটের আকার বাড়ছে ৬৪ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা। করোনার বছরেও ৭. ২ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা এবং মূল্যস্ফীতির হার ৫. ৩ শতাংশে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বিগত ১৬ মার্চ ২০১৮ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল একটি আনুষ্ঠানিক পত্রে জানিয়েছে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে উত্তরণের তিনটি শর্ত পূরণ করেছে। এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট

* অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; ই-মেইল: mihir.city@gmail.com

বক্তৃতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে ১৬টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, ওআইসি মহাসচিব এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশ ও জনগণের জন্য অবশ্যই আনন্দের বার্তা।

মূল শব্দ: *বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট · স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী · কৃষি পুনর্বাসন ও সারে ভর্তুকি · কোভিড-১৯ · প্রবৃদ্ধি*

২. বাজেটের বৈশিষ্ট্য

এই বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হলো করোনাকালে জনগনকে স্বস্তিতে রাখা বিশেষত স্বাস্থ্য, কৃষি তথা খাদ্য নিরাপত্তায়, সামাজিক নিরাপত্তায়, বিনিয়োগ-কর্মসংস্থানে, সামাজিক সুরক্ষার খাতের পরিধি বৃদ্ধিতে ইত্যাদি। তা ছাড়াও কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা, উত্তরণ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), রূপকল্প ২০২১, এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়ন ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর লক্ষ্য সামনে রেখে যথাক্রমে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে উত্তরণের অনুষঙ্গ হিসেবে যেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি (৮.২%) লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এবার বাজেটকে সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো, সাধারণ সেবা এবং সুদ-ভর্তুকি-ঋণ প্রদানের আওতায় মোট চারটি বৃহত্তর খাতে বিভক্ত করে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাব বিবেচনায় প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে স্বাস্থ্য খাতে ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি, যা মূল বাজেটের ৭.৬৮ শতাংশ। এরপরেই অগ্রাধিকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসন ও সারে ভর্তুকি প্রদান, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন। সেই সঙ্গে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসৃজন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ, গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহনির্মাণ এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার থাকছে।

চলতি বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপির হিসাবে ৬.২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির ৬ শতাংশের সমান ঘাটতি এবং সে হিসাবে এবার বাজেট ঘাটতির আকার বাড়ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, টাকার অঙ্কে প্রতিবছরই বাজেটের আকার বাড়ছে। কিন্তু করোনার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আয় কমে গেছে, সেই সঙ্গে কমেছে মানুষের ভোগব্যয়। এখন জোর দিতে হবে মানুষের কর্মসংস্থানে। সাধারণ মানুষের আয় বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতের দুর্বলতাগুলো কাটাতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

৩. বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ও খাতওয়ারি বিভাজন

বাজেটে মোট আয়ের লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ৩ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ১১ .৩৫ %), যা গত অর্থবছরে মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা এবং বর্তমান অর্থবছরের জন্য মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) থেকে আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা,এ ছাড়া এনবিআরবহির্ভূত অন্যান্য খাত থেকে আদায় করার লক্ষ্য রয়েছে ৫৯ হাজার কোটি টাকা। করোনার এই সময়ে রাজস্ব আদায় লক্ষ্য অনুযায়ী হচ্ছে না, ফলে চলমান বাজেটে ব্যয় নির্বাহে ঋণ গ্রহণে চাপ বাড়বে। বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ধরা হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া কর ছাড়া প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। করোনা মহামারি বর্তমান অর্থবছরে থাকবে, এমনটি ধরেই বাজেটে ব্যয় খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এতে চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় বাড়বে। যে কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৬১ হাজার ৫শ কোটি টাকা

যা জিডিপির ১০ .৪৬ শতাংশ। এর মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৩ লাখ ২৮ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিম ৪ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা এবং খাদ্য হিসাব হচ্ছে ৫৯৭ কোটি টাকা। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফারাক বেড়ে যাওয়ায় চলতি বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। গত অর্থবছরে ঘাটতি বাজেট জিডিপির ৫. ৯ শতাংশের মধ্যে এখনো রাখা হয়েছে। তবে চলমান বছর অনুদানসহ ঘাটতির পরিমাণ ৬.১ শতাংশ চূড়ান্ত করা হয়েছে যা টাকার অঙ্কে ২ লাখ ১১ হাজার ১৯১ কোটি টাকা। আর অনুদান ছাড়া ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা যাএটি জিডিপির ৬. ২ শতাংশ। সাধারণ ঘাটতি পূরণ করা হয় ঋণের মাধ্যমে। বাজেটে সহায়তা হিসাবে ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাত থেকে নেওয়া হবে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৭৯ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া সঞ্চয়পত্র থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে নেওয়া হবে ৫ হাজার ১ কোটি টাকা। পাশাপাশি বিদেশি ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯৭ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা। ঋণ করার কারণে বিপরীতে সুদ পরিশোধ করতে হয়। এ জন্য চলমান বছরে সুদ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৭ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা। এই বাজেটের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করার যে পরিকল্পনা রয়েছে এ ব্যয়ের বড় অংশ থাকবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, অবকাঠামো উন্নয়নে যার মধ্যে এডিপিতে বরাদ্ধ রয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার৩২৪ কোটি টাকাা অনুমোদিত এডিপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৯৯ কোটি ৯১ লাখ ও বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন ৮৮ হাজার ২৪ কোটি ২৩ লাখ টাকা। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশনের ১১ হাজার ৪৬৮ কোটি ৯৫ লাখ টাকার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন ৬ হাজার ৭১৭ কোটি ৪৮ লাখ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন ৪ হাজার ৭৫১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৪২৬টি প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ হাজার ৩০৮টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১১৮টি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৮৯টি প্রকল্পসহ মোট প্রকল্প ১ হাজার ৫১৫টি। খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০টি খাতে ২ লাখ ১০ হাজার ৪২১ কোটি, যা মোট এডিপির প্রায় ৯৩.৩৯ শতাংশ। এর মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে প্রায় ৬১ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের প্রায় ২৭.৩৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪৫ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা (২০.৩৬%), গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি খাতে ২৩ হাজার ৭৪৭ কোটি (১০.৫৪%), শিক্ষা খাতে ২৩ হাজার ১৭৮ কোটি (১০.২৯%), স্বাস্থ্য খাতে ১৭ হাজার ৩০৭ কোটি (৭.৬৮%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে প্রায় ১৪ হাজার ২৭৪ কোটি (৬.৩৪%), পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি খাতে প্রায় ৮ হাজার ৫২৬ কোটি (৩.৭৮%), কৃষি খাতে প্রায় ৭ হাজার ৬৬৫ কোটি (৩.৪০%), শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে প্রায় ৪ হাজার ৬৩৮ কোটি (২.০৬%) এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রায় ৩ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা (১.৫৯%)।

৪. মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৩ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২৮ হাজার ৪২ কোটি, বিদ্যুৎ বিভাগে ২৫ হাজার ৩৪৯ কোটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ২০ হাজার ৬৩৪ কোটি, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১৩ হাজার ৫৫৮ কোটি, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে ১৩ হাজার কোটি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে ১১ হাজার ৯১৯ কোটি, সেতু বিভাগে ৯ হাজার ৮১৩ কোটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৮ হাজার ২২ কোটি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৬ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ১০ প্রকল্পে প্রায় সাড়ে ৫৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া প্রকল্পের

তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১৮ হাজার ৪২৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা), মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টে (৬ হাজার ১৬২ কোটি টাকা), চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রকল্পে (৫ হাজার ৫৩ কোটি ৯৮ লাখ টাকা)। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) ৩ হাজার ৮২৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পে ৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পে ৩ হাজার ৫০০ কোটি, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে (৩ হাজার ২২৭ কোটি ২০ লাখ), এক্সপানশন অ্যান্ড স্ট্রেংদেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া প্রকল্পে (৩ হাজার ৫১ কোটি ১১ লাখ ও হযরত শাহজালাল আন্ত র্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায় ১ম সংশোধিত) ২ হাজার ৮২৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা। অপর দিকে নতুন প্রকল্পে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ২ হাজার ৮৯৩ কোটি ও প্রকল্প ঋণ ১ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন ৫৯৬টি প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দহীন অননুমোদিত নতুন ১৪১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া পিপিপি প্রকল্প ৮৮টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২-এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৩৫৬টি। ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে জুন ২০২১-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আরো ৭৩টি প্রকল্প ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

৫. বাজেট বিশ্লেষণ

বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়—

(১) করোনাকালীন জীবন ও জীবিকার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও কার্যত নতুন বাজেটটি গতানুগতিক বাজেট হয়েছে। করোনার মধ্যে গত বছরের বাজেট বাস্তবায়নে অর্ধেক হওয়ার বিষয়টি আমলে না নিয়েই তৈরি করা হয়েছে বর্তমান অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব। প্রধানমন্ত্রী তার ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরের বাজেট সমাপনী বক্তৃতায় মহান জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, করোনা মোকাবিলা করে বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন অর্থের কোনোরকম অভাব হবে না। এখন বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে, যা সরকার অবগত আছে। কিন্তু এর উন্নয়নের গতিধারায় কবে নাগাদ এই সক্ষমতা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌছাবে তা বলা দুস্কর। এর জন্য প্রশিক্ষণ ও তদারকির কোনো বিকল্প নেই সত্যি। কিন্তু একটি রোডম্যাপ ধরে আগাতে হবে। প্রায়শই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোর ব্যয় দক্ষতা, ব্যয়ের মান নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন শোনা যায়।

(২) কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো আরো প্রকট হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১.৩ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৭.২ শতাংশ। কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে মাত্র ২১ শতাংশ ব্যয় করতে পেরেছে। এমনকি ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ১০০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য গবেষণায় বরাদ্দ ছিল অথচ খরচ হয়নি বরাদ্দের এক টাকাও বিধায় এ খাতে অর্থ বরাদ্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং প্রয়োজন। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ বিষয়ে গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ ও তার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ

অনুযায়ী স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৫ শতাংশ ও মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে, সেক্ষেত্রে এ বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল অসংক্রামক রোগের বিস্তৃতি ও চিকিৎসায় ব্যক্তিগত ব্যয়ের উচ্চহারের কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। এখন করোনাকালে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন চিকিৎসক-কর্মী নিয়োগ, করোনা মোকাবিলার জন্য কিট, পিপিই, মাস্ক, অক্সিজেন ও মেডিসিন সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। দেশে প্রাথমিক-মাধ্যমিক পর্যায়ে সেবার অগ্রগতি ভালো; কিন্তু উচ্চ সেবায় স্বাস্থ্য ববস্থা আইসিইউ, ভেন্টিলেশন ইত্যাদিতে বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। দেশের এই পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯১৯ এর মোকাবিলায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এরপর প্রসঙ্গটি হলো বৈশ্বিক অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের আমদানি-রপ্তানিতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে সময় লাগবে। তার সাথে যুক্ত হতে পারে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে স্থবিরতা, কর্মহীনতা, ভোগ চাহিদা ও সরবরাহ চেইনে বাধা, রাজস্ব আদায়ে স্থবিরতা ইত্যাদি।

গতানুগতিকভাবেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কম, যা গত একদশক ধরে বাংলাদেশ গড়ে জিডিপির শতকরা মাত্র ২ ভাগ বা তারও কম আর বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ ব্যয় করছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। উন্নত দেশগুলোতে এই হার শতকরা ১০ থেকে প্রায় ২০ ভাগ। মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার গড় মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় বাংলাদেশ থেকে ৪ গুণেরও বেশি। এছাড়া মহামারির সময় জরুরি প্রয়োজন মেটাতে বাজেটে এবারও ১০ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক থেকে করোনা টিকা কিনতে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য ১৪ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে, যা ইতোমধ্যে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু অগ্রাধিকারের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচি অন্যতম। সরকার দেশের সব নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করবে, এ জন্য যত টাকাই লাগুক সরকার তা ব্যয় করবে। সে লক্ষ্যে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বরাদ্দের বাইরে টিকা কিনতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে দেড় বিলিয়ন ডলারের ভ্যাকসিন সাপোর্ট পাওয়ার কথা রয়েছে। টিকা সংগ্রহে চলতি অর্থবছরে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক ৩ হাজার কোটি টাকা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষায় বিশ্বে বিনামূল্যে টিকা প্রদানকারী দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক থেকে কোভিড-ভ্যাকসিন কিনতে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য ১৪ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহৃত হচ্ছে। টিকা কিনতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার লক্ষ্যে ঋণচুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পাশাপাশি, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং এআইআইবি হতে ভ্যাকসিন কেনার জন্য সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। মোট ৮০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় আনার জন্য ভাগ ভাগ করে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে টিকা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতি মাসে ২৫ লাখ করে টিকা দেওয়া হবে। বর্তমান বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে জাতীয়ভাবে টিকা দেওয়া শুর হয়। এখন পর্যন্ত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ১ কোটি ২ লাখ ডোজ, চীনের সিনোফার্মের ৫ লাখ ডোজ এবং কোভ্যাক্স থেকে ফাইজার-বায়োএনটেকের ১ লাখ ৬২০ ডোজ টিকা এসেছে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড প্রয়োগের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। তিন কোটি ডোজ টিকা কিনতে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। তবে মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে সরকারের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার কারণে সেরাম ইনস্টিটিউট দুই চালানের পর আর টিকা

পাঠাতে পারেনি। এতে দেশে টিকাদান কর্মসূচি বড় ধরনের হোঁচট খেলে নতুন উৎস থেকে টিকা কিনতে তৎপর হয় সরকার। এর অংশ হিসাবে চীনের সিনোফার্ম ও রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি টিকা পেতে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সিনোফার্মের কাছ থেকে টিকা কেনার প্রস্তবও সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। উপহার হিসাবে চীনের কাছ থেকে পাওয়া এই টিকা দেশে প্রয়োগও শুরু হয়েছে। রাশিয়ার কাছ থেকে স্পুটনিক-ভি কেনার জন্য সরকারি পর্যায়ে আলোচনা চলছে। আর ফাইজার-বায়োএনটেকের তৈরি এক লাখ ৬২০ ডোজ টিকা বাংলাদেশ পাচ্ছে কোভ্যাক্স থেকে। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ফাইজার ও জার্মান জৈবপ্রযুক্তি কোম্পানি বায়োএনটেকের তৈরি করা করোনা ভাইরাসের টিকা বাংলাদেশে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। এ নিয়ে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের মোট চারটি টিকা অনুমোদন পেল। এর আগে কোভিশিল্ড, স্পুটনিক-ভি ও সিনোফার্মের তৈরি টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রকল্প গত অর্থবছরে বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবছরেও তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। সরকারিভাবে ঢাকায় ৭২টি ও ঢাকার বাইরে ৪৯টিসহ মোট ১২১টি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত আরটিপিসিআর ভিত্তিতে ৫৮ দশমিক ১৯ লাখসহ মোট ৫৯ দশমিক ৪৮ লাখ মানুষের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৪২৩টি) এর প্রতিটিতে ৫টি করে আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। যেসব জেলায় মেডিকেল কলেজ নেই, সেখানে জেলাসদর হাসপাতালগুলোতে ১০-২০টি আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে। দায়িত্ব পালনকালীন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানি বাবদ চলতি বছরে বরাদ্দকৃত ৮৫০ কোটি টাকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকায় দুটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার চালু রয়েছে। সারা দেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টিন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০টি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। রিয়েল টাইম হসপিটাল ড্যাশবোর্ড স্থাপনের ফলে দেশের কোভিড হাসপাতালসমূহের সাধারণ ও আইসিইউ শয্যার সব তথ্য যেকোনো মুহূর্তেই পাওয়া যাচ্ছে।

বর্ণিত অবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যখাতে সরকারের আয়োজনের কোনো কমতি নেই। কিন্তু উদ্যোগের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে, যা গোছানো জরুরি। কাজেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী, বাজেটের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত দ্রুততম সময়ে জনগণের কমপক্ষে ৭০ শতাংশের টিকাকরণের কৌশল নির্ধারণ করা। বাজেটে বলা হয়েছে, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলাসদর হাসপাতালগুলোতে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কাজ চলমান আছে। এক্ষেত্রে উপজেলাপর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতেও যতটা সম্ভব আধুনিক স্বাস্থ্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বাড়াতে হবে, যাতে বড় বড় শহরের হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ কম পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরও সব জেলা হাসপাতালে আইসিইউ সুবিধা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি গত একবছরে। কারণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জনবলের অপর্যাপ্ততা। স্বল্প মেয়াদে এটি করা সম্ভব না হলেও মধ্য মেয়াদে কাজটি অবশ্যই করতে হবে। আসলে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাস্তবায়নই মূল চ্যালেঞ্জ, যা করোনাকালে স্পষ্ট হয়েছে। গত অর্থবছরে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৫০ শতাংশেরও কম। এটি কেন

কম, অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হলে কেন হচ্ছে—মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, সর্বোপরি অপচয়। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানের পন্থা বের করা দরকার। ব্যয়ের সক্ষমতা নেই বলে বরাদ্দ কম না রেখে সক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই উপায় বের করতে হবে। এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করে বিধায় স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দে নগর-গ্রামের অনুপাতও ন্যায্য হওয়া দরকার। সর্বোপরি অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে করোনা মোকাবিলা করে অর্থনীতিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ৬৬ হাজার ৪০১ কোটি টাকা, যা জিডিপির ২.১ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ১১.৭ শতাংশ। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে হলে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ জন্য ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ শতাংশ এবং মোট জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে তার চেয়ে কম রয়েছে। করোনাপরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে বিধায় শিক্ষার্থীদের সংক্রামক রোগ থেকে নিরাপদ রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় নিয়ে অতিজরুরি ভিত্তিতে শিক্ষানীতিসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে;

(৪) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার প্রধান বাহক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পল্লী উন্নয়নের কথায় এলেই কৃষি সবার আগে চলে আসে। বর্তমানে কৃষিখাতে জিডিপির হার প্রায় ১২ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে শষ্য খাতের অবদান সর্বাগ্রে রয়েছে। যেতেতু কৃষি পল্লী উন্নয়নের একটি বড় খাত, তাই সরকার বাজেটে কেবল কৃষিখাতে ১৬,১৯৭ কোটি টাকা বর্তমান বছরে রাখা হয়েছে। আবার তার সাথে যদি মৎস্য, পশুসম্পদ, বন ইত্যাদিকে যোগ করলে সার্বিক কৃষিখাতে বাজেট দাঁড়ায় ৩১ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা, যা মূল বাজেটের ৫.৩ শতাংশ। কাজেই ব্যাপক অর্থে পল্লীী উন্নয়ন খাাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা উন্নয়ন বাজেটের ২৯.৬ শতাংশ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের ২০.২ শতাংশ বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে উল্লেখ্য, কৃষি যেহেতু একটি অগ্রাধিকারভুক্ত খাত এবং খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টির এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই গত বছরগুলোতে এই খাতে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল ৩২ হাজার ৫০২২ কোটি টাকা, যা গড়ে প্রতিবছর দাঁড়ায় ৬৫০১.৪ কোটি টাকা এবং চলতি বছরের বাজেরট ভর্তুকি রাখা হয়েছে ১০ হাজার ০৯৯ কোটি টাকা। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মনে করছে, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, কৃষি গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষির বহুমুখীকরণ, রপ্তনীমুখী কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদিতে জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমান বছরের বাজেটে অথনীতির প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) যে টার্গেট ধরা হয়েছে তা অর্জনে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় সেই খাতে প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৪.৫ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে বলে কৃষি অথনীতিবীদরা মনে করেন। কোভিড-১৯ দেখিয়ে দিয়েছে, রপ্তানিমুখী চিন্তা পরিহার করে গ্রামীণ অর্থনীতি ও খাদ্য উৎপাদন খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিডের কারণে ভারতসহ অনেক দেশের জিডিপিতে যেখানে নেতিবাচক সূচক পরিলক্ষিত, সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে খাতগুলো প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে, কৃষি তার মধ্যে প্রধানতম। এই অকালেও বাংলাদেশের জিডিপিতে গড় প্রবৃদ্ধি বিশ্বব্যাংকের মতে ৩. ৬ শতাংশ, এডিবির মতে ৫. ৫-৬ শতাংশ এবং সরকারি তথ্যমতে ৫.২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, তা অর্জিত হয়েছে মূলত কৃষি, প্রবাসী আয় এবং

পোশাক রপ্তানি খাত থেকে। সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে ও যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বছরে বোরোতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় দ্রুততার সাথে সফলভাবে ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০ শতাংশ- ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে তথা এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে সময় ও শ্রম খরচ কমবে, কৃষক লাভবান হবে ও বাংলাদেশের কৃষিও শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে। কৃষিযন্ত্রের প্রাপ্তি, ক্রয়, ব্যবহার ও মেরামত সহজতর করতে অত্যন্তগু গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করতে চাই। বর্তমানে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তা আমরা কমিয়ে আনতে চাই। ইতিমধ্যে আমরা ইয়ানমার, টাটাসহ অনেক কোম্পানির সাথে কথা বলেছি, তাদের অনুরোধ করেছি যাতে তারা বাংলাদেশে কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করে"। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। একই সাথে ফসলের নিবিড়তা বাড়বে ও চাষ ত্বরান্বিত হবে।

কৃষিখাতের বছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় মুরগি, মাছ ও গবাদি পশুরখাবার তৈরির উপকরণ আমদানিতে কাঁচামালে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, নিড়ানি, ঝাড়াই কল, কম্বাইন্ড হারভেস্ট, থ্রেসার, রিপার, পাওয়ার টিলার, সিডার ইত্যাদি কৃষিযন্ত্রে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, যা সামগ্রিক কৃষির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। কৃষিখাতের এই বজেটকে সাধুবাদ জানাতে চাই। কিন্তু কভিডে লকডাউনে আমরা লক্ষ্য করেছি, পণ্য যে অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না, সেখানে তার আকাশছোঁয়া দাম। আর যেটি উৎপন্ন হয় তা কৃষক বিক্রি করতে পারছেন না। রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাজেটে সেসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা নেই। এ রকম বাস্ড়বতায় কৃষি খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩. ৬ শতাংশ, মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ, কৃষি খাতের বাজেটও বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। এখন প্রশ্ন হলো, কভিডের কারণে বিদেশ থেকে যে শ্রমিকরা দেশে ফিরে এসেছেন এবং এখনও বিদেশে যেতে পারেননি, শহর থেকে কাজ হারিয়ে যারা গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের কর্মসংস্থান কিংবা তাদের শ্রম বিনিয়োগ কিভাবে ঘটবে তার তেমন কোনো উল্লেখ বাজেটে নেই তথ্য বলছে বিগত বছর গুলোতে জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ অবহেলিত হয়ে এসেছে এবং কৃষি খাতে ভুর্তুকি অন্যান্য বারের মত এবারেও একি অবস্থা রয়েছে। এখন আসা যাক বিনিয়োগের প্রসঙ্গে যা বর্তমান বছরের বাজেট উন্নয়ন খাতে কৃষি মন্ত্রনালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩,০৩০ কোটি টাকা যা ২০২০-২১বছরের সংশোধিত বাজেট ছিল ২.৩৯৭ কোটি টাকা (যা ঘোষিত ২৫৪৪ কোটি টাকা বিপরীতে)। আবার যদি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে জিডিপিতে এর হার মাত্র ২২ শতাংশ, যা গত কয়েক বছর যাবত স্থবির হয়ে আছে। আবার ব্যাংকিং খাতের হিসাবে দেখা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাক্তি পর্যায়ে যে বিনিয়োগ হয়েছে তা সামষ্টিক অথনীতির বিবেচনায় মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ এবং এতে কৃষি থাতের অংশ আরও কম অথচ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি বাজিন্যকরনের উপর জোড় দেওয়া হয়েছিল যেখানে

পরিবার ভিত্তিক চাষাবাদকে পরিহার করে খামার ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদকে (গ্রিন হাউজ) উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছে, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিরা অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে পারাছে না। বাজার ব্যবস্থাপনায় এসব কৃষকের কোনো প্রবেশাধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যার প্রমাণ কৃষিপণ্য বিশেষত কৃষকের ধানের মূল্য না পাওয়া যার প্রভাব পড়েছে ক্রমাগতভাবে কৃষি প্রবৃদ্ধির হ্রাস পাওয়ায়। কৃষি বাজেটের আরও দিক হলো কৃষির প্রক্রিয়া যেহেতু গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত তাই এর গতিশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৩৫ হাজার ২৯ কোটি টাকা (বাজেটের ৭.৪৮ শতাংশ), নদীভাঙ্গন রোধ ও নদী ব্যবস্থাপনার জন্য পানিসম্পদ খাতে ৬ হাজার ৮৭১ কোটি টাকা (বাজেটের ২.৭৯ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত মিলিয়ে বর্তমান অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৬ হাজার ৯ শত ৪৭ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরে ছিল ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি ৬৭৭ লাখ টাকা (হিসাবমতে বেড়েছে ৭১৩ কোর্টিট টাকা)। তথ্য থেকে জানা যায়, এডিপিতে বিগত ও বর্তমান মিলে মোট ১ হাজার ৫১৫টি প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ হাজার ৩ শত ৮টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১১৮টি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প ৮৯টি। এসব প্রকল্পের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প রয়েছে ১৫৬টি (চলমান রয়েছে ৫০ শতাংশ, ২৮ শতাংশ সমাপ্ত এবং ১৯ শতাংশ কোভিড ওভার প্রকল্প) এবং সমাপ্ত প্রকল্পগুলো দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৫ হাজার কোটি ও ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ৭৮.৭ শতাংশ ও ৫৯ শতাংশ্ লোন বিতরণ সম্ভব হয়েছে ও ২ লাখ সুফলভোগী এর আওতায় এসেছে। বিশ্বব্যাপী মোট খাদ্য উৎপাদনের ৮০ শতাংশই আসে পারিবারিক কৃষির মাধ্যমে, যার বিবেচনায় জাতিসংঘ ইতিমধ্যে (২০১৯-২০২৮) পারিবারিক কৃষি দশক ঘোষণা করেছে এবং একটি বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনাও চূড়ান্ত করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার আলোকে জাতীয়পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার এবং কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার নকশা তৈরি অত্যন্ত জরুরি, যার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, সংরক্ষণাগার, যান্ত্রিকীকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও পারিবারিক কৃষির উন্নয়ন, কৃষিসংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা এবং জৈব কৃষি বা জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষিচর্চায়, যার মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তায় ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে; দেশের অগণিত কৃষক যারা খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন দৃশ্যত দেখা যায় না। তাই কৃষক পরিবারের জন্য ভাতা-পেনশনের ব্যবস্থা বাজেটে রাখতে হবে। যেমন ভারতের কেরালা রাজ্যেও কমিউনিস্ট সরকার কৃষকদের জীবনমান রক্ষার জন্য বহু আগে থেকেই এ ব্যবস্থা চালু রেখেছে, যা প্রশংসনীয়। বর্তমানে করোনার সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকা গ্রহণের প্রাধিকারের তালিকায় কৃষক ও গ্রামবাসীদের সংযুক্ত করতে হবে। আশা করা যায় বাজেটসংক্রান্ত এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটাই হউক সবার প্রত্যাশা।

(৫) করোনা মোকাবিলায় সরকার চারটি কৌশলের পথ অবলম্বন করা হয়েছে, (ক) সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দেওয়া; (খ) ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রদান; (গ) কর্মহীন হতদরিদ্রকে সুরক্ষা দিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আকার বৃদ্ধি; (ঘ) বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি। দেশে সরকারি খাতে কর্মসংস্থান মাত্র ৩.২ শতাংশ অথচ এই সংখ্যাটি মালয়েশিয়াতে ২২.৪ শতাংশ, মিয়ানমার ৬.২ শতাংশ, পাকিস্তান ১২.২ শতাংশ ও ফিলিপাইন ৮.৪ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৯.৮ শতাংশ (উৎস: এশিয়া প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সোশ্যাল আউটলোক, ২০১৮)। আগামী অর্থবছরে সরকারি

খাতে কর্মসংস্থান এক শতাংশ বাড়ানো যাবে কি না এই করোনাকালে তা বলা কঠিন। কারণ বৈদেশিক বিনিয়োগ নিম্নমুখী, ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ ঊর্ধ্বমুখী, ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ নিম্নমুখী বিধায় কর্মসংস্থান হয় না। অথচ দেশে প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেসরকারি বিনিয়োগ। গ্রামীণ অর্থনীতি সচলে রাখতে পল্লীসমাজ সেবার জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। তা যদি ঋণ হয়, তবে কম সুদে এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ কর্মবাজারে প্রবেশ করে এবং শহরে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা বেশি, যাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বাজেটে বরাদ্দ রাখা দরকার।

৬. করোনাকালের অর্থনীতি থেকে শিক্ষণীয়

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে অনেক আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয় উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ বাংলাদেশ। একটি দেশ উন্নয়নের কোন স্তরে রয়েছে, তার একটি নিয়ামক হলো মোট দেশজ উৎপাদকের (জিডিপি) হার, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক স্তর বিবেচনা করে তা নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রবৃদ্ধি মানে উন্নয়ন না। কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গাণিতিক সূচক হিসাবে জিডিপির ধারনার প্রথম প্রস্তাব করেন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ সায়মন কুজনেট ১৯৩৭ সালে, যেখানে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন জিডিপি কীভাবে একটি দেশের সার্বিক অর্থনীতি উন্নতি ও অবনতি নির্দেশ করে। তার মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জিডিপি শুধু আর্থিক অবস্থার সূচক উন্নয়ন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আইএমএফ বিশ্বব্যাংক একযোগে জিডিপিকে উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে এটাকেই উন্নয়নের পরিমাপ ভ্রান্তি ধারণাকে সঠিক বলে গ্রহণ করে নেয় । তবে অনেক গবেষকই উন্নয়নে পরিমাপের ভান্তি ধারণার সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন, যার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন মোজেস আব্রামোভিজ, যিনি ১৯৫৯ সালেই এর সমালোচনা করছেন । আর ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিজ জিডিপিকে বাতিল করার আহ্বান জানান। তবে পঞ্চাশ দশকের ধ্রুপদি উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা বলেন, টেকসই উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক বিকাশ শ্রমসাধ্য অথচ দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি অপরিহার্য এবং অর্থনীতিবিদ পেইকাং, রয় এফ হ্যারোড, ইভজি ডোমার ও রার্বট সলো দেখিয়েছেন, দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি কতটা জরুরি। তাদের বক্তব্য ছিল কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা কৃষক জানেন ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য যা দিয়ে জমি, কৃষি উপকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যায় যেখানে থেকে বেশি ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়। অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে চীন দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের শুরু করে, যার ফলে সত্তুরের দশকের শেষ দিক থেকে চীনের জিডিপি কখনো ২০ শতাংশের নিচে নামেনি, যা ২০০৮ সালে ৫২ শতাংশ পর্যন্ত পৌছানোর ঘটনা ঘটে, যার জন্য একটি দেশকে তার নিজস্ব সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার জন্য উৎপাদনসক্ষমতা বাড়ানো হবে, যা খুব একটা সহজ নয়। এর জন্য উদ্যোক্তার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শিল্পায়ন সংগঠিত হবে, যা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ অনেকাংশে উপলব্ধি করতে পারেন না।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থাটা অনেকটা সুবিধাজনক পর্যায়ে থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি এর টেকসই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় বিষেশত বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায়। তারপরও আলোচনায় আসে বাংলাদেশের এখন এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। মোট দেশজ উৎপাদনের জিডিপি আকারে গত দুই যুগে সিঙ্গাপুর ও হংকংকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের এই অবস্থানে উঠেছে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিপি) ২০১৮ সালের এক হিসাব মতে বাংলাদেশের মোট ৭০ হাজার ৪১৬ কোটি ডলার

সমপরিমাণ পন্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি হয়েছে । বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) মতে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়ন করছে ও সামষ্টিক অর্থনতি শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান বছরে (২০১৯-২০) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ হারে এবং সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ২০২৩-২৪ সালে এই প্রবৃদ্ধি হারকে ডবল ডিজিটে নিয়ে যাওয়া। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, কোনো দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে ৭ বছর ধরে ৭ শতাংশে অধিক জিডিপি অর্জন করলে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়, যা বাংলাদেশ ২০২১ সালে অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে এখন আর কৃষিপ্রধান দেশ বলা যায় না। বাংলাদেশ এখন সেবাপ্রধান দেশ হিসাবে পরিচিত, যেখানে এই খাতের অবদান জিডিপির ৫৩ শতাংশ, শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশ এবং কৃষিখাতের অবদান ১৪ শতাংশ যদিও এখন পর্যন্ত ৪৬ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষির সাথে দারিদ্র্য ও খাদ্যনিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণা বলছে, কেবল জমির কিংবা কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোই দরিদ্র, আবার মহিলাপ্রধান গৃহস্থালি পরিবারগুলোই দরিদ্র, যার সংখ্যা বিবিএসের (২০১৯) তথ্যমতে মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ, যা সংখ্যা-তথ্যের ভিত্তিতে ৩ কোটি ৬৫ লাখ। আবার হতদরিদ্রের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ অর্থাৎ ব্যাপক গণদারিদ্র্য বাংলাদেশে একটি বড় বৈশিষ্ট্য, যা বিশ্ব ব্যাংকের দারিদ্র্য ও অংশীদার ২০১৮ শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ্য রয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে দেশের হতদরিদ্র সংখ্যা ২.৪১ কোটি, যারা দৈনিক ৬১.৬০ টাকা করে আয় করতে পারে না। অথচ টেকসইভাবে দরিদ্র নিরসনের জন্য বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি ২১ লাখ মানুষকে দ্রুত দৈনিক প্রায় ২৫২ টাকা করে আয়ের সংস্থান করতে হবে। অথচ আয়ের বৈষম্য এত প্রকট যে ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর স্থানে রয়েছে। সারা বিশ্বে আয় বৈষম্য নির্ধারণে গিনি সূচক, যা বর্তমানে ০.৫০ এর উপরে রয়েছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশের গিনি সূচকে ০.৫০ পর্যায়ে গেলেই বাংলাদেশ বিশ্বের আয় বৈষম্য দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে, তা দেশের জন্য সম্মানজনক নয়। আবার বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় আরও একটি সীমাবদ্ধতা হলো দীর্ঘমেয়াদি আয় বৈষ্যম্য ক্রমেই বাড়ছে। এখানে উল্লেখ্য, দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করে ২০১৯ সালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জী তার (Poor Economics) বইতে উল্লেখ্য করেছেন যে, বিদেশি বিনিয়োগ বা সাহায্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা দারিদ্র্য দূরীকরণের স্বপক্ষে কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। একইভাবে (Trickle Down Effects) ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের মতো দেশে যেখানে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকল্পের মূল অর্থের জোগান আসে কর সঞ্চয় অর্থ থেকে। তাই এই গবেষক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই সম্ভাবনার দিকে, যেখানে সরকারি প্রকল্পের ভর্তুকি দরিদ্র মানুষের কাজে লাগে না কখনো তা গরিব মানুষের নিজস্ব চাহিদা-জোগানের বৈশিষ্ট্যের জন্য, আবার কখনো প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে, যা দারিদ্র্যকে প্রলম্বিত করে, দুষ্টচক্রে সে আটকে পড়ে নিজের কারণেই। দরিদ্র মানুষ অনেক সময়েই সঞ্চয় করতে পারে না সমাজে অসাম্য থাকার কারণে এবং এই সামান্য সঞ্চয় অবলম্বন করে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেক সময় চলে যাবে। সেই কারণেই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার করা বিপজ্জনক এবং এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবিমুখতা বা মন্দ গ্রহীতাকেই তারা দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন দারিদ্র্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নের সুফল ও সম্ভাবনা বিষয়ে অধিকতর তথ্য আহরণ ও বিচ্ছুরণ করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তির লভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থ তথ্যের আহরণ ও লভ্যতা দ্রুততর ও সফলতার প্রবৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ নিতে আমাদের সন্দীপিত করবে। দরিদ্রদের জীবনের সর্বদিকের দায়িত্ব থেকে সামাজিক বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে যুক্ত রেখে যথার্থ প্রবৃদ্ধি ও অনুকূলে তাদের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

৭. উপসংহার

সর্বশেষে বলা যায়, করোনাকালীন বাজেট ও সরকারের করোনা ব্যবস্থাপনা অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও তা সামলাতে সক্ষম হয়েছে যদিও করোনার সংক্রমণ ১ শতাংশের কিছু বেশি রয়েছে। করোনা আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে, যা প্রতিপালিত হলে সমাজজীবনে অনেক সমৃদ্ধি আসবে এবং এটাই অর্থনীতির জন্য মঙ্গলকর।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২২৭-২৩৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

করোনায় (কোভিড-১৯) শিল্প-সংস্কৃতির অর্থনীতি: প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র ও যাত্রা শিল্প

মিহির কুমার রায়*

১. চলচ্চিত্র: জীবন-জীবিকা যেখানে বড় প্রশ্ন

চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবনা কিংবা গবেষণা তেমন গুরুত্ব পায়নি কোনো আমলেই বিশেষত শিক্ষার উপকরণ হিসেবে। যদিও বিনোদনের উপকরণ হিসেবে এর কদর সবসময়ই ছিল। আবার দেখা যায়, বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের কৃতী পুরুষ হিরালাল সেন বাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রথম পথপ্রদর্শক এবং তিনি ১৮৯৮ সালে রয়্যাল বাইস্কোপ নামে একটি কোম্পানি গঠন করেন। তারপর তিনি বাংলাদেশের ভোলা জেলায় ৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন মহকুমা প্রশাসকের ডাকবাংলোতে এবং এর পরপরই ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত ক্রাউন থিয়েটারে ১৭ এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে বর্ডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানির আয়োজনে একটি সিনেমার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। আবার ২১ আগস্ট, ১৯০৩ কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, রয়্যাল বাইস্কোপ কোম্পানি জবা-কুসুম অয়েল নামে একটি ফটোগ্রাফির স্লাপ নেয়, যা হিরালাল সেনের প্রথম প্রচারমূলক ফ্লি। সেন তার জীবদ্দশায় ১২টি ক্ষুদ্রকায় ফিল্ম, ১০টি ডকুমেন্টারি এবং ৩টি অ্যাডভারটাইজমেন্ট ফিল্ম তৈরি করেছিলেন। এর পরপরি আসে ঢাকাইয়া চলচ্চিত্র, যেখানে ঢাকার নবাব পরিবার ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি নামে একটি প্রোডাকশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান দুটি ফিল্ম তৈরি করে প্রদর্শন করেছিলেন, যার নাম হলো যথাক্রমে 'সুকুমারী' (স্বল্পদৈর্ঘ্য ৪ রিল, ১৯২৭-২৮ সাল) এবং 'দ্য লাস্ট কিস' (দৈর্ঘ্য ১২ রিল, ১৯৩১ সাল)। এ দুটিই ছিল শব্দ ও কথোপকোথনবিহীন ছবি, যার পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ক্রীড়াশিক্ষক অম্বোজ গুপ্ত। তখনকার সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাত ইতিহাসবিক অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার 'দ্য লাস্ট কিস' শোটির শুভ উদ্বোধন করেছিলেন মুকুল সিনেমা হলে (যা বর্তমানে আজাদ সিনেমা হল)। সিনেমাটি প্রায় একমাস প্রদর্শিত হয়েছিল।

তারপর ১৯৪৭ এর ভারত বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা হওয়ায় নতুন করে সাংস্কৃতিক চর্চা শুরু হয় বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম উদ্যোগক্তাদের সহযোগিতায়। আব্দুল

* অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা;
ই-মেইল: mihir.city@gmail.com

জব্বার খান ১৯৫৪ সালে 'মুখ ও মুখোশ' ছবির কাজ শুরু করেছিলেন, যা মুক্তি পায় ৩ আগস্ট ১৯৫৬ সালে, যা বাংলা সিনেমার জগতে একটি উজ্জ্বলতম পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। সবাক চলচ্চিত্র হিসাবে যদি এটিকে ভিত্তি ধরা হয়, তবে ৬০ বছর পাড় করেছে এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্প। সেই সময় প্রয়োজন দেখা দিল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর এবং যুক্তফ্রন্ট তখন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতায় আসীন, যার বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান, যা ১৯৫৭ সালের কথা। যখন এ দেশে মাত্র যে কয়েকজন মানুষ চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তাভাবনা শুরু করছলিনে। বঙ্গবন্ধুও তাদের সহযাত্রী ছিলেনে। পাকিস্তান শাসনামলে চলচ্চিত্র সচেতন কয়েকজন ব্যক্তি চলচ্চিত্র সম্পর্কে নানা সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক বঙ্গবন্ধুর কাছে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করছিলেন। ফলে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু এই অনিবার্যতাকে উপলব্ধি করেই চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন। যারা বঙ্গবন্ধুর কাছে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার তদবির করতে গিয়েছিলেন, তাদের অবাক করে দ্রুত সংশ্লিষ্টদের বসিয়ে ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তুত করে দিতে বলেছিলেন। চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এই উত্তেজনায় তারা দ্রুতই ওয়ার্কিং পেপার বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেন। এফডিসি প্রতিষ্ঠার জন্য যাদের অদম্য আগ্রহ ছিল, তাদের অন্যতম ছিলেন নাজির আহমদ। তিনি লিখেছিলেন, "আমার স্পষ্ট মনে আছে। অধিবেশনের শেষ দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিএফডিসি ও ইপসি প্রতিষ্ঠার জন্য একহাতে দুটি বিল পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাধায় বিলটি পাস হয়ে যায়। তখন উৎফুল্ল শেখ সাহেব বলেছিলেন "এফডিসি তো হয়ে গেল, আসগর আলী শাহকে চেয়ারম্যান বানিয়ে দিয়েছি ও আবুল খায়েরকে এমডি। এখন চলচ্চিত্রেরে জন্য কাজ করুন গিয়ে।' তাঁর উৎসাহ না থাকলে বোধ হয় এ দেশে এফডিসিরি জন্ম হতো না। আর হলেও হতো অনেক দেরিতে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও চলচ্চিত্র ভালোবাসেন বঙ্গবন্ধুও ভালোবাসতেনে। জাতির পিতার হাতেই এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালির নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর বৈচিত্র্যময় উদ্যোগের একটি এফডিসি প্রতিষ্ঠা। এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর ফাতেহ লোহানী পরিচালিত প্রথম ছবি 'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯)ও দ্বিতীয় ছবি 'আসিয়া' মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে, যা তদানীন্তন পাকিস্তান শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলেও এই শিল্পটি সর্বদা সঠিক পথে চলতে পারেনি। স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়েও বঙ্গবন্ধুর উদ্বিগ্নতা আমরা দেখেছি। দুষ্ট ব্যবসায় বুদ্ধির বিপরীতে স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পটও স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারেনি। ১৯৫৯ স্যালে আরও মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'এ দেশ তোমার আমার', 'মাটির পৃথিবী' ইত্যাদি। তারপর একে একে রাজধানীর বুকে (১৯৬০), হারানো সুর (১৯৬১), যে নদী মরু পথে (১৯৬১), কখনো আসেনি (১৯৬১), তোমার আমার (১৯৬১), জোয়ার এলো (১৯৬২), নতুন সুর (১৯৬২), সোনার কাজল (১৯৬২), সূর্য স্নান (১৯৬২), ধারাপাত (১৯৬৩), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), নাচঘর (১৯৬৩), তালাশ (১৯৬৩), বন্ধন (১৯৬৪), মেঘ ভাঙ্গা রোদ (১৯৬৪), মিলন (১৯৬৪), অনেক দিনের চেনা (১৯৬৪), সঙ্গম (১৯৬৪), সুতরাং (১৯৬৪), আখেরি স্টেশন (১৯৬৫), বাহানা (১৯৬৫), একালের রুপকথা (১৯৬৫), গুধুলির প্রেম (১৯৬৫), জানাজানি (১৯৬৫), কাজল (১৯৬৫), মালা (১৯৬৫), নদী ও নারী (১৯৬৫), সাগর (১৯৬৫), সাত রং (১৯৬৫), ডাক বাবু (১৯৬৬), কাগজের নৌকা (১৯৬৬), কার বউ (১৯৭৬৬), মহুয়া (১৯৬৬), আয়না ও অবশিষ্ট (১৯৬৭), আনোয়ারা (১৯৬৭), আলীবাবা (১৯৬৭), চাওয়া-পাওয়া (১৯৬৭), চকুরী (১৯৬৭), নবাব সিরাজদৌল্লা (১৯৬৭) ইত্যাদি। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ১৯৬৪ সালে প্রথম একটি উর্দু ছবি সঙ্গম তৈরি করেছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে তারই পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

জীবন থেকে নেওয়া (১৯৭০), স্টপ জেনোসাইড (১৯৭২) ইত্যাদি মুক্তি পেয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার লোককথাভিত্তিক চলচ্চিত্র মনোমুগ্ধকর ছিল। এরপরও ষাটের দশকে এ দেশে অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছিল, যা প্রেক্ষাগৃহে বসে পরিবার নিয়ে দেখার মতো ছিল। সেসব ছবির নায়ক-নায়িকায় জুটি হিসাবে ছিলেন শবনম-রহমান, নাদিম- শাবানা, সুভাস দত্ত-কবরী, আজিম-সুজাতা, রাজ্জাক-সুচন্দা, সুলতানা জামান-আমীর হোসেন প্রমুখ।

তারপর দীর্ঘ সময়ের পথপরিক্রমার পর স্বাধীনতত্তোর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে একটি মিশ্র ফলাফল লক্ষ করি এবং বিচার বিশ্লেষণে সত্তরের দশকটি ছিল এই শিল্পের সোনালী যুগ। যদিও এর পরে অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে। যেমন আদম সুরত, মাটির ময়না, আগুনের পরশমণি, শ্রাবন মেঘের দিন, ওরা এগার জন, গেরিলা, সংশপ্তক, নীল আকাশের নিচে, গোলাপী এখন ট্রেনে, বিন্দু থেকে বৃত্ত ইত্যাদি। তারপর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রজোজনায় অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে। যেমন পালঙ্ক, তিতাস একটি নদীর নাম, পদ্মা নদীর মাঝি, মনের মানুষ, শঙ্কচিল, দহন ইত্যাদি। তবে এরপর চলচ্চিত্র অঙ্গনে সৃষ্ট নানা সংকট এখনো কাটেনি বিভিন্ন পলিসিগত কারণে, যা কোনোভাবেই আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির সাথে সহায়ক ছিল না। এর ফলে দর্শক সিনেমা হল-ভিত্তিক না হয়ে ঘরমুখী হয়েছে। ভালো ছবি না আসায়, তারা টিভি সিরিয়াল উপভোগ করেছে পরিবার নিয়ে। বিশেষত কলকাতাভিত্তিক বাংলা সিনেমাগুলোর বিষয়ে প্রটেকশনের নামে চলচ্চিত্রের শৈশবকে আমরা প্রলম্বিত করছি মাত্র, সাবালক হতে দিইনি এবং অগণিত দর্শকের অধিকার রয়েছে সিনেমা হলে গিয়ে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন স্বাদের চলচ্চিত্র উপভোগ করার, যেখানে সুদূর আমেরিকা থেবে ছবি আমদানি হলে প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের ছবি কেন আসতে পারবে না। ২০০৬ সাল থেকেই খোদ পাকিস্তানেই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়েছে এবং ২০০5 সালে যেখানে সারা পাকিস্তানে ২০টি সিনেমা হল ছিল, বর্তমানে তা ২০০ অতিক্রম করেছে। বড় বড় শহরে তৈরি হয়েছে মাল্টিপ্লেস। স্থানীয় চলাচ্চত্র নির্মাণে এসেছে পরিবর্তন, যা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রে। বাংলাদেশের চেয়ে দুর্বল অর্থনীতির দেশ নেপালেও ১৮০টি সিনেমা হলের মধ্যে ৫৮টি সিনেপ্লেস রয়েছে। বাংলাদেশে ১৯90 থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যেখানে ১২০০ সিনেমা হল ছিল, যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ টিতে (সূত্র: ইউএনবি নিউজ, সেপ্টেম্বর,২০২০)।

১.১. চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সরকারি নীতি

অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেছেন। চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নের জন্য অল্প সুদে এই তহবিল ব্যয়িত হবে । চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ যদি মেনে চলেন, তাহলেই হয়তো হয়ে উঠবে আমাদের ভালো চলচ্চিত্র। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন ইস্যুকে সিনেমাতে তুলে এনে সামাজিক বার্তামূলক চিত্রনাট্য হলে সেটা অনেকেই দেখতে চাইবেন। এখনকার সিনেপ্লেক্সগুলোতে যখন মানুষ যায়, তখন বাংলা থেকে ইংরেজি সিনেমাই বেশি দেখতে যায়। কারণ সিনেপ্লেক্সেএ খুব কম বাংলা সিনেমা দেখানো হয়। আর হলেও অত টাকা খরচ করে বাংলা সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করে না। কারণ, একটা বাংলা সিনেমা শুরু হলে গল্পের শেষে কী হবে তা আগেই আঁচ করা যায়। আমাদের ভালো কনটেন্টের অভাব হওয়ার কথা নয়। মোগল-ব্রিটিশ-পাকিস্তান বিজয় করা বাংলাদেশিদের বহু ভালো বিষয় আছে। জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নানা চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়ে আসছে। এ দেশের সুস্থধারার চলচ্চিত্রগুলোর

মধ্যে একটি বড় অংশজুড়ে আছে এই মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্রগুলো। ওরা ১১ জন, সংগ্রাম, একাত্তরের যীশু, হাঙ্গর নদীর গ্রেনেড সিনেমাগুলোতে যেমন উঠে এসেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা, তেমনি আছে নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসার এক অকৃত্রিম টানের চিত্র। শিশুদের জন্য সিনেমা নির্মাণ হওয়ার সময়ের দাবি। শিশুতোষ চলচ্চিত্র বা অ্যানিমেশন অভাবে আমাদের সোনামণিরা বিদেশি অ্যানিমেশন বা কার্টুন-গেমসে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো সুস্থ চলচ্চিত্র বিমুখ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকার ২০১২ সালের ২ এপ্রিল এক নির্বাহী আদেশে চলাচ্চিত্রকে শিল্প ঘোষণা করেছে, যাতে উল্লেখ আছে অন্যান্য শিল্পের মতোই যাবতীয় সুযো-সুবিধা পায় এই শিল্প। কিন্তু এই শিল্পের সাথে সংশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিকারকরো কোনো সুযোগ-সুবিধাই পাচ্ছেন না। চলচ্চিত্র শিক্ষায় সংকট এই শিল্পের বড় দর্বলতা। সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পাঠদান ও গবেষণা মাত্র শুরু হয়েছে যার সুফল পেতে আমাদের আরও অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, এসব শিক্ষার্থীর কতজনই বা এই শিল্পের সাথে যুক্ত থাববে, তা এখনো ভেবে দেখার বিষয়। সরকারের ফিল্ম আর্কাইভ ও ইনস্টিটিউট কী কাজ করছে, তা বোঝা যায় না। দেশের নায়ক-নায়িকা যারা বর্তমানে এই শিল্পে কাজ করছেন, তাদের অনেকেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ নেই বললেই চলে। ঢাকার কবীরপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম ইনস্টিটিউট করার কথা সরকারের রয়েছে, যেটিকে ভারতের পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আদলে যদি করা গেলে চলচ্চিত্র শিক্ষা ও গবেষণা অনেক গতি পাবে। কারন, চলচ্চিত্র হচ্ছে সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, আলোকচিত্র ইত্যাদির মৌলিক শিল্প মাধ্যমের একটি রূপ।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "চলচ্চিত্র শিল্প আজ নানামুখী সংকটের মধ্য দিযে যাচ্ছে এটি সঠিক। কিন্তু এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র শিল্পীদের বহুদিনের দাবি প্রধানমন্ত্রী পূরণ করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিনেমা হল পুনর্নির্মাণ, বন্ধ হল চালু করা ও নতুন হল নির্মাণের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠিত হয়েছে।" এখন দেশ করোনায় আক্রান্ত, যার ফলে ১৮ মার্চ, ২০২০ থেকে সিনেমা হল বন্ধের সরকারি নির্দেশনা জারি হয়েছিল এবং প্রায় আট মাস পর খুলছে সিনেমা হল যা শুক্রবার ১৬ অক্টোবর,২০২০, থেকে হলগুলোতে সিনেমা প্রদর্শনীর অনুমতি দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। তবে অনুমতি মিললেও আশানুরূপ দর্শক না হওয়ার আশঙ্কায় ছবি মুক্তি দিতে চান না প্রযোজকেরা। আর নতুন ছবি না হলে অনেক মালিকই হল খুলবেন না। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে সিনেমা হলের আসনসংখ্যা কমপক্ষে অর্ধেক খালি রাখার শর্তে এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" কয়েক মাস ধরেই চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারের কাছে আবেদন করে আসছেন সিনেমা হল খোলার জন্য। হল খোলার অনুমতি মিললেও সিনেমা প্রদর্শনীর জন্য কতটা প্রস্তুত হল মালিকেরা কিংবা সিনেমা মুক্তি দিতে প্রযোজকেরা কতটা আগ্রহী—এ প্রশ্ন এখন চলচ্চিত্রাঙ্গনে। এখন প্রধানমন্ত্রী এই শিল্পের জন্য যে প্রণোদনা ঘোষণা দিয়েছেন, তার সফল বাস্তবায়ন হোক এই প্রত্যাশা রইল।

২. লোকজ সংস্কৃতির বাহক যাত্রা শিল্প

২.১ যাত্রা শিল্পের বিবর্তন: বিশ্বয়ানের আকাশ সংস্কৃতি বাঙালির এককালের বিনোদনের প্রধান বাহক যাত্রাপালাকে গ্রাস করে বসেছে অথচ যাত্রার কথা মনে হলে পুরানো ইতিহাস, মহষী ব্যাক্তিত্ব, লোকজ সাহিত্য, বিখ্যাত চরিত্র ইত্যাদির কথা মানস পটে ভেসে উঠে । রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছিলেন,

যাত্রায় লোকজ শিক্ষা হয়। মহানায়ক উত্তম কুমার বলেছিলেন, যাত্রা হলো একটি মোটা দাগ এবং তিনি তার মাত্র ১৩ বছর বয়সে জীবনসঙ্গীনি বইতে বলরামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কলকাতার জনতা অপেরায় । উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-এর চিত্রনাট্য রূপ দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় । এই চলচিত্রে একটি যাত্রাপালা রয়েছে, যা সার্বিক কাহিনীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এই আদি লোকজ সংস্কৃতি সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগে, যখন মানুষ দেবদেবীর বন্দনা করত এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা ঘুরে বেরাত। গ্রামাঞ্চলে প্রবাদ আছে 'মঙ্গলের উষা যাত্রা বোধের পা যথা ইচ্ছা তথা যা'—এখান থেকেই যাত্রা কথাটির উৎপত্তি।

তথ্য বলছে, ১৫০৯ সালে যাত্রার সাথে অভিনয় যুক্ত হয় শ্রী চৈতন্য দেবের সময়ে এবং 'রুক্ষিণী হরণ' প্রথম যাত্রাপালা। শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের আগেও রাঢ়, বঙ্গ সমতট, গৌড় চন্দ্রদ্বীপ, হরিকেল শ্রীহট্রসহ সমগ্র ভূখণ্ডে পালাগান ও কাহিনী কাব্যের অভিনয় প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশে শিবের গজল, রামযাত্রা, বেষ্টযাত্রা, সীতার বারোমাসী, রাধার বারোমাসী, নৌকাবিলাস, নিমাই সন্ন্যাস, ভাওয়াল সন্ন্যাস ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে যাত্রা বাংলার ভূখণ্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যখন শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, সুবল দাস প্রমুখ ছিলেন যাত্রাজগতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব । ঊনবিংশ শতকের শেষে যাত্রায় পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক পালা এবং বিংশ শতকের শুরুতে যাত্রায় দেশপ্রেমমূলক কাহিনীর অভিনয় শুরু হয়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা অভিনিত হয়েছিল। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রখ্যাত পালাকার বরিশাল নিবাসী শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত বাগদত্তা, গরিবের মেয়ে, গলি থেকে রাজপথ, রিক্তা নদীর বাঁধ ইত্যাদিসহ আরও অগণিত পালা গ্রামবাংলার মানুষের মনে এখনো স্থান করে রেখেছে। বাংলাদেশের যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস ও তার সহধর্মিনী জ্যোৎস্না বিশ্বাস তাদের যাত্রাদল চারুনিক নাট্যগোষ্ঠীর বিশেষত মাইকেল মধুসূধন পালাটি জনমনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তা ছাড়া তোষার দাস গুপ্ত ও শর্বরী দাস গুপ্তর পরিচালনায় তুষার অপেরা, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের নবরঞ্জন অপেরার মালিক চিত্তবাবু ও তদীয় স্ত্রী বীনা রানীর অভিনীত 'বাগদত্ত' এখনো দর্শকদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রোমান্টিকতার দিকে নিয়ে যায় ।

স্বাধীনতাপূর্ববর্তী ষাটের দশক কিংবা তারও আগে তখনকার মানুষের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার মানসিকতা যেভাবে সমাজ-সংস্কৃতির জগৎকে প্রভাবিত করত, তা সত্যিই ছিল বিস্ময়কর। তখন প্রতিটি জেলায় শীতের সময়ে প্রদর্শনী হতো, যেখানে যাত্রা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পুতুল নাচ ছিল প্রধান আকর্ষণ। যাত্রা শিল্পের নান্দনিক ও শৈল্পিক মূল্যবোধই ছিল উদ্যোগক্তাদের প্রধান লক্ষ্য। তখনকার সময় প্রায় স্কুলেই যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হতো, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্থিকভাবে স্কুলকে সহায়তা করা এবং শিক্ষামূলকপালাগুলোই যেমন মাইকেল মধুসূদন, ভাওয়াল সন্নাসী, ভক্ত রামপ্রসাদ, গলি থেকে রাজপথ, আনারকলি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হাওড়বেষ্টিত অঞ্চলগুলোতে লোকসংস্কৃতিতে এত সমৃদ্ধ ছিল যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গানবাজনার আয়োজন থাকত এবং ভাসানযাত্রার আয়োজন হতো বিয়ে কিংবা পুজার আসরে। পূর্ব ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের অধ্যাপক ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের ময়মনসিংহের গীতিকার 'মহুয়া মলুয়া'র যাত্রাপালার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাতভর যাত্রাপালা উপভোগ মজাই আলাদা। একদিকে গানের কপেট অপরদিকে প্রমোটারের নির্দেশনা সবাইকেই কিছু সময়ের জন্য হলেও মুগ্ধ করে রাখত দর্শকদের। আবার গ্রামগঞ্জে প্রবাদ আছে 'যাত্রা শুনে ফাতরা লোকে'। যাত্রা একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার

হলেও সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং এখানে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যাত্রাপালা। একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল, যা স্মরণে রাখার মতো। পশ্চিম বাংলার গ্রামেগঞ্জে শহরে ‘আমি শেখ মুজিব বলছি’ নামক তরুণ অপেরার যাত্রাপালা মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সেখানকার মানুষের তথা সমাজের সমর্থন জুগিয়ে ছিল।

এখন আমি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের যাত্রা শিল্পের অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই। তখন সারা দেশে যাত্রা দলের সংখ্যা ছিল ৩০০-এর বেশি এবং আমরা রাজনৈতিক তথা ভৌগলিকভাবে একটি স্বাধীন দেশ পেলেও বিশ্বাস ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানুষগুলো তেমন দেখা যায়নি, যা যাত্রাশিল্পের উপড়েও পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকে দেশ ছেড়েছে আবার অনেক সংগঠনসহ বাদ্যযন্ত্র কলাকুশলীগণ হারিয়েছে, যারা নতুন করে সংগঠন তৈরিসহ অর্থের বিনিয়োগসহ নতুনভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল, যারা সংগঠক হিসেবে আসল তাদের নৈতিক ভিত্তি পূর্বের মতো ছিল না এবং এতে নতুনভাবে যোগ হলো মুনাফা লোভ ও অশ্লীলতা। গ্রামীণ মেলাগুলোতে চলে জুয়ার হাউজির আসর ও অশ্লীল নোংরা নৃত্য। এ কারণে শুরু হয় যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সত্তরের দশকের শেষের দিকে এটি চরম রূপ নেয় এবং এই ধারা পড়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। সাধারণ আগ্রহী দর্শকেরা যাত্রাপালার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ায় এই ব্যবসায় ধস নামে। বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প সমিতির সভাপতি ও দেশ অপেরার মালিক বিমল কান্তি বলেন, যাত্রা শিল্পের সোনালী দিন ছিল ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত, যখন যাত্রাদলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিন শতাধিক এবং শিল্পকলা একাডেমিতে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ছিল ১১১টি কিন্তু। কার্যত টিকে আছে ৩০টি মতো দল ও তিন বছর ধরে যাত্রাপালা বন্ধ ছিল ।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে সাত মাস (আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস) যাত্রাভরা মৌসুম যার শুরুটা হয় দুর্গা পূজায় আর শেষ হয় পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু প্রশাসন এখন আর যাত্রাগান আয়োজনে অনুমোদন দিতে আগ্রহী নয় নিরাপত্তাজনিত কারণে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিবছর যাত্রাদলের নামে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক যাত্রাদলের কাছ থেকে নির্ধারিত ফি বাবদ টাকা গ্রহণ করে থাকে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শিল্পের উন্নয়নে কোনো কাজ করে না। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ৪৮ বছরে মাত্র পাঁচবার জাতীয়ভাবে যাত্রা উৎসব শিল্পকলা একডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এবং প্রথম বছরটিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল খুলনার শিরীন অপেরার অভিনীত ‘নিহত গোলাপ’ পালার জন্য। তারপর সর্বশেষ ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমী ঢাকার বাছাই করা সাতটি দল নিয়ে তিনবার যাত্রা উৎসব করেছিল। কিন্তু এরপর এই প্রতিষ্ঠানটির আর তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এই শিল্পের নেতারা বলছেন, প্রতিটি দলে শিল্পী ও কলাকুশল নিয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক লোক, যাদের মধ্যে কেউ বংশীবাদক, তবলচি, করোনেট বাদক, প্রম্পটার ইত্যাদি। এই হিসাব যদি সত্যি হয়, তবে তিনশত দলে সারা দেশে প্রায় ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান তথা জীবন-জীবিকা এই শিল্পের সাথে জড়িত। নিয়মিত পালা না হওয়ায় এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত অভিনেতা অভিনেত্রী গায়ক বাদক পালাকাররা চলে যাচ্ছে পেশা ছেড়ে এমনকি দেশ ছেড়ে। এখন পর্যন্ত যারা টিকে আছে কোনো ভাবে তাদের সংখ্যা ১০টির মতো।

এমতাবস্থায় বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে বাঙালির এককালের বিনোদনের প্রাধান অনুষঙ্গ যাত্রাপালা। আকাশ সংস্কৃতির প্রভার, হাতের কাছে বিনোদনের সহজলভ্যতা, অশ্লীল নৃত্য আর জুয়ার আর্বতে পড়ে বাঙালির লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য আজ সংকটাপন্ন। এদিকে নেত্রকোনার যাত্রাশিল্পী গৌরাঙ্গ আদিত্য আমাকে

জানালেন, খুবই করুণ অবস্থা দিন কাটাতে হচ্ছে গানের টিউশনি করে। অথচ এককালে বিবেকের অভিনয় করে সুরেলা কণ্ঠে আসর মাতাতেন সেই গৌরাঙ্গ। একসময় দেখা যেত যাত্রার ওপর বাংলাদেশ টেলিভিশনএ এক সপ্তাহে না হলেও মাসে দু-একবাার অনুষ্ঠান হতো কিন্তু এখন আর হয় না। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে রমনা বটমূলসংলগ্ন মাঠে যাত্রাপালার আয়োজন করা হতো। কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। যারা পালাকার ছিল, তারা আর নেই। যারা নৃত্যের মাস্টার ছিল, তারা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গেছেন। যারা বাদ্যযন্ত্রী ছিল, তারা মারা যাওয়ায় তাদের প্রজন্ম এ পেশায় আসতে ইচ্ছুক নয়। এমতাবস্থায় এসব পেশা যদি আকর্ষণীয় না করা যায়, তবে শিল্প হিসাবে এর বিকাশ কোনোভাবেই সম্ভব হবে। না এই অপসংস্কৃতির যুগে এখন প্রয়োজন দেশীয় লোকজ সংস্কৃতি রক্ষায় সবার ঐকমত্য বিশেষত শিল্পী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে, যা সময়ের দাবি এবং এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো—

(১) সরকারি বাজেটের আওতায় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া যাত্রাশিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, এটাই সত্যি। এখন বিষয়টি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতায় শিল্পকলা একাডেমী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যারা প্রতিবছর যাত্রাদলগুলোর কাছ থেকে নিবন্ধন নিয়ে থাকে। সত্যি কিন্তু তার পরিবর্তে যাত্রা দলগুলো কী সুবিধা ভোগ করছে তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানকে তাদের বাজেট থেকে অনুদান দিয়ে থাকে যেমন ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তাই যদি হয় তবে লোকজ সংস্কৃতির বাহক হিসাবেযাত্রা দলগুলো তাদের সংগঠিত করার জন্য সরকারি অনুদান পেতে পারে, যা সময়ের দাবি। সম্প্রতি আগামী বছরের বাজেট ঘোষিত হয়েছে যেখানে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বাজেট খুবই অপ্রতুল, যা দিয়ে যাত্রা শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন সতিতিও সময় সময় একই আশা ব্যক্ত করে থাকে। যেমন বর্তমান সরকার বিগত ১৩ জুন ২০১৯ ঘোষিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় সংসদে যে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯৪ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে, যা বর্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রথম বাজেট উপস্থাপন, বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ১১তম বাজেট এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৪৯তম বাজেট উপাস্থাপন। এই বাজেট উপস্থাপনায় ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা, ২,০৭,৭২১ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা আর ১,৪৫,৩৮০কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে যার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাজেটের সম্পদের ব্যবহারে বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম খাতে রয়েছে মাত্র ০.৯ শতাংশ এবং পরিচালন খাতে রয়েছে ০.৮%। এখানে উল্লেখ্য, একটি যাত্রা দলের আধুনিকায়নের জন্য বিনিয়োগের একটি বড় অংশ যায় পোশাক তৈরিতে, যা আবার ঐতিহাসিক পালা কিংবা সামাজিক পালার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়, যা মালিকের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই মোটা অনুদান কিংবা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

(২) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা বিভাগ যাত্রাশিল্পীর ক্ষেত্রে এত উদাসীন কেন? এই প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে এবং কেবল উদ্যোগের অভাবে আগের জাতীয় যাত্রা উৎসব আয়োজনে তারা পিছপা হচ্ছে, যা সংস্কৃতির অঙ্গনের জন্য ক্ষতিকর। দর্শকের কাছ থেকে যে চাঁদা আহরিত হবে, তা দিয়ে এসব আয়োজনের খরচ মেটানো সম্ভব। অথচ এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্য অনেক বেশি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের দক্ষতাকে প্রমাণ করে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির এক অপূর্ব মাধ্যম বলে বিবেচিত। শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কার একটি দলের ফেস ভ্যালু বাড়াতে সহায়ক। অনেক দিন পরে হলেও বাংলাদেশের যাত্রা সম্রাজ্ঞি জোৎসনা বিশ্বাসকে সরকার একুশে পদকে ভূষিত করে যাত্রা শিল্পকে সম্মানীত করেছে। এই ধরনের পুরস্কার মরণোত্তর হলে চারনীকের প্রতিষ্ঠাতা অমলেন্দু বিশ্বাসও পেতে পারে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা অরুণা বিশ্বাস বর্তমান চলচিত্রের সাথে জড়িত রয়েছে।

(৩) যাত্রা, চলচিত্র, নাট্যকলা, সংগীত প্রভৃতির সমধর্মী হলেও এদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিংবা শ্রেণিগত পার্থক্য রয়েছে। একমাত্র যাত্রা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব ইনস্টিটিউট রয়েছে, যার মাধ্যমে এসব শিল্পের কলাকুশলীরা প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগ রয়েছে। নাট্যকলার হিসাবে যাত্রা বিষয়ে কোনো পড়াশোনা কিংবা প্রশিক্ষণ আছে বলে মনে হয় না। এমনকি শিল্পকলা একাডেমী এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ভাবনার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। সেই হিসাবে সুস্থ ধারার সংস্কৃতিক চর্চা পালনে নীতি সহায়তা প্রদান সরকার করে যেতে পারে যদিও এর বাস্তবায়ন প্রশ্ন বিদ্ধ হতে পারে।

(৪) সমালোচকেরা বলছেন, সমসাময়িককালে যাত্রাশিল্পের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে ধাবিত হওয়ার মূল কারণ অসাধু যাত্রাপালার ব্যবসায়ীদের প্রিন্সেস আমদানি আর জুয়া হাউজি চালু, যা পূর্বে ছিল না। এসবই চিরায়িত যাত্রাপালার মৃত্যুর কারণ। প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর হলেও স্থানীয় সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের সহায়তায় এই অশুভ কাজগুলো চলতে থাকে জেলা উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসন যদি সক্রিয় হয় তবে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ ধারার যাত্রা পালা আয়োজন করা সম্ভব হবে। কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে নয়।

(৫) যাত্রাপালা সাহিত্য-সংস্কৃতির তথা লোকজ শিক্ষার বাহক বিধায় এর ওপর প্রয়োগধর্মী গবেষণা একেবারেই অপ্রতুল এমনকি দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়টির তেমন কোনো উপস্থিতি লক্ষণীয় হয় না, যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দুর্বল দিক। আবার যারা সাহিত্য কিংবা নাট্যকলা বিভাগে গবেষণা করে তাদের যাত্রাশিল্পের ওপর এমফিল কিংবা পিএইচডি করতে দেখা যায় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চতর গবেষণা বিভাগগুলোকে এই বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী বাংলাদেশের যাত্রা দলগুলোর ওপর একটি পুঞ্জিকা বা ডাইরেক্টরি তৈরি করতে পারে, যেখানে তাদের দাপ্তরিক ঠিকানাসহ কলাকুশলীদের জীবনবৃত্তান্ত ও পালাকারদের পরিকল্পনা উল্লেখ থাকবে। সর্বশেষ বলা যায় যে সরকার এই প্রাচীন শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখবে তার বাজেটারি কাঠামোতে এবং যাত্রা শিল্প ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে, যা শিল্পী কলাকুশলীদের প্রশিক্ষণ তথা গবেষণার ক্ষেত্র হতে পারে।

৩. উপসংহার

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি ও বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে বঁচিয়ে রাখতে হবে অর্থনীতির স্বার্থে। কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকা। তা ছাড়াও মনের স্বাস্থ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলেও এর কোনো বিকল্প নেই ।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৩৫-২৪০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গবেষণা: কেরালা মডেল ও বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

মিহির কুমার রায়*

সারসংক্ষেপ *এই প্রবন্ধটি তৈরির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো করোনা ব্যবস্থাপনায় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের আলোকে কেরালা মডেলের প্রাসংঙ্গিকতা ও বাংলাদেশের সঙ্গে একটি তুলনামুলক পর্যালোচনা যা থেকে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধটি তৈরীতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সেকেন্ডারি উৎস থেকে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এই অভিঙ্গতা কাজে লাগিয়ে অনেক মহামারির মোকাবেলা করতে পারে।*

মূল শব্দ *ভাইরোলজি · লকডাউন মডেল · রোগীর ক্লাস্টার · কেরালা মডেল · সামাজিক কর্মসূচি*

ভূমিকা

১. করোনা ভাইরাসের গতি-প্রকৃতি

করোনা ভাইরাস নিয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এই তিনটি কাজ একেবারেই ভাইরোলজি, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদির বিষয় বিশেষত মেডিক্যাল সায়েন্স বা বায়োলজিক্যাল সাইন্সের বিষয় নিয়ে যারা গবেষনায় রত তারাই অনুধাবন করতে পারেন। করোনাভাইরাস আসার ফলে আমরা এর মাহাত্ম্য, গভীরতা ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারছি যা এর আগে এমনটি হয়নি। যে ভাইরাস এ রোগ ছড়ায় সেটিই করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এবং জিনগত বৈশিষ্ট্য ও ভাইরাসের পরিবারের বিবেচনায় এর নামকরণটি করে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি। সে কারণেই রোগ ভেদে নামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যেমন এইডস রোগের ভাইরাস এইচআইভি নামে পরিচিত। আমরা করোনা পরিবারের চারটি ভাইরাস নিয়ে চলছি যা সাধারন জ্বর-কাশির সৃষ্টি করে যা মারাত্মক নয়। এই পরিবারের পাঁচ নম্বর ভাইরাসের কারণে সার্স রোগের উৎপত্তি হয়, যার কারণে ২০০৪ সালে বিভিন্ন দেশে ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। করোনা পরিবারের ষষ্ঠ ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগের নাম মার্স, যার প্রভাবে ২০১২ সালে আক্রান্ত হয়ে আক্রান্তের ৪৪ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। আবার করোনা পরিবারের

* অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা;
ই-মেইল: mihir.city@gmail.com

৭ম সদস্য হিসাবে সার্স-কভি-২ নামে ভাইরাস কোভিড-১৯ ২০১৯ সালে অতর্কিতে আক্রমণ করে সারা বিশ্বকে তছনছ করে দিচ্ছে, যা এক নতুন অভিজ্ঞতা মাত্র। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লু ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল। এতে কোটি কোটি লোকের মৃত্যু হয়েছিল। আবার দুইটি ভাইরাস যেমন জল বসন্ত (ভেরিওলা) ও রিনডারপেস্ট নির্মুল হয়েছে সত্যি। কিন্তু এর জন্য ভাইরাসের বংশ বিস্তার, ক্ষেত্র, টিকা, চিকিৎসা, অর্থ, সরকারের অঙ্গীকার ও সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে উপস্থিত করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বয়স মাত্র ১৮ মাস এবং এরই মধ্যে সারা বিশ্বের ১০০টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই রোগের টিকা আবিষ্কারে নিরলস কাজ করে চলছে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় কোভিড-১৯ ও এর ভাইরাস নিয়ে প্রায় ১৫ হাজার গবেষণাপত্র রয়েছে। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেমন প্রিকোশন, প্রিভেনশন, প্রমোশন, প্রটেকশন, পারসোয়েশন এবং প্রতিকার। এর প্রস্তুতি ও প্রতিকার হিসাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, রোগীকে আলাদা রাখা, এলাকা লকডাউন, মাস্ক ব্যবহার, সেনিটাইজার দিয়ে ঘনঘন হাত ধোয়া, রোগ শনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা, গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ, হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি, অনলাইন পরামর্শ ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের বহনমুখী মাধ্যম থাকায় এর প্রকোপ বাড়ছে। এই প্রজাতির ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা যেমন বহুবিধ তেমনি মানুষের শরীরে এর আক্রমণ ক্ষমতাও বহুবিধ। এটি পরিপাকতন্ত্র, ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক বাড়িয়ে দেয়। এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পৃথিবীজুড়ে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। তেমনি আছে রোগ নিরাময়ের ও ওষুধ আবিষ্কারের সফল প্রয়াস। বর্তমানে চিকিৎসার জন্য চারটি পদ্ধতি আছে যেমন এন্টিবডি থেরাপি, এন্টিভাইরাস থেরাপি, প্লাজমা থেরাপি ও অন্যান্য রোগে ব্যবহৃত ওষুধের প্রয়োগ।

২. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) নিরাময়ে প্রায়োগিক গবেষণার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

এখন আসা যাক প্রায়োগিক গবেষণার দিক থেকে বিশ্ব কিংবা আমরা কোথায় আছি বা থাকব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে জনঘনত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ-সংস্কৃতির বিবেচনায় করোনা সংক্রমণ নিরসনে সব দেশকেই নিজস্ব পদ্ধতি কিংবা মডেল উদ্ভাবন করা উচিত। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য গবেষকেরা বলছেন, জুলাই-আগস্ট মাস করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পিক মৌসুম থাকবে যদি বৃষ্টির প্রবণতা বেশি হয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে। বিশ্বের ২১০টি আক্রান্ত দেশে ও অঞ্চলের মানুষ ভাইরাস বহন করেই তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বেঁচে থাকতে হবে, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হবে বিশেষত কোনো ধরনের প্রতিষেধক ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার না হওয়ার কারণে যদিও গণমাধ্যমে জানা যায় গবেষণা শুরু হয়েছে, যার অগ্রগতির ফলাফল পেয়ে ওষুধ বাজারে আসতে আরও অনেক সময় লাগবে যদিও ভ্যাকসিনই একমাত্র রক্ষাকবচ, যার চাহিদা অনুসারে সরবরাহ অপ্রতুল। বাংলাদেশে চিকিৎসা গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, আইসিডিডিআরবি ও রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। তা ছাড়াও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সায়েন্স অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি ও ভাইরোলজি বিভাগও এই বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। করোনা পরিস্থিতির থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় থাকলেও তা অনেকটা ব্যবহারিক পর্যায়ে থেকেই নিতে হবে, যা আমাদের মানুষের জন্য অনুশীলন কিছুটা কঠিন ।

এখন আসা যাক বাংলাদেশ উদ্ভাবিত লকডাউন মডেল, যা এরই মধ্যে সফল প্রমাণিত হয়েছিল গত বছর জারীকৃত ঢাকার পূর্ব রাজাবাজার এলাকায়, যেখানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রশাসনিকভাবে সহায়তা করে ছিল। তিন সপ্তাহব্যাপী এই লকডাউনে যৌক্তিক কারণ ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া

হয়নি এবং নিরাপত্তাকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী দল চাহিদামাফিক ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েছে। সেই এলাকায় করোনা পরীক্ষার জন্য চিৎিসা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল এবং যাদের পজেটিভ এসেছিল, তাদের করোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিন সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হলে সেই লকডাউন পরিহার করে দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার ওয়ারীতে আবার তিন সপ্তাহের জন্য লকডাউন কার্যকর করা হয়। দেশের অর্থনীতিবিদরা ভাবছেন, কাজকর্ম শুরু করা দরকার, নইলে করোনা হাত থেকে বাঁচলেও অনাহারে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচা দুষ্কর হবে। এখন লকডাউন শিথিল করার ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন এবং এগুলো হলো—

(১) মহামারি নিয়ন্ত্রণে এসেছে কি না?

(২) সংক্রমণ বাড়লে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বাড়তি চাপ নিতে সক্ষম কি না?

(৩) জনস্বাস্থ্য নজরদারী ব্যবস্থা কি রোগী ও তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং সংক্রমণ বৃদ্ধি চিহ্নিত করতে সক্ষম?

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলেও লকডাউন প্রত্যাহারের বিষয়টি সহজ নয়। এ ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা গেল সংক্রামিত এক রোগীর সংস্পর্শে আসা অপর অনেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পর পানশালা ও নৈশক্লাব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চীনে উহানের লকডাউন তুলে নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো রোগীর ক্লাস্টার চিহ্নিত হয়েছে। জার্মানিতে বিধিনিষেধ শিথিলের পর সংক্রমণ আরও বাড়তে শুরু করছে। তারপরও এই তিনটি দেশ তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সুযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশই করোনা পরীক্ষা রোগী শনাক্তকরণ পৃথক্‌করণ ও চিকিৎসায় সক্ষমতা অর্জন করেছে এখন জীবন ও জীবিকার রক্ষার্থে অনেক দেশ লকডাউন সীমিত আকারে পর্যায়ক্রমে শিথিল করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই পদ্ধতিতে অর্থনীতি সচল করার পাশাপাশি ভাইরাস সংক্রমণের ওপর নজর রাখা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় করোনা মোকাবিলায় দেশ যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাংলাদেশ সরকারের সামনে এখন দুটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো— জীবন সুরক্ষা ও জীবিকার পথ প্রশস্ত করা।

৩. কেরালা মডেল: বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিকতা

ভারত প্রজাতন্ত্রের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে কেরালা একটি। মোট জনসংখ্যা ৩.৪৮ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৫৯ জন লোকের বসবাস, যার মধ্যে হিন্দু (৫৪.৭০%), মুসলিম (২৬.৯০) ও খ্রিস্টান (১৮.৪)। ভারতের আর্থসামাজিক সূচকে এই রাজ্যটি দেশের পথিকৃত। যেমন জন্মহার কমানোতে, আয়ু বাডানোতে, নারীর অধিকতর ক্ষমতায়ন এবং সর্বভারতীয় শিক্ষার হার (৯৪%), যা দেশটির শীর্ষে। এ ছাড়াও জনগণের জন্য রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি। নাই ক্ষুধার্ত মানুষ, নাই সামাজিক শোষণ (রাজা-প্রজার সর্ম্পক)। যেকোনো সংকটে আছে শিক্ষিত জনসাধারণের দায়িত্বশীল আচরণ ও সহযোগিতা। এখানকার প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কাজ করে। পর্যটন শিল্প এই রাজ্যটির আয়ের একটি বড় অংশ, যেখানে প্রতিবছর ১৭ লাখের বেশি পর্যটক ভ্রমণে আসে। এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যটি কীভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় একটি মডেল হিসাবে আবির্ভূত হলো, যেখানে খোদ দিল্লীর মসনদেরই নজর নেই! কেরালা রাজ্যটি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট-সমাজতান্ত্রিক শাসনে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক আচরণগুলো যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে, যা অন্য রাজ্যগুলোতে ততটা নয়। আর তা-ই কেরালা মডেলে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায় এই কেরালাতে, যেখানে জানুয়ারির শেষে চীনের ওহান থেকে আসা এক ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রের আগমনের পর এবং তা দ্রুত বাড়তে থাকে জ্যামিতিক গতিতে প্রায় দু মাস। তার পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২৪ মার্চ লকডাউন ঘোষণা করে এমন একটা সময়ে যখন কেরালাতে কোভিড-১৯ এর পিক পিরিয়ড চলছিল। তারপর থেকেই রাজ্যটিতে সংক্রমণের হার কমতে থাকে। সুস্থ হয়ে ওঠার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, মৃত্যুর হার কমে ০৫.৩ শতাংশে পৌছে এবং জনদুর্ভোগ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে কমে আসে। কেরালা রাজ্যেরে এই দ্রুত সাফল্যের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বলেন, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপক চেষ্টা, ট্রেসিং ও ২৮ দিনের কোয়ারিন্টিনের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগ নির্ণয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজ্যের সরকার চারটি বিমানবন্দর দিয়ে যারা এসেছেন, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সন্দেহভাজন হলেই দ্রুত কোয়ারিন্টিনে পাঠিয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ রাজ্যে দুর্যোগ ঘোষণা করে স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং মার্চের প্রথম দিকে লকডাউন কার্যকর করতে ৩০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে মাঠে নামিয়েছেন এবং লাখো মানুষকে কোয়ারিন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তা ছাড়াও এই রাজ্যটি স্বাস্থ্য অবকাঠামোতে সবচেয়ে বেশি সম্পদ ব্যয় করছে। গ্রামপর্যায়ে শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করছে, তহবিল দিয়েছে, অংশগ্রহণ সহযোগিতামুলক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, পাশাপাশি গড়েছে সক্রিয় নাগরিক সমাজ, মুক্ত-স্বাধীন গণমাধ্যম, প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা শক্ত গণতন্ত্রের ভিত্তি, জনপ্রতিনিধিদের ওপর উঁচু মাপের আস্থা ইত্যাদি। আরও মজার ব্যাপার যে যারা স্বল্প আয়ের মানুষ বাসায় বন্দী, খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ তাদের বাসায় খাবার পৌঁছে দিয়ে আসে এবং বন্ধ স্কুলের শিক্ষার্থীদের যারা পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য স্কুলের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া সমাজভিত্তিক সংগঠন কুদুমবাশরী চমৎকার সামাজিক কর্মসূচি নিয়েছে যেমন মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ, ক্ষুধার্ত লোকদের মাঝে আহার বিতরণ ইত্যাদি।

৪. বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতা

এখন কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কেরালা মডেলের আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় বা এ থেকে আমাদের কী শিক্ষণীয় হতে পারে তার একটি বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজটি মডেল উপহার দিয়েছে একইভাবে করোনাকালীন বিশ্বে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কেরালা মডেল আলোচনার শীর্ষে চলে এসেছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা প্রধানত দুটি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যথা স্বাস্থ্য ও জীবিকা। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় প্রথমত ৮ মার্চে, ২০২০ ইতালি থেকে আসা এক ব্যাক্তির মাধ্যমে। ২৬ মার্চ অর্থাৎ ১৮দিন পর সরকার দেশের সর্বক্ষেত্রে লকডাউন ঘোষণা করে। সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে যায় এবং এতে করে বিশেষভাবে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিয়োজিত ব্যক্তিরা সংকটে পড়ে। এতে করে সরকারের সামনে দুটি চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়, যথা স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জীবিকার ঝুঁকি। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ ও কেরালার অভিজ্ঞতার একটি তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরা হলে, দেখা যাবে—

১. কেরালায় সংক্রমণ দেখা যায় জানুয়ারির শেষে এবং দু মাসের মধ্যে যখন পিক পিরিয়ড চলছিল, তখনই ভারত সরকার সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করে। কিন্তু কেরালা এর আগেই ফেব্রুয়ারিতে লকডাউনে যায় এবং রোগ শনাক্তকরনের ওপর সবচেয়ে জোর দেয়, যা বাংলাদেশ তিন মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেশের স্বাস্থ্যখাতের অবকাঠামাগত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

২. কেরালার স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্যোগ আসার সাথে সাথে কয়েক হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে কাজে লাগিয়েছে এবং ১ লাখ মানুষকে কোয়ারিন্টিনে পাঠিয়েছে, যা বাংলাদেশে কল্পনাই করা যায় না।

৩. কেরালায় দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা পরিচালিত বিধায় স্বাস্থ্য অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করেছে, যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দ সবচাইতে কম, যা জিডিপির ০.৮ শতাংশ এবং মোট বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশের নিচে।

৪. কেরালা রাজ্যে বেসরকারি সামাজিক সংগঠনগুলো দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বাংলাদেশে তেমনটি দেখা যায় না। তথ্য মতে সারা দেশে ১ হাজারের অধিক দেশি-বিদেশি এনজিও থাকলেও তাদের মাস্ক কিংবা হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ, খাদ্য সহায়তা প্রদান, লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা, করোনা প্রতিরোধ কেমপেইন ইত্যাদি দেখা যায়নি।

৫. কেরালা সরকার তাদের চিকিৎসাসেবা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন দারিদ্র মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানো কিংবা বন্ধ থাকা স্কুলগুলোর শিশুদের কাছ পুষ্টিকর খাদ্য পৌছাতে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনকে বেশি ব্যবহার করেছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার তার প্রশাসনযন্ত্রকে এ কাজে ব্যবহার করেছে, যেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি কিংবা সংসদ সদস্যদের তেমন দেখা যায়নি।

৬. কেরালা সরকার জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা করে ধাপে ধাপে পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করছে, যা বাংলাদেশে হয়নি। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সরকার ৩১ মে, ২০২০ থেকে কেবল শিক্ষাখাত ছাড়া সকল অথনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করছে, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে অনেক মাত্রা বাড়িয়েছে।

৭. করোনা মোকাবিলায় অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা, যার সাথে কৃষি জড়িত। কেরালা সরকার ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করেছে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক কৃ ষক সংগঠন তৈরি করেছে এবং কৃষকদের পেনশনের আওতায় আনা হয়েছে, যা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও কৃষকের সমস্যা যেমন পণ্যমূল্য নিয়ে চরমত বিপাকে কৃষকেরা। আর পেনশনের কথা তো ভাবাই যায় না।

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

কেরালা মডেলের সাফল্যের কারণ বিকেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জনসেবার মানসিকতা, নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সরকারের জবাবদিহি। বলা যায়, আবেগতাড়িত না হয়ে নিজের পরিবারকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য সবকিছুই নিজের অবস্থান থেকে করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি প্রধান্য ফিরিয়ে আনতে হবে, আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, করোনার মহামারি আমাদের নতুন জীবনাচারে উপনীত করেছে।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৪১-২৫০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে শিশু অধিকার: বাস্তবতা এবং আমাদের করণীয়

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সারসংক্ষেপ *আলোচ্য প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো একটি মৌলিক বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে। উন্নয়নে শিশুদের বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর সংজ্ঞা, শিশুদের বর্তমান বাস্তব চিত্র, শিশুদের পরিবেশ কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়—এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।*

মূল শব্দ *শিশু অধিকার · টেকসই উন্নয়ন · দক্ষ জনসম্পদ · শিশু শিক্ষার ইতিহাস · শিক্ষকতা পেশা*

১. ভূমিকা

আমাদের প্রধান ব্রত হওয়া উচিত আজকের শিশুদের আগামী দিনের যোগ্য ও দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ জন্যে শিশুরা কীভাবে বেড়ে উঠছে, তাদের নিরাপত্তা, বিনোদন এ বিষয়গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি নিরাপদ, সুন্দর সাবলীল আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করা। রূপকল্প ২০২১ এ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDG) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন একটি ব্যাপক ধারনা। উন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন দক্ষ জনসম্পদ। আজকের শিশু ২০৪১ সালে হবে দেশের কর্ণধার। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং আজকের শিশুরা কিভাবে বেড়ে উঠছে তা নিয়ে ভাবতে হবে। এখানে সুন্দর ভবিষ্যৎ বলতে স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও শান্তিতে ভরপুর একটি উন্নত সমাজ ইত্যাতি বোঝাতে চাই। আর বেড়ে ওঠা বলতে বোঝাতে চাই আমাদের শিশুদের বিনোদন সুবিধাসহ নিরাপত্তা, হাসিখুশি, কোলাহলমুখর পরিবেশে বড় হচ্ছে কি না এবং একই সাথে সব শিশু সমভাবে সুযোগ পাচ্ছে কি না। প্রশ্ন হলো উন্নত দেশে উন্নীত হতে যে জনসম্পদ প্রয়োজন হবে তা গড়তে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু? বলা হয়ে থাকে ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট
ই-মেইল: jasim_uddin90@yahoo.com

সমাজের একজন অগ্রসর নাগরিক হিসেবে, একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে, নীতি নির্ধারক-রাজনীতিবিদ হিসেবে, একজন প্রশাসক হিসেবে, গণমাধ্যম কর্মী, জন প্রতিনিধি তথা একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের দায়িত্ব শিশুদের জন্য সুন্দর, নিরাপদ ও সুস্থ ধারার পরিবেশ তৈরী করা যাতে তারা আনন্দের সাথে বেড়ে উঠতে পারে। শিশুরা সুশিক্ষিত, সৎ ও আদর্শবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্র তেরী করতে হবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ ধারায় উল্লেখ আছে, establishing a uniform, mass-oriented and universal system of education and exten-ding free and copolsary education to all children to such stage as may be determined by law (একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য)। সুতরাং শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার এই সাংবিধানিত দায়িত্ব আমাদের অত্যন্ত যত্নসহকারে সুচারুভাবে পালন করতে হবে। পৃথিবীর বর্তমান অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি শিক্ষা। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে সবার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। একজন শিশুকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেখানেই থাকুক যে অবস্থাকেই থাকুক পরিণত বয়সের একজন মানুষ হিসেবে আমাদের এমনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করতে হবে। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে সবার আগে শিশুদের জন্য যেকোনো মূল্যে একটি সুস্থ ধারার ক্ষেত্র তৈরি করা আবশ্যক।

আলোচ্য প্রবন্ধে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সুন্দর ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলতে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু—এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আজকের শিশুদের উন্নতর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু এবং শিশুদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. শিশুর সংজ্ঞা এবং শিশুর অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা।

২. বাংলাদেশে শিশুশিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুলে ধরা।

৩. শিশু অধিকার একই সাথে শিশুদের বেড়ে ওঠার বর্তমান বাস্তব চিত্র তুলে ধরা এবং শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে আলোকপাত করা।

৪. শিশুদের জন্য একটি কার্যকর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ এবং দেশের প্রকৃত উন্নয়নের প্রয়াসে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা।

৩. তথ্যের উৎস

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মাধ্যমিক উৎস হতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা' গ্রন্থটিকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর লেখকের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং কতিপয় পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. শিশুর সংজ্ঞা এবং শিশুর অধিকার

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ১৪ বছর কম ছেলে মেয়েদের শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিশুদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করার রীতি প্রচলিত; ৫ বছরের নীচে শিশু, ৬ থেকে ১০ বছর বালক এবং ১১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত কিশোর। একজন শিশুর বয়স এককে দেশে এককে রকম হয়ে থাকে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইন ও প্রথাকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ১৮ বছরের কম বয়সের সবাইকে শিশু হিসেবে গণ্য করে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই সনদ মেনে চলে। সুতরাং ১৮ বছরের নীচে সকল ছেলেমেয়েকেই শিশু বলে অভিহিত করা যায়।

১৯২৪ সালে লিগ অব নেশনস্-এর পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশু অধিকারসমূহ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক দলিলে স্থান পায়। পরে ১৯৫৯ সালের শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের অনেক সুবিধা, তাদের নিরাপত্তা ও অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ৩০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার কনভেনশন গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করণের ও সংরক্ষণের সাংবিধানিক বিধান ও আইন রয়েছে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন ও ১৯৭৬ সালে শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগস্ট, ১৯৯০ বাংলাদেশ জাতিসংঘের Convention on the Rights of the Child (CRC) স্বাক্ষর করে এবং CRC বা শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে এবং বিভিন্ন ধারা সমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় শিশু নীতিমালা প্রণয়ন করে। এটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত যেখানে প্রথম অধ্যায়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিশুদের জন্য সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উপসংহারে বলা হয়েছে যে, জাতীয় শিশু নীতির আওতায় বাংলাদেশের সকল শিশু গোত্র বর্ণ লিঙ্গ ভাষা ধর্ম বা অন্য কোনো মতাদর্শ সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পদ জন্ম বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে সকল অধিকার ও সুবিধা সমূহ সমান ভাবে ভোগ করবে।

৫. বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার ইতিহাস

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুর মধ্য দিয়েই এদেশে আধুনিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। এদেশে এই আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তন করে বৃটিশরা। এর আগে মধ্য যুগে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ছিল মসজিদ বা মাদ্রাসাকেন্দ্রিক যাকে বলা হতো মক্তব এবং হিন্দু ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক যাকে বলা হতো পাঠশালা। সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। বিনিময় প্রথা চালু ছিল বলে শিক্ষকেরা সম্মানী হিসেবে ধান, চাল বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেতের। শিক্ষকেরা নামমাত্র সম্মানীতে শিক্ষকতা করতেন। সম্মানী কম হলেও পরম যত্ন ও মমতা নিয়ে শিক্ষাদান করতেন। শিশুদের কাছে তাঁরা ছিল পরম পূজনীয়। সমাজে তাদের আলাদা সম্মান ছিল। শিক্ষকতার পেশায় কেউ কখনো ধনবান হয়নি। কিন্তু শিক্ষকেরা সবসময় যে কোনো ধনবান, এমনকি ক্ষমতাবান ব্যক্তির চেয়ে বেশিই সম্মানীয় ছিলেন। এ জন্যেই প্রবাদ চালু হয়েছিল "রাজা স্বদেশে সম্মান পান বিদ্বান সম্মান পান সর্বত্র"। ব্রিটিশরা আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তন করলেও জনস্বার্থে তা করেছিল এ কথা বলার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে ১৮৩৫ সালে মেকলের সুপারিশকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেকখ করা যেতে পারে। মেকলে প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার

উদ্দেশ্য ছিল, " a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes –in opinions, in morals and intellect" (এদেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থ্যা চালু করা যাতে এদেশের মানুষ রক্তে মাংসে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে মতবাদে হবে ইংরেজ)। মেকলে নির্দেশিত সেই শিক্ষা কাঠামোটি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হলেও এখনও বলবৎ আছে। এটি স্বীকার করা ভালো।

যা হোক আগে শৈশবে অনেক প্রতিকূলতা, অনেক সীমাবদ্ধতা মেকাবেলা করে এদশের অনেকেই চরম ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অনুকরণীয়। শফিউল আলম তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "১৯৪৬ সালের ভোর বেলা। সেবার তুফানে আমাদের গ্রামের মূল স্কুল ভবনটি ভেঙ্গে যাওয়ায় নদীর পারে বাঁশঝাড় আর কাঁঠাল বাগানের পাশে আমাদের স্কুল বসেছে। বাঁশের খুঁটিতে টিনের চালের নীচে ভাঙাচুরা টুলে বসে সরবে সানন্দে উৎসবের কোরাস তোলে পড়ছি আমরা, স্পষ্ট মনে পড়ছে। পড়ছি পদ্য, পড়ছি নামতা"। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "খোলা জায়গায় ভোরবেলায় ক্লাস করার যে কী আনন্দ এখনও মনে দোলা দেয়- ভাবি সেই বয়সে, সেই গ্রামে, সেই কোরাসে আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম"। আগে এত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা, শিশুদের জন্য এত এত সুযোগ সুবিধা ছিলনা, সকল শিশুদের পড়াশুনার সুযোগ ছিলনা। আজকের দিনের মত এত এত উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক ছিল না। কিন্তু একটি মৌলিক বিষয় শিশুদের বিনোদনের সুযোগ ছিল প্রচুর। পড়াশোনায় শিশুরা আনন্দ পেত অনেক, খেলাধুলার মতো অনাবিল বিনোদনের খোরাক ছিল বিভিন্ন উপাদানে। শিশুদের সর্বত্র নিরাপত্তা ছিল। শিক্ষকদের আন্তরিকতা ছিল। নামমাত্র সম্মানী বা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করলেও আজকের যুগের শিক্ষকের মতো তাদের বাণিজ্যিক মনোভাব ছিল না। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল মধুর এবং তা সারাজীবনের জন্য। নিরাপদ ও আনন্দময় শৈশবের উপস্থিতি ছিল সর্বত্র।

৬. শিশুদের বেড়ে ওঠার বর্তমান বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশের শিশুদের ক্ষেত্রে দু রকমের চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। একদিকে রয়েছে শহুরে শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও সচেতন পরিবারের ছেলেমেয়ে। অন্য দিকে শহরে ও গ্রামের শিক্ষা বঞ্চিত, দরিদ্র ও অসচ্ছল অভিভাবকদের ছেলে মেয়ে। আগে গ্রাম ও শহরের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিলনা। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হতোনা। গ্রামে এক সময়ে হরেক রকমের খেলাধুলার প্রচলন ছিল। এসকল খেলাধুলা প্রচীন কাল থেকে যুগের পর যুগ চালু হয়ে আসছে। এসকল খেলাধুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এগুলোতে আনন্দের খোরাক ছিল প্রচুর। এসকল খেলাধুলায় প্রচুর শারিরীক পরিশ্রম হতো, একজন আরেক জনের সাথে মত বিনিময় হতো, কথা কাটাকাটি হতো ইত্যাদি কারণে শিশুদের সামাজিক হতে উদ্ভূত করতো। এেকেক মৌসুমে এেকেক রকমের রকমের খেলার প্রচলন ছিল। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ছিল এসকল খেলাধুলায় কোনো খরচ ছিল না এবং থাকলেও তা ছিল নামমাত্র। এছাড়া ঘুড়ি ওড়ানো, মাছ ধরা, বারুনীমেলায় যাওয়া, বাবা-মার হাত ধরে নানা বাড়ি যাওয়া, বড়দের সাথে হাটে যাওয়ার মতো আনন্দ তো ছিলই। এসব খেলাধুলার প্রচলন অনেক কমে গেছে। তদুপুরি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। শহরে এসকল খেলাধুলা হয় না বললেই চলে। খেলাধুলার পরিবর্তে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার নামে কম্পিউটার গেইম, কার্টুন, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ফেইস বুকের মত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি শিশুরা আকৃষ্ট হচ্ছে। আধুনিক বিনোদনের নামে এই বিনোদন মূলত কোনো সুস্থ ধারার বিনোদন নয়। সুস্থ ধারার বিনোদন বঞ্চিত হয়েই শহরের শিক্ষিত ঘরের শিশুরা বেড়ে উঠছে বা বেড়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে। শিশুরা গৃহে অন্তরীণ থাকছে এবং আধুনিক বিনোদনের নামের এসব বিনোদনে আকৃষ্ট হয়ে শিশুদের মানসিক বিকাশ দারুনভাবে

বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিনোদনের সুযোগ ও ক্ষেত্র দিনে দিনে সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে। শহুরে শিশুদের একটি বিশেষ দিক হলো তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রধান্য দেওয়া। অভিভাবকরা প্রথম নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই এবং যৌক্তিক কারণেই নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে চিন্তা করতে হয়। যেসব পরিবারে বাবা- মা দু'জনেই কর্মজীবী সেসব পরিবারের শিশুদের পড়াশুনার বিষয়টি আরো নাজুক। সঙ্গত কারণেই এধরনের অবস্থান শিশুদের আত্ম কেন্দ্রিক,স্বার্থপর ও অসামাজিক হয়ে উঠতে প্ররোচিত করবে। অন্যদের সাথে মিশতে বা সাবলীল ভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করে। গৃহে অন্তরীণ থাকার সুবাদে চোখে সমস্যা, স্থূলতা, মাথা ও বুকে ধরা সহ নানবিধ শারিরীক ও মানসিক জটিলতার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তো আছেই। এদিক থেকে গ্রমের শিশুরা মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠলেও তারা গুণগত শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গ্রামের শিশুদের অনেকেই স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না, ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়ছে বা অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপার্জন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিনয় মিত্র তার বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রূপ ও রীতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শত বিভক্ত শিশুদের একই মালায় গাঁথার জন্য অভিধাটি (পঞ্চপান্ডব) নিলাম। এই পাঁচজন, পাঁচ প্রকার বিদ্যালয়ে যায়, পাঁচ রকমের বই পড়ে, পাঁচ রকম পরিবেশে বড় হয়। এদের বাইরে, আরো একজন আছে, যে জন্ম থেকে শিক্ষা বঞ্চিত, বাকি পাঁচজন থেকে আলাদা, সে যেন কর্ণ, কুন্তীর সন্তান হয়েও সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত। এই কর্ণধর্মীরা বেড়ে উঠছে শ্রম বিক্রি করে—খেয়ে না খেয়ে, শোচনীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের শিশুদের একটি অংশ প্রতিবন্ধী ও অটিটিস্টিক। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। এদর বেশির ভাগই পরাশ্রয়ী। এদের জন্য বিভিন্ন এনজিও, প্রতিষ্ঠান নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এ দেশে অনেক প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু এসকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে।

আজকের সময়ে শিশুদের একটি বিরাট অংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। ইভটিজিং, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এমনকি রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে। গত ১০ মার্চ, ২০১৮ কালের কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেছে। কোথাও বন্ধুদের হাতে খুন হচ্ছে স্কুল বা কলেজগামী শিক্ষার্থীরা। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, যেখানে মা-বাবা দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরে থাকেন, সেখানে উঠতি বয়সীদের দেখার কেউ নেই। এই সময়ে সহজলভ্য প্রযুক্তি একজন কিশোর বয়সীকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা কেউ বলতে পারে না। আগের দিনে পাড়া-মহল্লায় সামাজিক অনুশাসন ছিল। আজকের দিনের নাগরিক জীবন থেকে সামাজিক অনুশাসনও উধাও হয়ে গেছে। পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন ও মূল্যবোধের অভাবেই বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। হাত বাড়ালেই মিলছে ভয়ংকর মাদক। যে সময়ে একজন কিশোর বা তরুণের মনোজগৎ তৈরী হয়, সেই সময়ে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে অপরাধ জগতের সঙ্গে। এসব কারণেই পাড়া-মহল্লায় গড়ে উঠছে গ্যাং গ্রুপ। রাজধানীতে এমন কিশোর গ্যাংয়ের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে অনেক কিশোর। শিশু-কিশোরদের বিপথগামী হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এদের মধ্যে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবার ও সমাজের উদাসীনতা ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণও এর জন্য দায়ী। শিক্ষকরা আগের মত দরদ আর মমতা দিয়ে বিদ্যা দান করতে চায়না। শিক্ষা যেখানে পণ্য, শিক্ষকও তো সেখানে পণ্য বিক্রেতা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। সেই পণ্যবিক্রেতা শিক্ষকের কাছে বড়ো কিছু মহৎ কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের সমাজে

শিশু কিশোররা বিপথগামী হওয়ার জন্যে শিক্ষা বাণিজ্যিকরণও অনেকাংশে দায়ী। আমাদের সমাজে দেখা যায়, সন্ধ্যার পর এমনকি গভীর রাতেও এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণ শিক্ষার্থী রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, খেলার মাঠসহ বিভিন্ন স্থানে আড্ডা দিতে দেখা যায়। পড়ার সময় পড়ার টেবিলে না বসে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষি০ত সুযোগের সহজলভ্যতা তরুণ শিক্ষার্থীদের বিপথগামী হতে প্ররোচিত করে। আমাদের মত দেশে তরুণ শিক্ষার্থীরা ক্রমবর্ধমান হারে বিপথগামী হচ্ছে তা কোনোমতেই কাম্য নয়।

২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৬ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৩.৫ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ধরে নিলে বাংলাদেশে বসবাসকারী দরিদ্র জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৪ কোটি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা কত তার সঠিক তথ্য জানা না থাকলেও এর পরিমাণ কম নয়। এদের অধিকাংশই মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশু শ্রম আমাদের দেশে একটি অমানবিক দিক হলেও অভাবের তাড়নায় এদেশে অনেক শিশু বিভিন্ন কাজে এমনকি ঝঁকি পূর্ণ কাজে জড়াতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে পথশিশু। একজন শিশু রাস্তা, আঁস্তাকুড় ও অন্যান্য স্থানে জিনিসপত্র কুড়িয়ে বেঁচে থাকে। বেশিরভাগ পথ শিশুদের পিতামাতা নেই। অনেকের পিতামাতা আছে কিন্তু যোগাযোগ নেই। শিশুরা দারিদ্র্য, দাম্পত্য বিচ্ছেদ, পরিবার থেকে পলায়ন ও যৌন নিপিড়নের কারণেই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়। কেউ তাদের দেখাশুনা করেনা। তারা রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক, রাস্তার ধারে ও খোলা আকাশের নীচে বাস করে। পথ শিশুদের অনেকেই পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছেনা। তারা অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা বৃত্তি, মাদক ব্যবসা, মাদকাসক্তি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

৭. শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত

শিশু এবং বিনোদন হবে একে অপরের পরিপূরক। অবোধ শিশুদের জন্য জন্য আমাদের যা যা করা দরকার তার সবই করতে হবে। আনন্দের মধ্য দিয়ে আমাদের শিশুরা বেড়ে উঠবে, শিখবে, জানবে। আমাদের পাঠ্য পুস্তকে এমন কিছু যুক্ত করতে হবে যেখানে শিশুদের জন্য প্রচুর বিনোদনের খোরাক থাকে। বিনোদন ব্যতিত শিশুদের জীবন পূর্ণতা পায়না। আমাদের দেখতে হবে শিশুরা বেড়ে ওঠার পাশাপাশি বিনোদন সুবিধা কতটুকু পাচ্ছে। তাদের জন্য যথাযথ সুস্থ ধারার বিনোদন নিশ্চিত করতে পারছি কিনা - তা পরখ করে দেখতে হবে। টেবিলমুখী মানসিকতা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করবে। শিশুদের টেবিলমুখী করে তোলা আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। একই সাথে তাদের নিরাপত্তা, সুস্থ ধারার বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার অবাধ সুযোগ করে দিতে হবে। শিশুদের জন্য শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন সব খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে এবং একই সাথে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নির্শ্চিত করতে হবে। জন্মের মূহূর্তের পূর্ব থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। দার্শনিক লক্ বলেছিলেন, জন্মকালে শিশুর মন হচ্ছে অলেখা কাগজের মতো তাতে কোনো অভিজ্ঞতার দাগ পড়েনি। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানী বা মনোবিদ্ এ কথা সত্য বলে মনে করেন না। জন্ম মূহূর্তের বহু পূর্বে মাতৃগর্ভেই তার শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভ শুরু হয়ে গেছে। এ কথাও মনে করা ভুল যে, শিশুর মন হচ্ছে 'নরম কাদা', তাকে যেমন খুশি করে গড়ে তোলা যায়। শিশুরা শিখবে সব ভালো দিক শিখবে। শিশুরা অভিজ্ঞতা লাভ করবে সব ভালো ও মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আজকের শিশুরা হবে আগামী দিনের কর্মচঞ্চল, বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনসম্পদ যেন বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানানসই সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ একই সাথে ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশের বাস্তব সমস্যা, আর্থ-মাজিক অবস্থা সম্পর্কে শিখবে, নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, উপলব্ধি করবে, সমস্যা সমাধানে প্রলুব্ধ হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন

হওয়া জরুরি যেখানে আমাদের শিশুরা শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞানার্জনের প্রতি নিবেদিত হয়ে ওঠে এবং পরিণত বয়সে দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমী বিশেষ করে বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। একই সাথে আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী, কর্মচঞ্চল মানুষ হিসেবে দেশের একজন বলিষ্ঠ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আমাদের উচিত শিশুদের জন্য এ রকম একটি সুস্থ ধারার পরিবেশ বা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শিশুরা পরিণত বয়সে দুর্নীতিবাজ হবেনা বরং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে, পাপাচার বা অনাচারে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেনা বরং অন্যায়-অনাচার দমনে বাস্তব সম্মত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে প্রলুব্ধ হবে। আর এজন্য আজকের শিশুদের সত্যিকার জ্ঞান পিপাসু, সুশিক্ষিত, সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলতে এখনই কার্যকর ও বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. সুপারিশমালা

শিশুদের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা, তাদের অধিকার ও তাদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং শিশুরা যাতে আনন্দ ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। শিশুরা সব সময়ই থাকবে হাস্যোজ্জ্বল। আনন্দ আর বিনোদনের মধ্য দিয়ে তারা বেড়ে উঠবে। আর এ বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেকোনো মূল্যে। আনন্দ আর হাসির মধ্য দিয়ে তারা পড়াশোনা করবে, শিখবে। আজকের শিশুরা পরিণত বয়সে হবে সমাজ সচেতন, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানপিপাসু। শৈশবেই তাদের মনোজগতে এ মানসিকতা গড়ে উঠবে। এ মানসিকতা অর্জন করতে একটি সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুরা গড়ে উঠবে মুক্ত মনের মানুষ হিসেবে। আজকের বিশ্বায়ন ও নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার সুদূর প্রসারি ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা তৈরী করা জরুরী। এলক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশমূলক প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. শিশুদের জন্য একটি বস্তুনিষ্ঠ শুমারি জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে । শিশুরা কীভাবে শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করছে। একই সাথে তাদের বিনোদনের সুবিধা কী রকম। কোন শ্রেণির শিশুরা অধিক সুবিধা ভোগ করছে। কারা বঞ্চিত হচ্ছে। একটি বস্তুনিষ্ঠ কার্যকর গবেষণা সম্পাদন করেই দীর্ঘ মেয়াদে যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক জনসম্পদ গড়ে উঠতে পারে তার একটি সুন্দর ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

২. দেশের অনেক শিশু শিক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করার প্রাক্কালে এ ধরনের অবস্থা অপ্রত্যাশিত হলেও বাস্তব চিত্র আসলে তাই। সুতরাং অনগ্রসর এলাকা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী জন্য মানসম্মত বিশেষায়িত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে এ দেশের সব পথশিশু, অনাথ, অসহায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, দরিদ্র শিশুদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলতে হবে যাতে দারিদ্র্যের জন্য বা অর্থাভাবে তাদের পড়াশোনা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩. শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে শিশু পুলিশ গড়ে তুলতে হবে।

৪. সন্ধ্যার পর কোনো শিশু বাড়ির বাইরে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রতিটি শিশুর পড়াশোনার সময়। এ সময় বাড়ি বা বাসার বাইরে থাকার প্রবণতা রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনপ্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ভার্চুয়াল জগতের যেটুকু শিক্ষণীয় শুধ সে টুকুই শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। শিশুরা যাতে ভার্চুয়াল জগতের সাথে আসক্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্র জীবনে কোন শিশু যাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সাইটের সাথে আসক্ত হয়ে না পড়ে তাদের শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় যেন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট বা ভার্চুয়াল জগৎ নয় পড়াশ্েনাই হবে শিশু-কিশোরদের বিনোদনের প্রধান উৎস। আজকের শিশুরা আগামীতে যাতে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলো আয়ত্ত করে, উপলব্ধি করে তা সমাধানে এগিয়ে এমন একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

৬. খেলাধুলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তরুণ-শিশু-কিশোরদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা জরুরি।

৭. শিশুরা ভালো সবকিছুই শিখবে এবং নেতিবাচক সবকিছুই বর্জন করবে। শিশুদের মধ্যে আড্ডার বিষয়বস্তু হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহামানুষের জীবনী নিয়ে পর্যালোচনা। অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানপিপাসু জাতি গঠনে শিশুদের মনে এই মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সর্বাধিক। আর এ লক্ষ্যে সব শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে যাতে ঝরে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। কারিকুলাম হতে হবে সহজ, সাবলীল ও আনন্দদায়ক এবং একটি বাস্তব সম্মত গণমুখী যুগপযোগি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৯. শিশুদের পড়াশুনায় আগ্রহী করতে বেশি করে আরো গ্রন্থাগার বা পাঠাগার স্থাপন করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অণ্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপন করে শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। পড়াশোনাই হবে শিশুদের প্রধান ব্রত। এমন একটি সংস্কৃতি আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

১০. শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে সকল শিশু সমান ভাবে সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে কেউ যেন বৈষম্য, ভেদাভেদ এর শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘের United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF সবসময়ই বাংলাদেশে শিশু অধিকার সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতবদ্ধ এবং ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে যেসব দুর্বলতা রয়েছে তা পরিমার্জন করে বাস্তবসম্মত করার পক্ষে। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. শেষ কথা

আগামী দিনে প্রতিটি শিশুই হোক মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন গুণী মানুষ। একই সাথে মানবতাবাদী, দেশদরদী, জনহিতৈষী। যে যে অবস্থানেই থাকুক কেন—প্রত্যেকেই মানুষ ও সমাজের জন্য বিশেষ করে অনগ্রসর মানুষদের সামনে নিয়ে আসার ব্রত নিয়ে কাজ করবে। শিশুদের জন্য একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাদের যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হলেই কেবল টেকসই উন্নয়নের ভিত রচিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যপঞ্জি

Bangladesh on Development Highway: The Time is Ours, Budget Speech 2017-18, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, 2017.

Government of Bangladesh : The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Dhaka, 2008.

Internet : www.unicef.org/bangladesh/.

Rahman, W. 1997: *Child Labor Situation in Bangladesh : A Rapid Assessment*, International Labor Organization.

আলম, শফিউল: প্রাথমিক শিক্ষায় ভিন্ন ধারা: কিন্ডারগার্টেন, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

আহমদ, গিয়াসউদ্দিন : শিক্ষক প্রশিক্ষণ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৭।

জন ভি. ভি. : "শিক্ষা ও শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ", শিক্ষা এক নি:শব্দ বিপ্লব (স্বরাজ সেনগুপ্ত সম্পাদিত), রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলা পিডিয়া (খণ্ড ৯) : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

বেগম, রেহেনা : প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

মিত্র, বিনয় : *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রূপ ও রীতি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

যতীন সরকার : শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, ভূমিকা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

রায়, অজয় : শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা: কিছু অনিয়মিত ভাবনা, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

শস্ত্রপাণি, মহসিন : শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য-উদ্ধারের পথ কী, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

সমকাল, কালের কণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৫১-২৮৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশ

মোঃ মোরশেদ হোসেন*

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রেষ্ঠ অবদান স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ হবে 'সোনার বাংলা', স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সোনার বাংলা ছিল একটি রূপকল্প (Vision)। এটি কোনো মিথ বা ইউটোপিয়া নয়। রূপকল্প- ২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১-এর মতোই এটি রূপকল্প। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "এটি দেশবাসীর জন্য কল্পনার নকশা" (১ ডিসেম্বর ১৯৭০-এর বক্তৃতা)। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' রূপকল্পের নানা লক্ষ্য (Aim) রয়েছে, রয়েছে সে লক্ষ্য অর্জনের নানা কৌশল (Strategy)। বলা যেতে পারে ৭০০-৮০০ পৃষ্ঠার যেকোনো রূপকল্পের চেয়ে 'সোনার বাংলা'—এ শব্দ দুটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কাঙ্ক্ষিত, স্বপ্নীল ভবিষ্যতের প্রকাশ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) স্পষ্টতই বলা হয়েছে, "The father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman soon after assuming the power initiated massive programmes for rebuilding the war-torn economy in a planned manner. Under his visionary and prudent leadership, the First Five Year Plan (1973-78) was formulated to guide the transformation of the country into 'Sonar Bangla', free of poverty, hunger and corruption along with rapid income growth and shared prosperity."

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫), এসডিজি, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্লান-২১০০ অনুযায়ী যে 'উন্নত বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় রয়েছে তা অর্জন করতে 'ডিজিটাল' বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের পথে আমরা। SMART Bangladesh Vision 2041 এ বলা হয়েছে " SMART Bangladesh is about being inclusive, about the people, the citizens of Bangladesh. Built on the 4 pillars of SMART Citizens, SMART Government, SMART Economy and SMART Society, it is about bridging the digital divide by innovating and scaling sustainable digital solutions that all citizens, regardless

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; ই-মেইলঃ morshed122009@yahoo.com

of their socio-economic background, all businesses, regardless of their size, can benefit from. Building on the launch pad created by Digital Bangladesh, Smart Bangladesh is the next major step towards realizing Bangabandhu's dream of Shonar Bangladesh, a Golden Bangladesh." স্মার্ট বাংলাদেশের চার ভিত্তি স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি অর্জন বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর 'সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা' গড়তে 'স্মার্ট বাংলাদেশের' যাত্রা শুরু করেছেন।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থান করে নিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের আয় বিভাজনের মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখন নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। জাতিসংঘের মানদণ্ডে উন্নয়নশীল দেশ হবার পথে। উন্নয়নে বিশ্বের কাছে রোলমডেল। ২০২২ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.১০ শতাংশ, মাথাপিছু আয় ২৭৯৩ মার্কিন ডলার। ২০২২ সালে জাতীয় দারিদ্র্যের হার কমে ২০.৫ শতাংশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৪.৫ বছর, কাঠামোগত পরিবর্তনে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্প ও সেবা প্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তর হয়েছে বাংলাদেশের, বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমানে ২৫৮২৬ মেগাওয়াট, অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিজ অর্থে পদ্মা সেতু, ঢাকায় মেট্রোরেল, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী টানেল, পায়রা সেতু, ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ কাজ শুরু, এ ছাড়া এমডিজির অনেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

উন্নয়ন হচ্ছে রংপুর বিভাগেরও। রংপুর বিভাগ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর নামকরণ ও বাস্তবায়ন, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠা, রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, পীরগঞ্জে মেরিন একাডেমি, ১৭ তলা ক্যান্সার হাসপাতাল, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, তিস্তা সড়ক সেতু, শেখ হাসিনা সেতু, এলেঙ্গা-রংপুর ছয় লেন মহাসড়ক, বিভিন্ন অফিসের বিভাগীয় সদর দপ্তর, রংপুর শিশু হাসপাতাল ও পুলিশ হাসপাতাল, হাইটেক পার্কের ভূমি অধিগ্রহণ, গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন স্থাপন, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার ইত্যাদি। কিন্তু রংপুর বিভাগের এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্যান্য অর্জন অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। বিশেষতঃ North-West Zone বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ রংপুর বিভাগ দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের "Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness" শীর্ষক ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) "Regional Distribution of Poverty" উপ-অনুচ্ছেদেও সুস্পষ্ট বলা হয়েছে "বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ সকল অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি"। বিআইডিএসের জার্নালে "মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ: সমস্যা ও সম্ভাবনা" প্রবন্ধে হোসেন এন্ড হোসেন বলেছেন "পিছিয়ে থাকা এ অঞ্চল কেবলমাত্র সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়নি বরং দেশের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় সম্পদ বন্টন কাঠামো এবং সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসম বন্টনের শিকার হয়েছিল"। এ অঞ্চলের এই যে পশ্চাৎপদতা আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ।

এটা অনস্বীকার্য, কোনো দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের ওপর। আর এই সুষম উন্নয়নকেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল তথা নবগঠিত রংপুর

বিভাগ দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। দেশের খাদ্য চাহিদার ৫০ শতাংশ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ কাঁচামাল উত্তরাঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হলে হলেও এ অঞ্চলে অদ্যাবধি কাঁচামাল বা কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। ফলে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলছে। দেখা দিচ্ছে সামাজিক সমস্যা। রংপুর বিভাগে রয়েছে উন্নয়ন পশ্চাৎপদতার নানা স্বরূপ।

রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সমস্যা

১. দারিদ্র্য

রংপুর বিভাগ উন্নয়নে পিছিয়ে থাকার মূল কারণ এ অঞ্চল অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ। দারিদ্র্যের হার সকল বিভাগের মধ্যে রংপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে সুফল তা রংপুর বিভাগের জনগণ খুব বেশি পায়নি অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সমবণ্টন হয়নি। এসডিজি, ভিশন- ৪১ বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কিংবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে বাংলাদেশে। কিন্তু রংপুর অঞ্চলের মানুষের জন্য এসবই 'অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে উন্নয়নে আরো পিছিয়ে যাওয়া'। একে বলা যেতে পারে 'অর্থ বরাদ্দে বৈষম্যের প্রভাব'। বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরে রংপুর অঞ্চল কয়েক লক্ষ কোটি টাকা অর্থবরাদ্দের বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এই অর্থ বরাদ্দে বৈষম্যের প্রত্যক্ষ ফল রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্য। রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্য সম্পর্কে ভিশন- ২০৪১ এর ৪র্থ অধ্যায় 'একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ' (A Country With Zero Poverty)- এ স্পষ্টত: বলা হয়েছে "রংপুর বিভাগের জন্য দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতির বিপরীতমুখিতা উদ্বেগের বিষয়, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলের অধীনে সমন্বিতভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)-এর "Poverty and Undernutrition Maps Based on Small Area Estimation Technique"- শীর্ষক গবেষণায় (২২মে ২০২২ এ প্রকাশিত) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দারিদ্র্য দেখানো হয়েছে (সারণি-১)। এতে দেশের পূর্বাঞ্চল চট্টগ্রাম বিভাগে দারিদ্র্যের হার ১৮.৪৩ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ১৬ শতাংশ ও সিলেট বিভাগে ১৬.২৩ শতাংশ এবং দেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল বরিশালে ২৬.৪৯ শতাংশ, খুলনায় ২৭.৪৮ শতাংশ, রাজশাহীতে ২৮.৯৩ শতাংশ এবং রংপুরে ৪৭.২৩ শতাংশ দেখা যায়। এ পরিসংখ্যানে স্থানীয় সরকারের পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ৫৭৭ টি উপজেলায় (মেট্রোপলিটন থানাসহ) বিভক্ত করা হয়েছে। এতে দেখা যায় সর্বোচ্চ দারিদ্র্য রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজীবপুর উপজেলায় ৭৯.৮ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরীপে রংপুর বিভাগে সাধারণ দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২.৩ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ৪৭.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য বেড়েছে ৪.৯৩ শতাংশ।

সারণি ১: বিভাগওয়ারি দারিদ্র্যের হার

বিভাগ	দারিদ্র্যের হার (%)	বিভাগের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলায় দারিদ্র্যের হার (%)	বিভাগের সবচয়ে কম দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলায় দারিদ্র্যের হার (%)
বরিশাল	২৬.৪৯	দশমিনা (পটুয়াখালী) -৫২.৮	দৌলতখান (ভোলা)- ১২.২
চট্টগ্রাম	১৮.৪৩	থানচি (বান্দরবান)- ৭৭.৮	সদর (চট্টগ্রাম)- ১.৫
ঢাকা	১৬	মিঠামইন (কিশোরগঞ্জ)- ৬১.২	গুলশান (ঢাকা)- ০.৪
খুলনা	২৭.৪৮	মোহাম্মদপুর (মাগুরা)- ৬২.৪	আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) -৭.৯
ময়মনসিংহ	৩২.৭৭	দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর)-৬৩.২	ভালুকা (ময়মনসিংহ)- ১৫.৫
রাজশাহী	২৮.৯৩	পোরশা (নওগাঁ)- ৪৮.৭	বোয়লিয়া (রাজশাহী)- ৯
রংপুর	৪৭.২৩	চর রাজীবপুর (কুড়িগ্রাম)- ৭৯.৮	আটোয়ারী (পঞ্চগড়)- ৯.৩
সিলেট	১৬.২৩	শাল্লা (সুনামগঞ্জ)- ৬০.৪	বিশ্বনাথ (সিলেট)- ১০.৪

উৎস: Poverty and Undernutrition Maps Based on Small Area Estimation Technique, BBS and WFP, May 22, 2022.

২০২১ সালে জাতীয় সাধারণ দারিদ্র্যের হার কমে ২০.৫ শতাংশ হলেও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় রংপুরের বর্তমান দারিদ্রের হার কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আরো বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ”খানা আয়- ব্যয় জরীপ ২০১৬” অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যের ১০ টি জেলার ৫ টি হলো রংপুর বিভাগে (কুড়িগ্রাম ৭০.৮ শতাংশ, দিনাজপুর ৬৪.৩ শতাংশ, গাইবান্ধা ৪৬.৭ শতাংশ, রংপুর ৪৩.৮ শতাংশ এবং লালমনিরহাট ৪২ শতাংশ) অথচ সবচেয়ে কম দারিদ্র্যের জেলা হলো (নারায়নগঞ্জ ২.৬ শতাংশ ও মুন্সিগঞ্জ ৩.১ শতাংশ)। কুড়িগ্রাম ও নারায়নগঞ্জের মধ্যে দারিদ্র্যের পার্থক্য প্রায় ৬৮.২ শতাংশ। ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য হলো, সাধারণ দারিদ্র্য ২০৩১ সালে ৭.০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে ২.৫৯ শতাংশ নামিয়ে আনা এবং আয় বৈষম্য (পালমা অনুপাত) ২০৩১ সালে ২.৭৫ এবং ২০৪১ সালে ২.৭০ এ নামিয়ে আনা। পালমা অনুপাত হলো আয় বণ্টনের শীর্ষে ১০ শতাংশ এর শেয়ার, যা তলদেশের ৪০ শতাংশ এর শেয়ার দ্বারা ভাগকৃত। এটি আয় বৈষম্যের উন্নততর পরিমাপ পদ্ধতি। রংপুরের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের বাধাঁ।

২. শিল্পায়ন কম

রংপুর বিভাগের অর্থনীতি মূলত কৃষি ভিত্তিক। যুগ যুগ ধরে শিল্পখাত রয়ে গেছে অনুন্নত। Census of Manufacturing Industries (CMI) 1999-2000 অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সময়ে রংপুর অঞ্চলে মাত্র ১৩৬৩টি শিল্প স্থাপনা (Industrial establishment) ছিল। যার মধ্যে চালকল ৭৮০টি, বিড়ি শিল্প ৯২ টি, কাঠের ফার্নিচার তৈরি ১২০ টি অন্যতম। জাতীয়ভাবে দেখা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সময়ে বাংলাদেশে মোট শিল্পস্থাপনা ছিল ২৪৭৫২ টি। সে হিসাবে দেশের মোট শিল্প স্থাপনার মাত্র ৬.৭১ শতাংশ ছিল রংপুর অঞ্চলে। আবার এ অঞ্চলে ১৯৯৯- ২০০০ সময়কালে শিল্পে মোট কর্মসংস্থান ছিল ৫৭৫৮৭ জনের যা জাতীয়ভাবে মোট কর্মসংস্থান ২৬১৩৫৬৪ এর ২.২ শতাংশ। তুলনামূলক আলোচনায়

দেখা যায়, এ সময়কালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মোট শিল্প স্থাপনা ছিল যথাক্রমে ১১৫৮৮ (৪৬.৮১ শতাংশ) ও ৩৮৩১ (১৫.৭৪ শতাংশ) টি। অর্থাৎ ঢাকা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিভাগ ও জাতীয় সকল ক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চল অনেক পিছিঁয়ে ছিল।

Level of Industrialization হিসাবের মাধ্যমে শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। Level of Industrialization মূলত কোনো অঞ্চলে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের শতকরা হারকে বুঝায়। ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ সালে ঢাকা বিভাগে Level of Industrialization ছিল যথ াক্রমে ১৩.৭৫ শতাংশ ও ১৭.৪১ শতাংশ। সেখানে রংপুর বিভাগের Level of Industrialization ছিল ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ সালে যথাক্রমে ১.১২ শতাংশ ও ১.২৭ শতাংশ। Level of Industrialization - এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. নিম্ন শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ২ শতাংশ পর্যন্ত) ২. মধ্যম শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ছিল ২.০১ শতাংশ হতে ৫ শতাংশ) ও ৩. উচ্চ শিল্পায়িত অঞ্চল (Level of Industrialization ৫.০১ শতাংশ এবং এর উপরে)। এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা উচ্চ শিল্পায়িত অঞ্চল হলেও রংপুর নিম্ন শিল্পায়িত অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত।

Economic Census 2013 অনুযায়ী দেখা যায় রংপুর বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট হলো ৭৬৩৫৭ টি, যা জাতীয় মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ৮৬৮২৪৪ এর ৮.৭৯ শতাংশ । পক্ষান্তরে ঢাকা বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ছিল ২৫৭২৪৯ টি (২৯.৬২ শতাংশ), চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ম্যানুফেকচারিং এস্টাবলিস্টমেন্ট ছিল ১৯২২৯৯টি (২২.১৫ শতাংশ)। রংপুর বিভাগের এস্টাবলিষ্টমেন্টের সংখ্যা ঢাকা, চট্টগ্রাম হতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিল্পায়নের সাথে জড়িত কর্মসংস্থান, মোট উৎপাদন, মাথাপিছু মূল্য সংযোজন, মোট মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বিবেচনা করে দেখা যায় দেশের সকল অঞ্চলে সমানভাবে শিল্পায়ন হয়নি।

২০২২ সালের শিল্পনীতিতে রংপুর বিভাগের ৮টি জেলাকেই শিল্পে অনুন্নত জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৬ এর শিল্পনীতিতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় শিল্পায়নে পশ্চাতপদ এলাকা, সম্ভবনাময় এলাকা এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর এলাকায় সুযোগ সুবিধা বাস্তবায়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে। কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। রংপুর অঞ্চলে শিল্প প্রবৃদ্ধির বাধা হলো অবকাঠামোগত দুর্বলতা । শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন জ্বালানি- বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি। কিন্তু রংপুর বিভাগে পাইপ লাইন স্থাপন হলেও গ্যাস সরবরাহ না থাকায় পন্য উৎপাদন খরচ বেশী হয়। ফলে এ অঞ্চলের উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতিতে অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য কোনো ইনসেনটিভ বা সুবিধার ব্যবস্থা নেই। কোনো শিল্পনীতিতে এ অঞ্চলের জন্য কোনো আলাদা সুবিধা দেয়া হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষ দরিদ্র বিধায় তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় পুজিঁর অভাব রয়েছে। ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প না থাকায় এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপন কষ্টকর। এ অঞ্চলের সাধারণ প্রবণতা ব্যবসা কিংবা পণ্য মজুদ এর চেয়ে শিল্পস্থাপন অনেক বেশি ঝুকিপূর্ণ। ফলে এ অঞ্চলের ধনবান ব্যক্তিরা শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে এ অঞ্চল পণ্য পরিবহনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তা জ্ঞানের অভাব, সরকারি প্রণোদনার অভাব এ অঞ্চলের শিল্পায়ন না হওয়া একটি বড় কারণ। ব্যাংকগুলো ঋণসহায়তা করলেও এ অঞ্চলের তরুনদের উদ্যেক্তা হওয়ার প্রশিক্ষন, সচেতনতা, আগ্রহ না থাকায়

Start- Up সম্ভব হচ্ছে না। এ অঞ্চলে নীলফামারীতে উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা রয়েছে। এখানে মোট ১৮০ টি প্লটের মধ্যে মাত্র ২৪ টি প্লট ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদন করা হচ্ছে। জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চল হতে ৯৫.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার- এর পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে, বিনিয়োগ করা হয়েছে ২.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান করা হয়েছে ১৪৪ জনের। জ্বালানি হিসাবে গ্যাস সরবরাহ না থাকায় এটির সকল প্লট ব্যবহার সম্ভব হয়নি।

ভিশন ২০৪১ বলা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে যেহেতু উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ আসতে থাকবে, বাংলাদেশের জন্য তাই একটি শ্রমঘন রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ করাই সমীচীন হবে। কিন্তু ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেটের শিল্পমন্ত্রণালয়ের বরাদ্দে "রংপুর জেলায় বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)" স্থাপন বাবদ বরাদ্দ ৩ কোটি টাকা এবং "বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাও"- এর জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া বাজেটে রংপুর অঞ্চলের জন্য শিল্পখাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো বিশেষ বরাদ্দ নেই। অথচ "বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জে" বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা, "বিসিক ক্যামিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জে" ৮২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০" অধ্যাদেশ দ্বারা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পাঁচদশক পেরিয়ে গেলেও পরিকল্পিত শিল্পায়ন হয়নি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল এ যাবত গৃহিত সকল শিল্পায়ন পদক্ষেপের মধ্যে বৃহত্তম। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান ও অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও ২০১০ সালের ৪২ নং আইন "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০" এর শুরুতে সুস্পষ্ট বলা রয়েছে "দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন"। কিন্ত বাস্তবে এটি নতুন করে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি করছে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ সরকারি ৬৮ টি ও বেসরকারি ২৯ টি অর্থাৎ মোট ৯৭ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৬ টি (সরকারি ১৮ টি ও বেসরকারি ১৮ টি), চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫টি (সরকারি ২১ টি ও বেসরকারি ০৪ টি), রাজশাহী বিভাগে ০৮ টি (সরকারি ০৬ টি ও বেসরকারি ০১ টি), খুলনা বিভাগে ০৮ টি (সরকারি ০৭ টি ও বেসরকারি ০১ টি) সিলেট বিভাগে ০৬ টি (সরকারি ০৪ টি ও বেসরকারি ০২ টি), ময়মনসিংহ বিভাগে ০৮ টি (সরকারি ০৬ টি ও বেসরকারি ০২) টি, রংপুর বিভাগে ০৪ টি (সরকারি ০৪ টি- পঞ্চগড়, নীলফামারী,কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর) এবং বরিশাল বিভাগে ০৩ টি (সরকারি ০৩টি) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু সংখ্যায় পিছিয়ে নয়, এগুলোর বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা যায়, পিছিয়ে আছে রংপুর ও বরিশাল বিভাগ।

ঢাকা বিভাগে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জি-টু-জি হিসাবে জাপানের বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০০ একরের অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভূমি উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে

বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া জাইকা কর্তৃক আরো ২,৫০০ কোটি টাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়নে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ২৪৫ একরের মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদেশিরা বিনিয়োগ করছেন। মেঘনা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অর্থনৈতিক অঞ্চলে অত্যাধুনিক রোবট তৈরি হচ্ছে, যা শিল্প- কারখানায় ব্যবহৃত হওয়ার কথা রয়েছে। চট্রগ্রাম বিভাগের মিরসরাই, ফেনি ও সিতাকুণ্ডে ৩০ হাজার একর জায়গায় গড়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। দেশের প্রথম বড় আকারের পরিকল্পিত এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শিল্পনগর হবে এটি। এ শিল্প নগরীতে প্রায় ৩৬৬২.৩৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। দেশি-বিদেশি ১৫৯টি কোম্পানি এতে ২ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। প্রাথমিভাবে প্রায় আট লাখ লোকের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হবে এখানে। তবে বেজার প্রত্যশা অত্যন্ত ৩০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ হবে এখানে এবং ১৫ লাখ মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। মিরসরাই ও ফেনিতে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। মিরসরাই ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ১ হাজার একর জমি রাখা আছে। আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫৭৪৬ কোটি টাকা । কক্সবাজারের নাফ ট্যুরিজম পার্ক ও সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের উন্নয়ন কাজ চলমান। সাবরাং ট্যুরিজম তিনটি হোটেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে । বিদেশি পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টেকনাফের সাবরাং-এ ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনে সড়ক উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চলমান আছে। খুলনা বিভাগে মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল দেশের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ সড়ক, ব্রীজ, প্রশাসনিক ভবন, সুপেয় পানি সরবরাহ লাইন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রথম ডেভলপমেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, শিল্প স্থাপনের কাজ চলছে। মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইউনিলিভারসহ ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে জমি লিজ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রাজশাহী বিভাগে উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দ্বার হিসাবে পরিচিত সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিশাল কর্মযজ্ঞ এলাকা। ১০৩৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ১১টি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল। সেখানে ছোট বড় ৭০০টি শিল্প নির্মানের কাজ চলছে। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে ৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে।সিলেট বিভাগে মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার শেরপুরে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি ইজারা শেষ হয়েছে। বেজা'র অর্থায়নে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট ও গ্যাস সংযোগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর, প্রশাসনিক ভবন, জলাধার, পানি সঞ্চালন লাইন ইত্যাদি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু হবে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের ডিবিএল গ্রুপসহ ৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৩১ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেখানে ১.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়েগের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। ময়মনসিংহ বিভাগে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ৪৩৬.৯২ একর জায়গায় জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ও মাস্টার প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানি সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ সন্তোষজনক। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে তিনটি শিল্পের কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে।

দেখা যায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ব্যপক কর্মযজ্ঞ চলছে। হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দ। বিশেষ এ অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বিনিয়োগ নিয়ে এসেছে ভারত, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড। বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদিআরব ও অন্যান্য দেশকে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ করার। পাশাপাশি রংপুর বিভাগের চিত্র ভিন্ন। রংপুর বিভাগে ৪টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেলেও অগ্রগতি নেই। রংপুর বিভাগে মোট ৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের মধ্যে প্রথম অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে দিনাজপুরে। এজন্য দিনাজপুর সদর উপজেলার সুন্দরবন মৌজায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে ৮৭ একর খাস জমি হস্তান্তর করেছে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ২০১৯ সালে। মোট তিনশ আট একর জমির উপর এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে। বাকী ২২১ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। তবে এই অধিগ্রহণযোগ্য জমির উপর ঘরবাড়ি, স্থাপনা ও গাছপালা থাকায় তা স্থাবর সম্পত্তি। হুকুমদখল আইন ২০১৭ মোতাবেক ওই ২২১ একর জমি অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হবে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সম্প্রতি দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলকে প্রাথমিক লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। পঞ্চগড় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ২১৭ একর জমি বেজাকে হস্তান্তর করা হয়েছে ২৪ আগষ্ট ২০২০ তারিখে। প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে। তারপর আর অগ্রগতি নেই। নীলফামারী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য ১০৬ একর খাসজমি বেজার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ব্যাক্তিমালিকানাধীন ৩৫৭ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য স্কেচ ম্যাপ, দাগসূচি ও ধারণকৃত ভিডিও চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয় কিন্তু প্রকল্প স্থাপনে কোনো অগ্রগতি নেই। নীলফামারী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে। কুড়িগ্রাম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ১৪৯.৭৭ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আর অগ্রগতি নেই। রংপুরের জেলা প্রশাসন রংপুরের লাহিড়ীহাটে প্রায় ৩০০ একর খাসজমি চিহ্নিত করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দু বছর আগে বেজা কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র দিয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি তার কোনো পদক্ষেপ নেই। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দে কিছু অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম ও বরাদ্দ থাকলেও রংপুর বিভাগের কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম নেই।

রংপুরের জনগণের একটা বড় অংশ এখনও ২য় শিল্পবিপ্লব বিদ্যুৎ এবং ৩য় শিল্প বিপ্লব কম্পিউটার ও ইন্টারনেট- এর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেখানে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, ন্যানো প্রযুক্তি আরো বৈষম্য বাড়াবে কিনা প্রশ্ন থেকে যায়। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর। কিন্তু খানা আয়-ব্যয় জরীপ -২০১৬ অনুযায়ী রংপুর বিভাগের মোট খানার মাত্র ৫৯.২৯ শতাংশ বিদ্যুৎ, ১.৩৯ শতাংশ কম্পিউটার, ৩.৩৯ শতাংশ ই-মেইল এবং ৮৬.৮১ শতাংশ মোবাইল ব্যবহার করে। কাজেই ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পাওয়া কষ্টকর।

৩. বেকারত্ব বেশি

রংপুর বিভাগ দেশের সবচেয়ে দরিদ্র বিভাগে পরিণত হওয়ার পেছনে উচ্চহারের বেকারত্ব অন্যতম কারণ। বেকারত্ব যে দারিদ্র্যের হার হ্রাসে এক বিরাট বাধা সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের অন্য যেকোনো বিভাগের চেয়ে রংপুর বিভাগে বেকারত্বের হার সর্বাধিক যা এই বিভাগের উন্নয়নের পথে এক বিশাল অন্তরায়।

সারণি ২: ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক বেকারত্বের হার

বিভাগ	গ্রাম			শহর			সর্বমোট		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
রংপুর	৩.১	১২.২	৫.৯	৫.০	২৮.৬	১১.৩	৩.৫	১৪.৭	৬.৯
চট্টগ্রাম	২.৯	৪.০	৩.৩	২.৯	৫.৮	৩.৭	২.৯	৪.৪	৩.৫
বরিশাল	৩.৯	৭.৩	৪.৯	৫.৫	১৫.৭	৭.৯	৪.২	৮.৭	৫.৪
খুলনা	২.৮	৬.৪	৩.৯	২.৮	১০.৬	৪.৭	২.৮	৭.১	৪.১
ঢাকা	৩.০	৩.৩	৩.১	২.৮	৬.০	৩.৭	২.৯	৪.৫	৩.৪
সিলেট	২.৭	৫.৩	৩.৩	৩.৪	১০.৯	৪.৬	২.৯	৬.০	৩.৬
রাজশাহী	৩.০	৫.৯	৪.১	৪.৪	১১.৪	৬.৬	৩.৩	৬.৭	৪.৬
সর্বমোট	৩.০	৫.৯	৪.০	৩.৩	৮.৯	৪.৯	৩.১	৬.৭	৪.২

উৎস: Labour Force Survey, Bangladesh 2016-17, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, January 2018.

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বেকারত্বের হার ৬.৯ শতাংশ যা বাংলাদেশের সামষ্টিক বেকারত্বের হারের ৪.২ শতাংশএর চেয়ে অনেক বেশি। রংপুর বিভাগে উচ্চ বেকারত্বের কারণ হিসাবে এ বিভাগে কর্মসংস্থান কম, শিল্পায়ন না হওয়া, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি না হওয়া, অর্থ বিনিয়েগের সামর্থ্য না থাকা, প্রশিক্ষণের অভাব, উদ্যোক্তা হওয়ার মনোভাব না থাকা, ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা মোটাদাগে চিহ্নিত করা যায়।

৪. বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য

দারিদ্র্যশূন্য দেশ গড়তে যেমন প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক। আর অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। অবকাঠামোগত দিক থেকেও রংপুর বিভাগ অনেক পিছিয়ে রয়েছে যার অন্যতম প্রধান কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য যা ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি'র বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি) এর 'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এডিপি'র বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ-

সারণি ৩: ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিভাগভিত্তিক বরাদ্দ

বিভাগ	এডিপিতে বরাদ্দের হার
ঢাকা	৩৮.৫৪%
চট্টগ্রাম	২৭.৭৫%
রাজশাহী	১০.১২%
খুলনা	৮.২০%
সিলেট	৪.৫৬%
বরিশাল	৪.১৮%
ময়মনসিংহ	৩.৫৩%
রংপুর	৩.১৩%

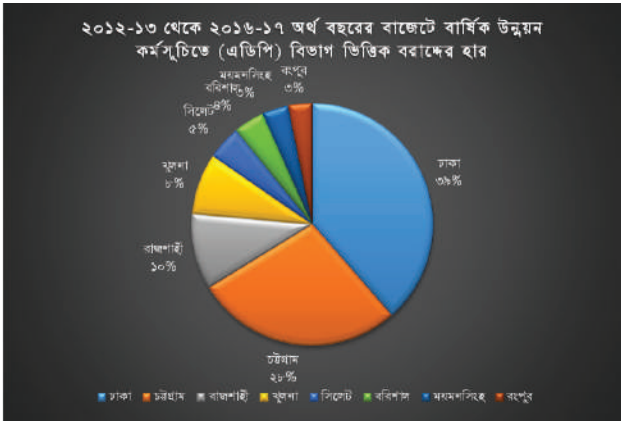

উৎস: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)

২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিতে রংপুর বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র গড় হিসাবে ৩.১৩ শতাংশ, যেখানে ঢাকা বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৮.৫৪ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই পরিমান কমে দাড়িয়েছে ০.৯৮ শতাংশ। ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বর্তমানেও এ বরাদ্দের খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, বৈষম্য শুধু বিভাগগুলোর মধ্যেই নয়, একই সঙ্গে তা একটি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বৈষম্য রয়েছে। দেশের মধ্যাঞ্চল তুলনামূলকভাবে বরাদ্দের বেশিরভাগ অংশ পেয়ে থাকে। এডিপিতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া জেলাগুলো হচ্ছে নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর ও বগুড়া।

কৃষিখাতে জিডিপি ও কর্মসংস্থান অংশ ক্রমশ সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও এখন থেকে ২০৩১ সালের মধ্যবর্তী মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কৃষির প্রধান ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে ভিশন- ২০৪১ এ বলা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো, "পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আয় সহায়তা প্রদানে সহায়তা করতে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক সেবাসমূহের ওপর আলোকপাত করা।" কিন্তু ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট বরাদ্দ ৪৩৩৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা হলেও রংপুর অঞ্চলের জন্য গৃহিত প্রকল্পগুলো হলো- ১. "রংপুর ,দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটো সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কর্মসূচি (ডিএএম)" প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ২ কোটি ৫০ লাখ ১৬ হাজার টাকা ২. "রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের নতুন জাতের গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি"- প্রকল্পে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার মতো কিছু অল্প বরাদ্দের নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দেখা যায়, "কুমিল্লা-চাঁদপুর- ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পে" যখন বরাদ্দ ১৫৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা তখন "ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পে" মোট বরাদ্দ ৬৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। "আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে"

যখন বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা, "ক্লাইমেট- স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা জলবায়ু পরিববর্তন অভিযোজন প্রকল্পে" বরাদ্দ ২২ কোটি টাকা, তখন রংপুর অঞ্চলে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়নি। অধিকন্তু "চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্যব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি (বিনা) প্রকল্পে" এ বছরের বাজেটে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কৃষিক্ষত্রে গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধায় সহজলভ্যতা, রপ্তানি সহায়তার মাধ্যমে খামারউৎপাদনে বহুমুখিতা শক্তিশালী করতে নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য। বিশেষ করে, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, দুধ উৎপাদন এবং ফলমূল,শাকসব্জিও ফুল চাষের ভূমিকা আরো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ বছরের বাজেটে এ ধরণের কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেই।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ পিছিয়ে। পুরুষ শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও এখনও নারী শিক্ষার হারে পিছিয়ে আছে (৪৯.৩৬ শতাংশ)। প্রাথমিক শিক্ষায় নিট এনরোলমেন্ট বেশি হলেও ড্রপ আউট বেশী। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এনরোলমেন্ট কম। টারশিয়ারী পর্যায়ে এনরোলমেন্ট আরও কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন স্কুল কম থাকায় মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব রয়েছে। আর্থিক কারন, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা, প্রতিকুল পরিবেশ ইত্যাদি কারণে উচ্চশিক্ষায় এ অঞ্চলের জনগণ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ভিশন ২০৪১ অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মানব পুঁজিগঠনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগই হবে বাংলাদেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো নীতি-চ্যালেঞ্জ। এজন্য যথাগুরুত্বসহ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুযোগের বিস্তার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূল করার স্বার্থে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত অর্থায়ন। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো " পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত চাহিদার উন্নতি বিধানে এডিপি ব্যয়ের ওপর আলোকপাত করা"। রংপুরে দারিদ্র্য হার বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে অন্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক বরাদ্দ প্রয়োজন হলেও তা দেয়া হয়নি। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রয়োজনের তুলনায় কম। রংপুরে চিকিৎসা সেবার সুবিধা ব্যাপক গণমানুষের কাছে পৌঁছতে পারছেনা অত্যধিক ব্যয়, সেজন্য চিকিৎসা সেবার ব্যয় কমিয়ে সবার নাগালে পৌছঁতে হলে ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রীসহ সংযুক্ত সকল ক্ষেত্রে ভ্যাট কমাতে হবে। উন্নত লাবরেটরি, উন্নত বেসরকারি বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদে আয়করমুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন যা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি, এটি বাস্তবায়ন হলে রংপুরে মেডিকেল শিক্ষার উন্নয়ন হবে।যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে এদেশে দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষেত্রে ও জরুরী চিকিৎসা খাতের উন্নয়নেরর জন্য যাবতীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। হাইওয়ের পাশে প্রতি উপজেলায় স্বয়ংসম্পূর্ন ট্রমা সেন্টার, বার্ন ইউনিট গঠন করা দরকার। প্রতি উপজেলায় উন্নত ল্যাব সুবিধা বাড়াতে হবে। রংপুর বিভাগের প্রান্তিক জেলা গুলোতে হার্ট, কিডনি ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নেই। রংপুরে দরিদ্র এলাকা বিধায় ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবায় সরকারি সহায়তা, স্বাস্থ্যবিমা, চিকিৎসায় ভ্যাট-ট্যাক্স রেয়াত ও চিকিৎসাসেবার মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (শিল্প ৪.০) ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ তাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার বৈশ্বিক প্রবাহের সবকিছুতেই রূপান্তর ঘটাচ্ছে। কিন্তু বাজেটে রংপুর অঞ্চলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির কোনো পদক্ষেপ নেই। রংপুর বিভাগে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মাত্র ৪টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১টি। অথচ মোট ৫৪ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালওয়র মধ্যে ১৬ টি এবং ১০৯ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৫৬ টি ঢাকায় অবস্থিত। শিক্ষাখাতে রংপুর বিভাগ বাজেট বরাদ্দে পিছিয়ে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সকল পর্যায়ে বাজেটের বরাদ্দ রংপুর বিভাগে কম। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০২২-২৩ এর উন্নয়ন বাজেটে "জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে" বরাদ্দ ৫৯৮ কোটি টাকা, "শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় নেত্রকোনা স্থাপনে" বরাদ্দ ৭৮৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাস নিমার্ণে" বরাদ্দ ৭১৯ কোটি টাকা, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও একাডেমিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পে" বরাদ্দ ৪২৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। অথচ ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে রংপুরের "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে" বরাদ্দ মাত্র ১৫ কোটি টাকা, দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে" বরাদ্দ শূন্য।

৫. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ কম

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রংপুর বিভাগ হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার কম। BMET এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০০৫ সাল হতে ২০২২ এর নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে মোট ১০৫০৯২০৮ জনের (সারণি ৪)। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের ৪০৫৭৪৯৬ জন (৩৯ শতাংশ), ঢাকা বিভাগের ৩১২৬৪৩২ জন (২৯.৮ শতাংশ), সিলেট বিভাগের ৮৬১৬২৭ জন (৮.২ শতাংশ), রাজশাহী বিভাগের ৭৩৫২১৭ জন (৬.২ শতাংশ), খুলনা বিভাগের ৬৯০৮৬৪ জন (৬.৬ শতাংশ), বরিশাল বিভাগের ৪৪০১৪৫ জন (৪.২ শতাংশ), ময়মনসিংহ বিভাগের ৪১০৫১৩ জন (৩.৯২ শতাংশ) এবং রংপুর বিভাগের ১৮৬৯১৪ জন (১.৮ শতাংশ)। শুধু ২০২২ সালের জানুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগ হতে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩৭২০০৯ জনের সেখানে রংপুর বিভাগ হতে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ১৯৯৭৮ জনের। ২০২২ সালে জানুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা হতে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯৭০০৩ জনের সেখানে রংপুর জেলার লালমনিরহাটের বিদেশ কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৯০৬ জনের। আবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরীপ ২০১৬ এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১৬ সালে যেখানে মোট রেমিটেন্সের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের অর্জন ৪১.৭৮ শতাংশ, ঢাকা বিভাগের অর্জন ৩০.৯৮ শতাংশ, সেখানে রংপুর বিভাগের অর্জন মাত্র ০.৮৫ শতাংশ।

সারণি ৪: বিভাগ ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান [২০০৫-২০২২ (নভেম্বর)]

বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান		বিভাগ	জৈলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	
		সংখ্যা	%			সংখ্যা	%
চট্টগ্রাম (৪০৫৭৪৯৬ জন বা, ৩৯%)	কুমিল্লা	১১৩০০০০	১০.৭৫	খুলনা (৬৯০৮৬৪ জন বা, ৬.৬০%)	মাগুরা	৪৭৯৩০	০.৪৬
	চট্টগ্রাম	৮১৪০৪৭	৭.৭৫		সাতক্ষীরা	৪৮৫৬২	০.৪৬
	ব্রাক্ষণবাড়িয়া	৫৯৬৬৩২	৫.৬৮		বাগেরহাট	৪৮৯৯২	০.৪৭
	চাঁদপুর	৩৯৫৭৪৩	৩.৭৭		খুলনা	৪৬৬৭৯	০.৪৪
	নোয়াখালী	৪১৯৭৯২	৮.৯৯		নড়াইল	৪৩১৬৪	০.৪১
	ফেনী	২৭০৭৮৫	২.৫৮		মোট	৬৯০৮৬৪	৬.৬০%
	লক্ষীপুর	২৭০০৬৩	২.৫৭	রাজশাহী (৭৩৫২১৭ জন বা, ৬.২০%)	বগুড়া	১৪১৯৯২	১.৩৫
	কক্সবাজার	১৩৭৫৫৬	১.৩১		পাবনা	১১৬১৪৭	১.১১
	খাগড়াছড়ি	১১১৫৭	০.১১		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৬৮৪২	০.৯২
	রাঙ্গামাটি	৬৪০৩	০.০৬		নওগাঁ	৮৬৩৫১	০.৮২
	বান্দরবন	৫৩২৭	০.০৫		সিরাজগঞ্জ	৭২৮৫৯	০.৬৯
	মোট	৪০৫৭৪৯৬	৩৯%		রাজশাহী	৪৯৯৩৮	০.৪৮
ঢাকা (৩১২৬৪৩২ জন বা, ২৯.৮%)	টাঙ্গাইল	৫০৭০৪৭	৪.৮২		নাটোর	৪৯১৭৩	০.৪৭
	ঢাকা	৪৫৮৬৭৯	৪.৩৬		জয়পুরহাট	১২১৯১৫	১.১৬
	মুন্সীগঞ্জ	২৯৬১৭১	২.৮২		মোট	৭৩৫২১৭	৬.২০%
	নরসিংদী	৩১৪৬৮৬	২.৯৯	বরিশাল (৪৪০১৪৫ জন বা, ৪.২০%)	বরিশাল	১৪৪১৭৪	১.৩৭
	নারায়ণগঞ্জ	২৫৯০২২	২.৪৬		ভোলা	৯৭৬৪০	০.৯৩
	কিশোরগঞ্জ	২৯২৩৭৪	২.৭৮		পিরোজপুর	৬৪৩২৮	০.৬১
	গাজীপুর	২৪২১৩১	২.৩০		বরগুনা	৫০৭৪২	০.৪৮
	ফরিদপুর	২৩৩৭৯৫	২.২২		পটুয়াখালী	৪৪৪১৩	০.৪২
	মানিকগঞ্জ	২১৯১৪২	২.০৯		ঝালকাঠি	৩৯১১৮	০.৩৭
	মাদারীপুর	১৪৮৭৪৪	১.৪২		মোট	৪৪০১৪৫	৪.২০%
	শরীয়তপুর	১৩৮১৩১	১.৩১	ময়মনসিংহ (৪১০৫১৩ জন বা, ৩.৯২%)	ময়মনসিংহ	২৩৯৯৭৬	২.২৮
	রাজবাড়ী	৮৫৩৮৪	০.৮১		জামালপুর	৯৫৩৯৯	০.৯১
	গোপালগঞ্জ	৬৪৯৯৬	০.৬২		নেত্রকোণা	৫২০৯০	০.৪৯
	মোট	৩১২৬৪৩২	২৯.৮%		শেরপুর	২৩০৪৮	০.২২
সিলেট (৮৬১৬২৭ জন বা, ৮.২%)	সিলেট	২৭২৪৯৫	২.৫৯		মোট	৪১০৫১৩	৩.৯২%
	মৌলভীবাজার	২০৮৪২৪	১.৯৮	রংপুর (১৮৬৯১৪ জন বা, ১.৮%)	গাইবান্ধা	৪৬৯১০	০.৪৫
	হবিগঞ্জ	২১২৫৮৫	২.০২		রংপুর	৩৫৪৪২	০.৩৪
	সুনামগঞ্জ	১৬৮১২৩	১.৫৯		দিনাজপুর	২৮৫২৯	০.২৭
	মোট	৮৬১৬২৭	৮.২%		কুড়িগ্রাম	২৬৩৬৬	০.২৫
খুলনা (৬৯০৮৬৪ জন বা, ৬.৬০%)	যশোর	১২১১৪০	১.১৫		নীলফামারী	১৮৩১৯	০.১৭
	কুষ্টিয়া	১০৮৬১৮	১.০৩		ঠাকুরগাঁও	১৫৮৪৩	০.১৫
	ঝিনাইদহ	৯৮৯৭০	০.৯৪		লালমনিরহাট	৮৬২৪	০.০৮
	মেহেরপুর	৭৪০৮০	০.৭০		পঞ্চগড়	৬৮৮১	০.০৭
	চুয়াডাঙ্গা	৫২৭২৯	০.৫০		মোট	১৮৬৯১৪	১.৮%
সর্বমোট = ১০৫০৯২০৮ জন							

উৎস: জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, নভেম্বর, ২০২২ খ্রি.

ভিশন ২০৪১ এ বলা হয়েছে “দেশের দারিদ্র্য পীড়িত দুর্যোগপ্রবণ বেশ কিছু জেলার জনগণের পক্ষে অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়, প্রশিক্ষণের অভাব এবং তথ্যে অভিগম্যতার অভাব বিভিন্ন কারণে অভিবাসী শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূত্রপাত, তথ্যে

অভিগম্যতা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো শোষণমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো ক্রমপরম্পরায় সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।” ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো “পিছিয়ে পড়া জেলা গুলোতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা তৈরি করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের খরচ মেটাতে নির্ভুল তথ্য, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলা গুলোর অবস্থান উন্নত করা”। যোগাযোগ সুযোগ-সুবিধার অভাব, সচেতনতার অভাব ও তথ্য না জানার কারণে দিন দিন এ অঞ্চলের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। রংপুর বিভাগের অগণিত কর্মহীন মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি জেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। কিন্তু এ বাজেটে এসংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকার এসমস্ত পিছিয়েপড়া এলাকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করলে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রের মাত্রা হ্রাস ও অঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. অবকাঠামোগত উন্নয়ন কম

ভিশন ২০৪১ এ ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা আটটি আঞ্চলিক নগর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট যুক্তিযুক্তভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, প্রধান গুরুত্ব দেয়া হবে অবশিষ্ট পাঁচটি নগরের নাগরিক সুবিধা সংবলিত অবকাঠামো শক্তিশালী করা। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো “পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুদান বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলা”। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রংপুর বিভাগে স্থানীয় সরকার ও অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ কম। যেমন ২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেটে “ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের” বরাদ্দ ১২০৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, “ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের” বরাদ্দ ৭৭৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, “গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের” বরাদ্দ ১০০০ কোটি ২ লক্ষ টাকা, অথচ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের” বরাদ্দ মাত্র ৪৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এবারের বাজেটে “রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে”র বরাদ্দ ১৩৭৩ কোটি টাকা, “চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের” বরাদ্দ ১৪৭৭ কোটি টাকা। অথচ “রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল” এখনও ‘খসড়া বিল’ পর্যায়ে রয়ে গেছে। আবার এবারের উন্নয়ন বাজেটে “ঢাকা ওয়াসার” বরাদ্দ ৩০১৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, চট্টগ্রাম ওয়াসার বরাদ্দ ১৩৩৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, অথচ ‘রংপুর ওয়াসা’ আজ পর্যন্ত গঠন করা হয়নি। এ অঞ্চলে বাস্তবায়ন হয়নি কোনো মেগা প্রকল্প। এছাড়া বর্তমান সরকারের বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বেশির ভাগ ঢাকা ও দক্ষিণাঞ্চলকেন্দ্রিক। অন্যান্য বিভাগে দু-একটি থাকলেও একটিও মেগা প্রকল্পের বরাদ্দ নেই রংপুর বিভাগে। (সারণি- ৫)

সারণি ৫: মেগা প্রকল্পসমূহ (৮টি)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বিভাগ	টাকার পরিমাণ
১.	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ *২য় সংশোধিত) প্রকল্প	ঢাকা	৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা
২.	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (পাবনা)	রাজশাহী	১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি টাকা
৩.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রকল্প (মেট্রোরেল)	ঢাকা	২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা
৪.	২ ৬০০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র,বাগেরহাট)	খুলনা	১৬ হাজার কোটি টাকা
৫.	মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম (কক্সবাজার)	চট্টগ্রাম	৩৫ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা
৬.	পায়রা সমুদ্রবন্দর (পটুয়াখালী)	বরিশাল	১১ হাজার ৭২ কোটি টাকা
৭.	পদ্মা সেতু রেলসংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	ঢাকা	৩৯ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা
৮.	দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে ঘুমদুম পর্যন্ত সিঙ্গেললাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প	চট্টগ্রাম	১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকা

উৎস: "ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন: অর্জন ও প্রত্যাশা", বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ৬ জুন, ২০২২।

এভাবে প্রতিবছরই বাজেটে হাজার কোটি টাকার বৈষম্য হচ্ছে। পিছিয়ে পড়ছে রংপুর অঞ্চল। আবার বাজেট হলেও তা বাস্তবায়নে ধীরগতি এ অঞ্চলের উন্নয়নে বাধাঁ স্বরূপ। যেমন ২০১৮ সালে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে যে ড. এম ওয়াজেদ মিয়া হাইটেক পার্ক রংপুরের সিটি কর্পোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ড খালিশকুড়ি এলাকায় কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ২৬ মে ২০২২ তারিখে সেটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে মাত্র। এ প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২০ সালের জুন মাসে।

৭. বন্যা ও নদীভাঙ্গন বেশি

বন্যা ও নদীভাঙ্গন রংপুর অঞ্চলের দারিদ্র্যের একটি বড় কারণ। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলা বন্যা ও নদীভাঙ্গনের কারণে দারিদ্র্যের হার জেলাওয়ারী সর্বোচ্চ। ভিশন ২০৪১ স্পষ্টত: বলা হয়েছে "বাংলাদেশের ১৫টি দরিদ্রতম জেলার অধিকাংশই বন্যা, নদী ভাঙ্গন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত উচ্চ অরক্ষণশীলতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কুড়িগ্রামের দৃষ্টান্ত উদ্বেগজনক, দারিদ্র্য সংগঠন এমনকি স্বাধীনতালাভের ৪৫ বছর পরেও খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) ২০১৬ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এখানে দারিদ্র্যের অভিঘাতের হার ৭০ শতাংশ। এটি সবার জানা যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক থেকে সবচেয়ে অরক্ষিত জেলাগুলোর মধ্যে কুড়িগ্রাম অন্যতম। প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবেশমুখে অবস্থিত কুড়িগ্রাম প্রতি বছর বন্যা ও প্লাবনের শিকার হয়, যা এর সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।" নদীভাঙ্গন ও বন্যা এ অঞ্চলের দীর্ঘদিন হতে চলে আসা দারিদ্রের একটি মূল কারণ। প্রতিবছর নদীভাঙ্গন ও বন্যায় হাজার হার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবাদি জমি নষ্ট, ফসল নষ্ট, বীজতলা নষ্ট, ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়।

২০২২-২৩ সালের উন্নয়ন বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এবারে রংপুর অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। লক্ষনীয় এসব প্রকল্প সবই স্বল্পমেয়াদী। তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ইত্যাদির স্থায়ীভাবে নদীতীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বিজ্ঞান, প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন বাজেটে কোনো প্রকার বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

৮. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বা সোস্যাল সেফটি নেট- এ বরাদ্দ কম

ভিশন ২০৪১ এ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের মূল উপাদানের একটি হলো সামাজিক সুরক্ষা বা সোস্যাল সেফটি নেট বৃদ্ধি। কর্মসংস্থানভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। আবার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হলো পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেওয়া কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় রংপুর অঞ্চলে দারিদ্র্য বেশি হলেও সামাজিক সুরক্ষার জন্য আলাদা কোনো প্রকল্প এবারের উন্নয়ন বাজেটে নেই। অধিকন্তু: ইতিপূর্বে গৃহিত “লালমনিরহাট জেলার অতিদ্ররিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন” প্রকল্পে, ‘অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্নকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন” প্রকল্পে এবং “অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ:, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান” প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে কোনো বরাদ্দ দেয়া হয়নি। রংপুর অঞ্চলের দেশের সর্বোচ্চ দারিদ্র্য দূর করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষ বরাদ্দ বা প্রকল্প প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় দারিদ্র নিরসনে “উত্তরাঞ্চলে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)” ২০২২-২৩ সালে বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা, যা হতাশাজনক। খানা আয়-ব্যয় জরীপ ২০১৬ অনুযায়ী বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার কম (২৬.৪৯ শতাংশ) হলেও সোস্যাল সেফটি নেটের সুবিধাভোগী পরিবার ৫৯.৯ শতাংশ, অথচ রংপুরে দারিদ্র্যের হার বেশি (৪৭.২৩ শতাংশ) হলেও সোস্যাল সেফটি নেটের সুবিধাভোগী পরিবার ৪৫.২ শতাংশ।

৯. ঋণ ও ব্যাংকিং খাতে সমস্যা

শাখা পর্যায়ে ম্যানেজারদের বিজনেস ডেলিগেশন না থাকাটাও এসএমই ঋণ সম্প্রসারণের অন্তরায়। ম্যানেজারদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শাখাপর্যায়ে অনেক ম্যানেজারের এসএমই ঋণ দেয়ার কোনো ডেলিগেশন নেই বা থাকলেও তা খুবই সীমিত। ফলে ওইসব শাখার ১ লাখ টাকার এসএমই ঋণ প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের সিআরএম ডিভিশনে পাঠাতে হয়। ফলে ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হয়ে যায়। দীর্ঘ ঋণ প্রস্তাব ফরম্যাট কিংবা তথ্যের বাহুল্য বা একই তথ্য বারবার দিতে গিয়ে, যেমন- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের একই তথ্য আবারো ঋণ প্রস্তাবে ও অফিস নোটে উল্লেখ করতে গিয়ে ঋণ প্রস্তাবটিকে দীর্ঘ করে ফেলা হয়। ফলে প্রস্তাব তৈরিতে কালক্ষেপণ হয়। উচ্চমাত্রার সুদহারের কারণে অনেক ব্যবসায়ী এসএমই ঋণ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক সাফল্য পান না। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদের চক্রবৃদ্ধি হিসাব করতে বললেও অনেক ব্যাংক এখনো তা মাসিক ভিত্তিতে করে। ফলে কার্যকর সুদহার ঘোষিত হারের চেয়ে আরো বেশি হয়ে যায়। অন্যদিকে সুদবহির্ভূত খরচ যেমন ঋণ আবেদন ফি, প্রক্রিয়াকরণ ফি, ডকুমেন্টেশন ফি, মনিটরিং ফি, আইনজীবীর ফি, সার্ভেয়ার/জামানত মূল্যায়নকারীর ফি, অডিট কোম্পানির ফি, রেটিং ফি, স্ট্যাম্প খরচ, দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ, ইন্স্যুরেন্স খরচ, রিস্ক ফান্ড, কমিটমেন্ট চার্জ, আর্লি সেটলমেন্ট ফি, সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, বার্ষিক এক্সাইজ ডিউটি ইত্যাদি ঋণের সুদের হার আরো ২-৩ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে নানা অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়।

রংপুর বিভাগের উন্নয়ন সম্ভাবনা

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ অধ্যায় ৮ এর শিরোনাম করা হয়েছে "অনগ্রসর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান" এতে বলা হয়েছে "অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে শিল্পনগরী / শিল্প পার্ক স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, অনগ্রসর এলাকায় শ্রমনিবিড় এবং পরিবেশ বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যেগে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০১৬, এবং বিসিক আইন অনুযায়ী শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান করা হবে।" এসকল আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন হলে রংপুর বিভাগের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

রংপুর অঞ্চল শিল্পের জন্য এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্থান কারণ এখানে রয়েছে সস্তা শ্রম, শিল্পের কাচাঁমাল, সড়ক, রেল ও বিমান পথের সুবিধা, ইপিজেড এবং শিল্প উপকরণের সহজলভ্যতা।

এ অঞ্চলে নানা ধরণের কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আম (হাড়িভাঙ্গা, সূর্যপুরি), কাঠাঁল, লিচু, আনারস থেকে জুস, জ্যাম, জেলি, মারম্যালেইড, ফল টিনজাতকরণ, কলা থেকে ড্রায়েড ব্যানানা ও ব্যানানা চিপস, আলু থেকে পটোটো চিপস, স্ন্যাকস, ফ্রজেন ফ্রেনস, ফ্রায়েড পটেটোস, ডিহাইড্রেটেড পটেইটো ফ্লেইকস ও পটোটো পাউডার, টমাটো থেকে টমাটো পালপ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সবজি জাতীয় কৃষি পণ্যের মধ্যে সীম, লাউ, বেগুন, বাধাকপি, গাজর, ফুলকপি, ঢেড়স, মটরশুটি ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যেতে পারে।

সারণি ৬: দেশের বার্ষিক ফল উৎপাদনে রংপুর অঞ্চলের অবদান বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থ বাংলাদেশ, ২০১৪

ফল	উৎপাদনে ১ম স্থান	উৎপাদনে ২য় স্থান
কলা	রংপুর (৯৯৮৬০ মে. টন)	কুষ্টিয়া (৯৯৭৫১ মে. টন)
আম	রাজশাহী (৪৪৬৩৯২ মে. টন)	দিনাজপুর (৭৬৬২৩ মে. টন)
কাঁঠাল	ঢাকা (১০৭১৯৯ মে. টন)	দিনাজপুর (১০৪২৭৮ মে. টন)
লিচু	দিনাজপুর (১৩৫৮৮ মে. টন)	রাজশাহী (৮০৮২ মে. টন)

এ অঞ্চলে আরো সম্ভাবনাময় শিল্প গড়ে ওঠতে পারে সেগুলো হলো- ডেইরি, গো- খাদ্য, পোলট্রি ফার্ম, ট্যানারী, দুগ্ধ প্রসেসিং, ভুট্টা প্রসেসিং, আদা প্রসেসিং।

পণ্যের উপজাত উপাদান ও নিম্নমানের পাট ব্যবহার করে কৃত্রিম উড কারখানা, ছোট ছোট জুট মিল, মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, শিল্পের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা ইত্যাদি। পণ্যে পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামূলক আইন-২০১০ বাস্তবায়ন করা।

প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সুবিধা নিশ্চিত করলে উত্তরা ইপিজেড দেশী ও বিদেশি বিনিয়োগের অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

রংপুরে হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আইসিটি ও সফটওয়্যার শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া টেলিকমিউনিকেশন, মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ, ইলেকট্রনিকস শিল্পের সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ছাড়া রংপুরে হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে অনেক বেশি ফ্রি ল্যান্সার তৈরি হবে, যারা বিদেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

রংপুর অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দপুরে উৎপাদিত ট্রাউজার, মোবাইল প্যান্ট, জ্যাকেটসহ অন্যান্য গার্মেন্টস পণ্যের নেপাল ও ভুটানে বেশ চাহিদা রয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উপর ভিত্তি করে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হওয়ায় এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। ফুলবাড়ি কয়লা খনি, খালাসপীর কয়লাখনি, সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর, কিশোরগঞ্জ উপজেলার চাদঁখান, বাহাগিলি ও মাগুড়া ইউনিয়ন এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ ইউনিয়নের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ মজুদ কয়লা যথাযথ প্রক্রিয়ায় উত্তোলন শুরু করলে জ্বালানি সমস্যা সমাধান এবং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে যে সিলিকা বালু ও নুড়ি পাথর রয়েছে তা থেকে বালু ও নুড়ি পাথরকেন্দ্রিক শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। সৈয়দপুর বিমানবন্দর হতে নেপাল ও ভুটানের ধূরত্ব খুবই কম। ফলে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক কার্গো সার্ভিস চালু করে নেপাল ও ভুটানে চাহিদা আছে এমন পণ্য তৈরি কারখানা রংপুর অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কম হবে এবং পণ্য রপ্তানিতেও সময় কম লাগবে।

রংপুর বিভাগে নানা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা পর্যটন শিল্প বিকাশে সহায়ক। বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ, কাকিনায় কবি শেখ ফজলল করিমের বাড়ি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি যাদুঘর, কেরামতিয়া মসজিদ, তিন বিঘা করিডোর, তিস্তা ব্যারেজ, কান্তজিউ মন্দির, রামসাগর দিঘি, তাজহাট জমিদারবাড়ী, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর টাউন হল, মিঠাপুকুর তিন কাতারের মসজিদ, ইটাকুমারী জমিদার বাড়ি, দেওয়ান বাড়ি জমিদারবাড়ি, ঝাড়বিশলা (কবি হেয়াত মামুদের সমাধি), লাহিড়ীরহাট বধ্যভুমি, সাহাবাজপুর বৌদ্ধনাথের ধাম (শিবমন্দির), খান চৌধুরী মসজিদ, দেবী চৌধুরানীর বাড়ি, পঞ্চগড়ের চা বাগান, কাঞ্চনজজ্ঘার শৃঙ্গ দর্শন ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে রংপুরে প্রায় দেড় লাখ মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে হস্তশিল্পের ৬০ শতাংশই রংপুরের শতরঞ্জি। বর্তমানে রংপুরের শতরঞ্জি পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর চাহিদা ব্যাপক। ‘কারুপণ্য’ নামের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শতরঞ্জি তৈরির পাঁচটি কারখানা গড়ে তুলেছে। আরও রয়েছে ‘নীড় শতরঞ্জি’, ‘শতরঞ্জি পল্লী’, ‘চারুশী’ শতরঞ্জিসহ অনেক কারখানা। কারখানা ছাড়াও বাড়ির আঙিনা কিংবা উঠানে, বাড়ির ছাউনির নিচে নিপুণ হাতে চলছে শতরঞ্জি বুননের কাজ। শতরঞ্জি শিল্পের ব্যপক সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর প্রিজম প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় “রংপুর বেনারশি প্রকল্প-০২” অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হলে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর ফলে বৃহত্তর রংপুর জেলার ৫টি উপজেলায় বেশি বেশি সুবিধাভোগী প্রণোদনার আওতায় আসবে। এর ফলে শিল্পে পিছিয়ে পড়া রংপুর অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

নারীদের পরিচালিত উদ্যোগগুলোকে ক্ষুদ্র থেকে কীভাবে মাঝারি প্রকল্পে রূপান্তর করা যায় তা নিয়ে আমাদের সবাইকে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপশি নারীদেরকেও আর্থিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগের আওতায় আনতে হবে। তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক নারী উদ্যোগে ঋণ-বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০২৪ সাল অন্তে তাদের সিএমএসএমই খাতের নিট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোগে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দিয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের

অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নানা প্রকার নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণ-বিনিয়োগ যথ াসময়ে সমন্বয়, আদায়, পরিশোধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১ শতাংশ হারে সর্বমোট ২ শতাংশ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। আমরা আশা করছি এর ফলে আমাদের নারী উদ্যোক্তারা তাদের অঙ্গীকার, মনোবল আর সাহসকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন পরিবর্তন করতে পারবেন। আশার কথা হলো, আমাদের নারীসমাজের নিষ্ঠা, উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রম নিপুণতার কারণে অর্থনীতির মূল স্রোতে তাদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, দেশজ শিল্পায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পুঁজি ও শিক্ষার অভাব, সামাজিক ও পারিবারিক বাধা, পণ্য বাজারজাত ইত্যাদি সমস্যা দূরীভূত করা হলে রংপুর বিভাগে নারী শিল্পোদ্যোগের বিকাশ কাংখিত মাত্রায় উন্নীত হবে।

সারণি ৭: রংপুর বিভাগে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা (শিল্পনীতি ২০১৬)

জেলার নাম	শিল্পের সম্ভাবনাময় খাতসমূহ
রংপুর	হস্তশিল্প (শতরঞ্চি, টুপি তৈরি), বেনারশী শাড়ি, সাবান, হিমাগার শিল্প, রাবার চাষ, প্লাস্টিক সামগ্রী, চট ও সুতলি তৈরি, দুগ্ধ খামার, স্বাস্থ্য সেবা, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য, রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্প, আম থেকে পাল্প তৈরি, মিল, চাতাল, অটো রাইস মিল, সুপারি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কম্পোষ্ট সার, গুটি ইউরিয়া তৈরি, মৎস খামার, স্বাস্থ্য সেবা, ইটভাটা, কলা প্রক্রিয়াকরণ, আলু-সবজি সংরক্ষণাগার, নার্সারি, বনায়ন, তামাক শিল্প, ইত্যাদি।
কুড়িগ্রাম	পাট ও পাটজাত শিল্প, হিমাগার, কাঠ শিল্প. বাঁশ শিল্প, দুগ্ধ খামার, মৎস খামার, লটকন ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, নৌযান শিল্প ইত্যাদি।
লালমনিরহাট	সেচ যন্ত্রপাতি তৈরি, মৌমাছি চাষ ও মধু উৎপাদন, হিমাগার, ভুট্টা প্রক্রিয়াজাতকরণ, হ্যাচারি স্থাপন, পাথর সংগ্রহ ও পাথর থেকে আরসিসি খুঁটি তৈরি ইত্যাদি।
গাইবান্ধা	দুগ্ধখামার, পাট ও পাটজাত শিল্প, হিমাগার, মৎস খামার, নৌযান, মিষ্টি কুমড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি।
নীলফামারী	আদা প্রক্রিয়াজাতকরণ, সিরামিক শিল্প, পোষাক শিল্প, পর্যটন শিল্প, গুটি ইউরিয়া তৈরি, যান্ত্রিকশিল্প, আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
দিনাজপুর	লিচু ও আম প্রক্রিয়াকরণ, সুগন্ধি চাল প্রক্রিয়াকরণ, চালের ব্রান থেকে ভোজ্য তেল তৈরি, অটোরাইস মিল, চারকোল তৈরি, জৈব সার ও মিশ্র সার তৈরি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
ঠাকুরগাঁও	দুগ্ধখামার, চামড়াজাত পণ্য ফল, শাকসবজি ও ফল প্রক্রিয়াকরণ, জৈব সার ও মিশ্র সার তৈরি, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি।
পঞ্চগড়	চা প্রক্রিয়াকরণ, স্ট্রবেরি চাষ, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, পাথর উত্তোলন, পাথর থেকে বৈদ্যুতিক পিলার ও অবকাঠামোগত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

রংপুর বিভাগের উন্নয়নের সুপারিশমালা

স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ নিয়েছে। রংপুর বিভাগে ৯ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন পেয়েছে, অন্যগুলো প্রস্তাবনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। লক্ষ্যনীয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন উৎপাদন শুরু করেছে তখন এ অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অনুমোদনপর্যায়ে রয়ে গেছে। এ বিশেষ অর্থনেতিক অঞ্চলগুলো দ্রুত প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের তরুণদের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে এ অঞ্চলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, তেমনি কমতো দারিদ্রের হার। অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের জরুরী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা জরুরি।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলের কৃষিখাতেরও উন্নয়ন হতো। রংপুর বিভাগে শিল্পায়নে সহায়তা করতে "রংপুর বিভাগ রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল", "বাজার তথ্য সহায়তা সেন্টার", "ইন্সটিটিউট অব এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগে দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আইটি পার্ক, আইসিটি সহায়তা, হাইটেক পার্ক, ইনকিউবেশন সেন্টার হলে শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাচামাল আমদানির উপর কাস্টমস শুল্ক কম ধরা, শিল্পের প্রাথমিক উৎপাদন পর্যায়ে প্রয়োজন ভ্যাট হার কমানো। শিল্পের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এজন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে পণ্যের উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, মান উন্নয়ন, মার্কেটিং পলিসি নির্ধারণ, বিজ্ঞাপনও প্রচার ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শিল্পায়ন করা প্রয়োজন। সে জন্য দারিদ্র্য পীড়িত ও অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমৃদ্ধ অঞ্চলের চেয়ে উন্নয়ন বাজেটে ২-৩ গুন অধিক বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপন রংপুর বিভাগের জন্য সম্ভাবনাময়। বর্তমানে কৃষিপণ্য মূল্যসংযোজন ছাড়া বিক্রয় করা হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর আম, আনারস, পেপে, পেয়ারা, কাঠাঁল, কলা, নারিকেল, আলু, টমাটো, শীম ইত্যাদি উৎপাদন হয়। এসকল পণ্য জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, চিপস এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। ফুলবাড়িয়া ও দিনাজপুরের কয়লা খনির কয়লা উত্তোলন করে বড় আকারে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হলে এ অঞ্চলে জ্বালানি সমস্যা কিছু সমাধান হতো। বড়পুকুরিয়ায় প্রাপ্ত কঠিন শিলা খনির শিলা ব্যবহার করে সিমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত পাট ও সুতা ব্যবহার করে পাট ও সুতা শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। গার্মেন্টস শিল্প হচ্ছে শ্রম ঘন শিল্প, রংপুর বিভাগের সস্তা শ্রম এক্ষেত্রে সহায়ক। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করা হলে এখানকার দরিদ্র জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়বে। এ অঞ্চলে হস্তশিল্প, সাবান শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে বাণিজ্য করার নানা সুবিধা রয়েছে। স্বল্প সময়ে ও কম খরচে এ অঞ্চল হতে এসব দেশে

পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। এছাড়া এ অঞ্চলে চারটি স্থল বন্দর ১. বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়, ২. বুড়িমারি স্থলবন্দর, লালমনিরহাট, ৩. হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর ও ৪. বিরল স্থলবন্দর, দিনাজপুর ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করা যেতে পারে। সৈয়দপুরে কার্গো বিমান সার্ভিস চালু করে ভারত, নেপাল ও চীনে এ অঞ্চল হতে পণ্য রপ্তানি করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে স্থায়ী ভোগপণ্যের যন্ত্রপাতি ও রপ্তানিযোগ্য হালকা মেশিনারী যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যেতে পারে। সিরামিক শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে চামড়া শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হলে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক কারখানা যেমন বিদ্যুৎ, সার কারখানা স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী শিল্প যেমন জামদানি শিল্প, নকশীকাথাঁ, শতরঞ্জি, শীতলপাটি, কার্পেট, চটের ব্যাগ ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে বিনিয়োগ সহায়তা দিতে আলাদা শিল্পনীতি, করনীতি, ভ্যাট ও শুল্কনীতি ও ঋণনীতি ঘোষণা করতে হবে। রংপুর অঞ্চলের শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ ও আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ অঞ্চলের শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের জন্য আলাদা শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে আর পুরুষরা ঢাকা, চট্টগ্রাম সিলেটসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় রিকসা চালক ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেত। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে গার্মেন্টস সেক্টরকে রংপুর বিভাগে স্থানান্তর করার ব্যাপারে আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর বিভাগের প্রবাসীর সংখ্যা, রেমিট্যান্স প্রেরণের পরিমাণ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম। যোগাযোগ সুযোগ-সুবিধার অভাব, সচেতনতার অভাব ও তথ্য না জানার কারণে দিন দিন এ অঞ্চলের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। রংপুর বিভাগের অগণিত কর্মহীন মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি জেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

এ অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। উদ্যেক্তা হতে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। স্বল্প খরচে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে। কোনো অঞ্চল আঞ্চলিক বৈষম্যের স্বীকার হলে সে বৈষম্য কমার জন্য নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পশ্চাৎপদ এলাকায় বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সহায়ক শিল্পনীতি করা প্রয়োজন। রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অন্য অঞ্চলের চেয়ে পিছিয়ে আছে এজন্য এখানে শিল্পায়নের পরিমান বাড়াতে হবে। যে সকল এলাকায় বেশী শিল্পায়ন হয়েছে সেখান হতে কম শিল্পায়ন এলাকায় শিল্প পুনঃবন্টন ও স্থানান্তর করা যেতে পারে। যেমন ঢাকা শহর থেকে তৈরি পোশাক শিল্প অন্য জায়গায় স্থাপন হতে পারে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নগরায়নের হার, পানি সরবরাহ ও গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পায়নকে প্রভাবিত করে এ জন্য কম শিল্পায়িত এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে যাতে নতুন শিল্প উদ্যোক্তা আকৃষ্ট হয়। এ অঞ্চলে বেসরকারি খাত বিনিয়োগে উৎসাহিত না হলে প্রথম দিকে সরকারি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পায়নে সহায়তা দেওয়ার জন্য স্বল্প খরচে যন্ত্রপাতি আমদানি সুবিধা, স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। রংপুর বিভাগের ব্যবসায়ীদের ইনসেনটিভ প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা যেমন ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রেয়াত গ্রহণের আওতা বৃদ্ধি করে পরিবহন সেবার ৫ শতাংশ রেয়াতযোগ্য করা যেতে পারে। দেশে ব্যবহার যোগ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কাচাঁমাল হিসাবে ব্যবহার হবে—এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে এ অঞ্চলের কৃষকরা লাভবান হবে।

ইন্টারনেট খরচ কমানোর পাশাপাশি এর মান নিশ্চিত করা জরুরি। রংপুর বিভাগে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে। যতদ্রুত সম্ভব রংপুওে ড. ওয়াজেদ মিয়া হাইটেক পার্ক চালু করতে হবে। গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। কৃষিখাতে স্টার্ট আপ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। সকল বয়সের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। দরিদ্রদের জন্য বাসস্থান, বিদ্যুৎ সংযোগ, রান্নাঘরে রান্নার গ্যাস ও নলের মাধ্যমে পানীয় জল পৌছাঁনোর ব্যবস্থা করতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এই অঞ্চলের জেলাগুলোতে কর্মমূখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আয় বৈষম্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদী জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামনের দিনগুলোতে কৃষি গুরুত্বের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করবে। কৃষির ঝুঁকি হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এ অঞ্চলে আয় সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা পালন করবে। কৃষির অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিনিয়োগ এক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে সেচের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। ত াছাড়া অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।

সরাসরি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এর ফলে এই বিভাগের মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠলে একদিকে যেমন পুরুষের সাথে নারীরাও গৃহস্থালির কাজকর্ম সম্পাদন করার পাশাপাশি স্থানীয় কলকারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে সংসারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারবে, অন্যদিকে কলকারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে নারীদের একদিকে যেমন কাজের জন্য ঢাকা বা অন্য কোনো শহরে স্থানান্তরিত হতে হবে না, অন্যদিকে নারীরা সরাসরি অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হলে তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধি ও বিদ্যমান অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করবার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অংশীদারীত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বৈকালিক বা সান্ধ্যকালীন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকশিত হয়। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশে বিশেষ প্রনোদনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। শিল্পে ও পরিবহনে জ্বালানি সমস্যা নিরসনে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা বাংলাদেশে কৃষিখাতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। বিপনন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কৃষির বৈচিত্র্যকরণ জরুরী। এছাড়াও বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সেচের ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।ও কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

বিভিন্ন বিভাগে সরকারী বরাদ্দের বৈষম্য দূর করতে হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, দলিত সম্প্রদায়, পরিচ্ছন্নকর্মী, জেলে, বেদেসহ বিভিন্ন স্বল্প আয়ের পেশার এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবিক উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি। দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের জন্য চলমান বাজেটে 'নিজ নামে' প্রচলিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হোক। অনগ্রসর অঞ্চল নামে কোনো বরাদ্দের উল্লেখ থাকে না। অথচ বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশে অনেক অনগ্রসর অঞ্চল আছে; এমনকি বৈষম্যের নিরিখে অনগ্রসর বিভাগও আছে। আমরা মনে করি, অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য 'নিজ নামে' ব্যয়-বরাদ্দের রীতি চালু করা প্রয়োজন। এ জন্য রংপুর বিভাগের জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পের চলার পথ মসৃণ করার জন্য আমদানি পর্যায়ে শিল্পের কাঁচামালের উপর অগ্রীম আয়কর ৩ শতাংশ ও আগাম ভ্যাট দিতে হয় ৩ শতাংশ অগ্রীম আয়কর ও আগাম ভ্যাট প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হলো। রপ্তানির ক্ষেত্রে ০.৫ শতাংশ উৎসে কর দিতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনে উৎস কর কমিয়ে ০.২৫ করার সুপারিশ করা হলো।মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে ১ শতাংশ শুল্ক আরোপ থাকলেও যন্ত্রাংশ আমদানিতে ৬০-৭০ শতাংশ শুল্ক কর দিতে হয়। এটি কমিয়ে ৪০ শতাংশ করার সুপারিশ করা হলো। বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন অনুযায়ী প্রতি মাসের ১ তারিখ হতে ১৫ তারিখের মধ্যে মূল্যসংযোজন করের রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হযেছে। অন্যথায় ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান থাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা ভ্যাট প্রদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তাই ৬ মাস অন্তর মূল্য সংযোজন করের রিটার্ন দাখিলের বিধান জারিপূর্বক ব্যবসায়ীদের রিটার্ন দাখিলের পথ আরো সহজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ছাড়া রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতার জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা জরিমানার বিধান করার প্রস্তাব করছি। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিবেশক পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর এর হার ৫ শতাংশ। অথচ দেশে বিদ্যমান প্রথম সারির কোম্পানী (বহুজাতিক কোম্পানী দেশীয়) পরিবেশকদেরকে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ কমিশন প্রদান করে থাকে। একজন পরিবেশককে এই ৪ শতাংশ লাভের মধ্যে তার ব্যবসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহপূর্বক লাভের অংক হিসাব করতে হয়। পরিবেশক কোম্পানীর নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিতরণ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করার ক্ষমতা পরিবেশকদের নেই। তাই পরিবেশকদের পক্ষে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব । তাই আমরা উৎস হতে মূল্যসংযোজন কর আদায়ের আহ্বান জানাচ্ছি। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশকরা ভ্যাটের বিড়ম্বনায় থেকে রেহাই পাবে বলে আমরা আমরা মনে করি। তাই এ ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। কোনো কোনো পণ্যে একাধিকবার মূল্য সংযোজন কর ভোক্তাদের/ব্যবসায়ীদের প্রদান করতে হয়। খুচরা পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা আমদানিকারক ও উৎপাদক পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ধার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। তাই আমরা এ ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

টার্নওভার কর ৩ শতাংশ বিদ্যমান থাকলে প্রান্তিক করদাতাদের ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ প্রতিটি পণ্যের একক প্রতি মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রান্তিক করদাতাদেরও ব্যবসায়ীক বাৎসরিক টার্ণওভারে পড়তে হবে। ফলে প্রান্তিক করদাতাদের লাভ-ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী লাভ না হলে ক্ষতি দাঁড়ালেও টার্নওভার অনুযায়ী ওই প্রান্তিক করদাতার ন্যূনতম কর দায় হচ্ছে ২-২.৫০ লক্ষ টাকা তাতে প্রান্তিক করদাতাগণ ভীষণ অসুবিধায় পড়ছে। করদাতা তার ব্যবসার পুঁজি ভেঙ্গে সরকারকে কর প্রদানে বাধ্য হচ্ছেন। তাই এটি কমিয়ে ২ শতাংশ করা উচিত।

প্রদেয় করের ওপর সুদ আরোপ করা ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে বা উক্ত তারিখের পূর্বে, কমিশনারের নিকট প্রদেয় কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তা হলে তাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হতে পরিশোধের দিন পর্যন্ত প্রদেয় করের পরিমাণের ওপর মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা নানা কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় কর পরিশোধে অক্ষম হয়। এর ওপর যদি করের ওপর সুদ এবং এ সুদ যদি অর্থদণ্ড ও জরিমানার অতিরিক্ত হয়, তাহলে ব্যবসায়ীদের জন্য তা পরিশোধ কষ্টকর। এটি বাতিল করার সুপারিশ করা হলো।

রংপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাবুরহাট, ইসমলামপুর, কালীগঞ্জ, কুষ্টিয়া, শাহজাদপুর ও করোটিয়াসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি মালামাল সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু সরবরাহকৃত মালামাল পথিমধ্যে আটকে ভ্যাটের চালান দাবি করা হয়। কিন্তু কাপড় সরবরাহের সময় মোকামগুলো ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের চালান প্রদান করে না। এর ফলে প্রতিনিয়তই কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কর্মকর্তাদের হাতে রংপুরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হতে হয়। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিড়ি শিল্প রক্ষায় সিগারেটের চতুর্থ স্লাব বাতিল করার প্রস্তাব করা হলো। বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থ বিবেচনা করে বিড়িতে অ-অরোপিত শুল্ক হার কমানোর প্রস্তাব দেয়া হলো। বিড়ির ওপর অর্পিত ১০ শতাংশ অগ্রীম আয়কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হলো। সরেজমিনে পরিদর্শন ব্যতিরেকে বিড়ি কারখানার লাইসেন্স না দেওয়া, কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে আইনি প্রক্রিয়ায় নকল বিড়ি বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক ও মালিকদের সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব করা হলো।

নারী উদ্যোক্তাদের সেবা খাতের ব্যবসায় (বিশেষ করে বুটিক, বিউটি পার্লার, ক্যাটারিং, খাবার দোকান ও ব্যবসা) ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়া হলো। এছাড়া নতুন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরুর প্রথম তিন বছরের ট্যাক্স ও ভ্যাট মওকুফ করতে হবে।

দিন দিন পঞ্চগড়ে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট চা উৎপাদনের বড় একটা অংশ পঞ্চগড় পূরণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে চায়ের নিলাম বাজার হওয়ায় পরিবহন খরচ ও সময় খরচ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তাই পঞ্চগড়ে চায়ের একটি নিলাম বাজার স্থাপন করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগের দরিদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্ততঃ ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পূজিঁ সম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যাংকে “ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সেল” গঠন করতে হবে। দারিদ্র্যপীড়িত ভৌগোলিক এলাকা (চর-বিল) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ (বন্যা, নদীভাঙ্গন) এলাকা ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদহীন স্বল্পমেয়াদি (৬ মাস) ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। কৃষকেরা যাতে পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান, সে জন্য কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক কৃষি পণ্য উপকরণ, পণ্য সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ (প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ) নির্মাণ করতে হবে।

কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়ে ১৬টি নদ-নদী প্রবাহিত, যার পলি জমে তলদেশ ভরাট হয়ে ওঠায় বর্ষা মৌসুমে পানি ধারণ ক্ষমতা থাকে না। ফলে প্রতিবছর বন্যায় নদীপাড়ের মানুষের অবস্থা বেগতিক হয়ে পড়ে। কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে প্রতিবছর ধরলার তীব্র ভাঙ্গনের শিকার হয়ে আবাদি জমি ও ভিটাবাড়ি হারিয়ে অনেকেই গৃহহীন ও ভূমিহীনে পরিণত হয়। বিশেষ করে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়ন ধরলার গ্রাসের মুখে। নদীটি সৃষ্টি করেছে শুধু

চর আর চর। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় একটি চ্যালেঞ্জ এটি। তাই ফুলবাড়িসহ জেলাবাসীকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করতে হলে নদনদীগুলো খনন করা জরুরী। খননের ফলে নদনদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পরিত্রান পাবে। অন্যদিকে নদনদীর দুই উপকুল ভরাট করা হলে হাজার হাজার হেক্টর পরিত্যক্ত চরাঞ্চলের জমিগুলো আবাদি জমিতে পরিণত হবে। এতে কুড়িগ্রাম জেলা কৃষিসহ সার্বিক উন্নয়নে দেশের জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া এ অঞ্চলে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি 'কম্প্রিহেনসিভ ইনভেস্টমেন্ট পলিসি' তৈরি করার প্রস্তাব করছি। বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রংপুরে একটি রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা একান্ত জরুরি। কেননা বিবিআইএন কানেক্টিভিটি পুরোপুরি চালু হলে এ অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে। শিল্পের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ইতিমধ্যে 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তাই আমরা 'বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

রংপুর বিভাগের জেলাগুলো কেন এত দরিদ্র, তার কারণ হিসাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে "এসব জেলা মূলত কৃষি খাত দ্বারা পরিচালিত, ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেশি, উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত। বিশেষ করে অকৃষি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা এসব জেলাগুলোতে কম দরিদ্র জেলাগুলোর তুলনায় কম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ করে বন্যা ও নদীভাঙনে অধিক কষ্ট পায়। উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসমূহ কম রয়েছে বা দুর্বল। উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও আয় সরবরাহে দুর্বল অভিগম্যতা রয়েছে। ন্যূনতম দরিদ্র জেলাগুলোর তুলনায় দুর্বলতর শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থা রয়েছে"—এর প্রতিকার প্রয়োজন। ভিশন-২০৪১ এ দারিদ্র্য নিরসনের কর্মকৌশল হিসাবে বলা হয়েছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির অব্যাহত গতি অর্জন, উৎপাদন ভিত্তির কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্রমুখী করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব পুঁজির ভিত্তি শক্তিশালীকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নে অভিগম্যতার উন্নতি বিধান, অভিবাসী শ্রমবাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বর্ধনশীল অভিগম্যতা, সুষম নগরায়ণ, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, পরিবেশ পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলাগুলোর ক্ষতি প্রবণতা কমিয়ে আনা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর দারিদ্র্যমুখিতার দ্রুত উন্নতি সাধন। তাই রংপুর অঞ্চলকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে প্রতি বছরের বাজেটে এসব কর্মকৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে।

রংপুর বিভাগের "দারিদ্র্যের তথ্যভান্ডার" গড়ে তোলা জরুরি। দারিদ্রের এই তথ্যভান্ডারে বিভিন্ন ধরনভিত্তিক দরিদ্র যেমন ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি দরিদ্র মানুষের নাম ঠিকানাসহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য খানার (household) সংখ্যার ত্রুটিমুক্ত তালিকা করতে হবে। বয়স্ক, বিধবা, অক্ষম, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন কৃষক, বস্তিবাসী, চরের মানুষ, ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে আমরা মনে করি। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়েছি আমরা। উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে হলে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ জন্য শিক্ষাখাতে জিডিপির

শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় নিয়ে অতি জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষানীতিসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। অর্থনীতিতে নারীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াদি সুস্পষ্ট উল্লেখপূর্বক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় একীভূত করতে হবে। জিডিপিতে গৃহস্থালি ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

রংপুর মহানগরীর সিও বাজার কেল্লাব্দ এলাকায় ১৯৬৭ সালে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের জন্য ২০ দশমিক ৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প কারখানার জন্য ৮২টি প্লট নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ৮২টি প্লট ২৭টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লট না থাকার কারণে রংপুরের উদ্যোক্তারা নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা স্থাপন করতে পারছেন না। ২০০5 সালে রংপুর মহানগরীর দমদমা এলাকায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশে দ্বিতীয় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেও অদ্যাবধি তার সুফল পায়নি রংপুরের শিল্প উদ্যোক্তারা। তাই বিসিকের উদ্যোগে নতুন করে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীদা ইউনিয়নের ইচলী ও শংকরদহ মৌজায় বিসিক মাল্টিসেক্টোরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক দ্রুত স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামো ছাড়া কোনো অঞ্চলের উন্নয়ন হতে পারে না, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হতে পারে না এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে না। রংপুর বিভাগে গ্যাস নেই, জ্বালানি নেই, অবকাঠামো নেই, আন্তর্জাতিকমানের বিমানবন্দর নেই, স্থল বন্দরের সুবিধা নেই, তেমন কোনো শিল্পকলকারখানা নেই এবং তদুপরি তা সুদূরপরাহত। নেই কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমতা, বিদ্যুতের প্রাপ্যতা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট, প্রয়োজনীয় ব্রীজ-কালভার্ট ও স্টেডিয়াম, রয়েছে বছরের পর বছর অসমাপ্ত প্রকল্প ও দীর্ঘসূত্রিতা ও অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে স্থবিরতা। এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রতিবছর কর্মস্রোতে আসা ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫০ শতাংশই নারী। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীরা যদি কর্মক্ষেত্র এবং নিজ প্রকল্প-উদ্যোগ বাস্তবায়নের সমসুযোগ না পায়, তাহলে দেশ কখনোই সমন্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারবে না। আর তাই দেশের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে আরও উৎপাদনশীল করতে হবে। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পের এতটা সফল হওয়ার পেছনে নারীদের ভূমিকাই মুখ্য। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সঠিক খাতে বিনিয়োগ করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তা পরিচালনা করতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা আজ দৃশ্যমান। সে জন্য প্রতি বছর কর্মস্রোতে আসা নারীদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসা উন্নয়ন সাপোর্ট, আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং সর্বোপরি নারীবান্ধব অর্থায়ন একান্ত প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দেরর ন্যায় রংপুরে বিভাগে অবস্থিত বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ শুল্ক বন্দরে রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া রপ্তানি উৎসাহিত ও সহজ করার জন্য ডকুমেন্টের সংখ্যা কমানো, সিঙ্গেল উইন্ডো সার্ভিস, অন-লাইন ডকুমেন্ট জমা ও নন-ট্যারিফ বাধা দূর করা একান্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় অর্থের অভাবে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতের কাজে আগ্রহী হয় না। প্রক্রিয়াজাতের কাজে কাঁচামাল কিনতে অর্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হলে উদ্যোক্তারা কিস্তিতে সহজেই প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করে ব্যাংকঋণ পরিশোধ করতে

পারবে। ফলে উদ্যোক্তারা ধীরে ধীরে তার ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করতে পারবে, যা তাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করবে, দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে ও পরিবারের সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা প্রদানে কোনো ব্যাংকই ঋণ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে না। অথচ দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সংখ্যাই অনেক বেশি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদেরকে স্থায়ীভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে টিকিয়ে রাখা গেলে উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থান বাড়বে, যা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। রংপুর বিভাগে প্রাকৃতিক গ্যাস, যোগাযোগ, অবকাঠামোসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে রংপুর বিভাগের শিল্পগুলো দিন দিন রুগ্ন শিল্পে পরিণত হচ্ছে। ব্যবসায়িক মূলধন হারিয়ে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়েছে সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডাউন পেমেন্টের সময়সীমা বৃদ্ধিকরণসহ স্থান বিশেষে ঋণ মওকুফের আবেদন জানাচ্ছি।

রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বর্তমানে ব্যাপক আকারে ভুট্টা চাষ হচ্ছে এবং এর পরিধি আরও ব্যাপক আকারে বিস্তৃত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এ অঞ্চলে ভুট্টা থেকে শিশু খাদ্য, গোখাদ্য ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তৈরিসংক্রান্ত কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যাতে প্রকৃত ভুট্টা চাষিরা অতি স্বল্পসুদে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারেন, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর বিভাগে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু আলু রপ্তানিতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের তুলনায় নগদ সহায়তার পরিমাণ কম থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ আলুর বাজার ধরতে পারছে না। তাই নগদ সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থাকে সহজতর করা প্রয়েনাজন বলে মনে করি। তাই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

রংপুর বিভাগে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিশেষ করে বেশ কিছু হিমাগার শিল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রংপুরে প্রায় ৪০টি (২টি বন্ধ) হিমাগারে প্রায় (৪৩৫০১৭ মে. টন) ৫১ লক্ষ বস্তা আলু সংরক্ষণ করা হয়। আলু চাষ ও আলু ব্যবসার সাথে কৃষকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। আলু নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়। ফলে অর্থকরী ফসল হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই হিমাগার শিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছি। এ অঞ্চলের কৃষিপণ্য ও কৃষিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় বহুমুখীকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি। এমতাবস্থায় নামমাত্র সুদে রিফাইন্যান্স স্কিমের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহ ও সুরক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। সর্বোপরি বিপণন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি বলে আমরা মনে করি। পেট্রোডলারের মতো ফিস ডলার অর্জনের জন্য আঞ্চলিকভাবে মৎস চাষসহ অন্যান্য ফল-ফলাদির ক্ষেত্রেও রিফাইন্যান্স কার্যক্রম গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর বিভাগ মূলত কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সংকট। তাই এ অঞ্চলের উৎপাদিত কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির লক্ষ্যে “কৃষিপণ্য রপ্তানি সেল” স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগের ব্যাংকগুলোতে জনগণের জমাকৃত টাকা আন্তঃশাখা লেনদেনের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো বিভিন্ন এলাকায় তহবিল স্থানান্তর হওয়ায় আমরা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছি। তাই প্রতিটি ব্যাংক শাখায় জনগণের জমাকৃত টাকার একটি নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত স্ব স্ব অঞ্চলে বিনিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। রংপুর বিভাগ থেকে প্রবাসী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের

হার অত্যন্ত অপ্রতুল। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে বেশি বেশি করে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে এ অঞ্চলের জন্য আলাদা নীতি অনুসরণ করে সহজ ও সরল শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। রংপুর অঞ্চলের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এতে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ এ শিল্পে যোগদানের সুযোগ পাবে। দেশ বিপুল পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারবে।

খেলাপি ঋণ দেশের ব্যাংকিং খাতকে অক্টোপাসের মতো গিলে খাচ্ছে। খেলাপি ঋণ ব্যাংকের ঋণ বিতরণের লাগাম টেনে ধরে। যেসব খাতে আদায় কম, ব্যাংক ওইসব খাতে বারবার বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী হয়। পাশাপাশি যেসব শাখার খেলাপি ঋণ বেশি, ওইসব শাখার নতুন কোনো ঋণ অনুমোদনের বিপক্ষে প্রধান কার্যালয়কে শক্ত অবস্থান নিতেও দেখা যাচ্ছে। ফলে এসএমই উদ্যোক্তারা ঋণ মঞ্জুর থেকে বঞ্চিত হয়। এ ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কোনো এসএমই ঋণ খেলাপি হলে ঋণ মঞ্জুরিকালীন ম্যানেজারের কোনো অনিয়ম বা গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। অন্যদিকে কোনো ম্যানেজারের ব্যাংক সুইচকালেও তার আমলে দেওয়া কোনো ঋণ খেলাপি থাকলে ম্যানেজারের ব্যাংক সুইচে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়, মানসিকভাবে চাপে রাখা হয়, রিলিজ দিতে বিলম্ব করা হয়, রিলিজ নেওয়ার শর্ত হিসেবে অনিয়মিত ঋণগুলোকে নিয়মিত করতে বলা হয়। অনেক সময় ম্যানেজারদের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটও (সার্ভিস বেনিফিট) আটকে দেওয়া কিংবা কর্তন করা হয়। এসব বিষয় ম্যানেজারদের এসএমই ঋণ প্রদানে অনাগ্রহী করে তোলে। অন্যদিকে অনেক ম্যানেজার ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে ঝুঁকি ও দায় এড়িয়ে চলার জন্য ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে চান কিংবা 'ধীরে চলো' নীতি অনুসরণ করেন। ফলে ওই শাখার এসএমই ঋণের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি হয় না। শাখাপর্যায়ে ম্যানেজারদের বিজনেস ডেলিগেশন না থাকাটাও এসএমই ঋণ সম্প্রসারণের অন্তরায়। ম্যানেজারদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শাখাপর্যায়ে অনেক ম্যানেজারের এসএমই ঋণ দেয়ার কোনো ডেলিগেশন নেই বা থাকলেও তা খুবই সীমিত। ফলে ওইসব শাখার ১ লাখ টাকার এসএমই ঋণ প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের সিআরএম ডিভিশনে পাঠাতে হয়। ফলে ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হয়ে যায়। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। দীর্ঘ ঋণ প্রস্তাব ফরম্যাট কিংবা তথ্যের বাহুল্য বা একই তথ্য বারবার দিতে গিয়ে, যেমন ঋণগ্রহীতার আবেদনের একই তথ্য আবারো ঋণ প্রস্তাবে ও অফিস নোটে উল্লেখ করতে গিয়ে ঋণ প্রস্তাবটিকে দীর্ঘ করে ফেলা হয়। ফলে প্রস্তাব তৈরিতে কালক্ষেপণ হয়। ঋণ প্রস্তাবের তথ্যের বাহুল্য না ঘটিয়ে এবং অযাচিত তথ্য না দিয়ে মৌলিক তথ্যাদি দিয়ে তা তৈরি করলে অনেক সময় বাঁচবে এবং দ্রুততম সময়ে ঋণ মঞ্জুর করা সম্ভব হবে । উচ্চমাত্রার সুদহারের কারণে অনেক ব্যবসায়ী এসএমই ঋণ গ্রহণ করে প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক সাফল্য পান না। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদের চক্রবৃদ্ধি হিসাব করতে বললেও অনেক ব্যাংক এখনো তা মাসিক ভিত্তিতে করে। ফলে কার্যকর সুদহার ঘোষিত হারের চেয়ে আরো বেশি হয়ে যায়। অন্যদিকে সুদ বহির্ভূত খরচ যেমন-ঋণ আবেদন ফি, প্রক্রিয়াকরণ ফি, ডকুমেন্টেশন ফি, মনিটরিং ফি, আইনজীবীর ফি, সার্ভেয়ার/জামানত মূল্যায়নকারীর ফি, অডিট কোম্পানির ফি, রেটিং ফি, স্ট্যাম্প খরচ, দলিল রেজিস্ট্রেশন খরচ, ইন্স্যুরেন্স খরচ, রিস্ক ফান্ড, কমিটমেন্ট চার্জ, আর্লি সেটলমেন্ট ফি, সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট, বার্ষিক এক্সাইজ ডিউটি ইত্যাদি ঋণের সুদের হারকে আরো ২-৩ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

টাইটেল ডিডের (দলিলের) সত্যায়িত কপি গ্রহণ না করা, খতিয়ান বা বায়া দলিলের খসড়া কপি-ফটোকপি গ্রহণ না করা, সিএস খতিয়ান থেকে মালিকানার ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা, কোনো বায়া দলিলের গ্যাপ অ্যালাউ না করা, সরকারি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সনদ নেয়া ইত্যাদি দালিলিক কড়াকড়ি উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণ দুশ্চিন্তায় ফেলে এবং উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করে। এর অবসান প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেস করাটা অনেক ব্যাংকারই পারেন না। অনেক ব্যাংকারের ট্রেডিং ব্যবসায় ফিন্যান্স করার অভিজ্ঞতা থাকলেও উৎপাদন খাতে ঋণ দেয়ার অভিজ্ঞতা নেই। ফলে এসব খাতের ঋণগ্রহীতাকে অনভিজ্ঞ বা অদক্ষ ব্যাংকারের কারণে বিলম্বিত ঋণ সুবিধা কিংবা প্রয়োজনের কম ঋণ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।

ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণার্থে দলিলাদি সম্পাদনে যথাসম্ভব স্বল্প আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করার জন্য এবং পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের নীতি গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত বা স্বল্প বিরতিতে ক্রেডিট কমিটি কিংবা এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং না হওয়ার কারণে যথাসময়ে ঋণ মঞ্জুর ও অর্থ ছাড় করা সম্ভব হয় না। এসব কারণে বড় ঋণগুলো মঞ্জুর হতে ক্ষেত্রবিশেষে তিন থেকে চার মাস লেগে যায়। ঋণ মঞ্জুর হতে হতে সিআইবির রিপোর্টের মেয়াদ পর্যন্ত চলে যায়। তাই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে অনেক যোগ্য উদ্যোক্তাকেও ঋণ দেওয়ার আশ্বাস দেয়া সম্ভব হয় না। একটি ঋণ প্রস্তাব যথাসময়ে প্রস্তত করা এবং প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয় না। ঠিক একইভাবে প্রধান কার্যালয়ও লোকবল সংকটের কারণে প্রস্তাবটি যথাসময়ে রিভিউ করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, শাখা থেকে ঋণ প্রস্তাব পাঠানোর এক থেকে দেড় মাস পর প্রধান কার্যালয় থেকে ফার্স্ট কোয়েরি আসে। কোয়েরি মিট-আপ করতে শাখার আরো ৭ থেকে ১০ দিন চলে যায়। ফলে ঋণটি প্রধান কার্যালয় থেকে ছাড় পেতে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস চলে যায়। লোকবলের অভাবে ঋণ মঞ্জুরি পরবর্তীতে যথাসময়ে ডকুমেন্টেশন, অর্থছাড়, মনিটরিং, নবায়ন ও আদায় প্রক্রিয়াও বিঘ্নিত হয়। এ জন্য লোকবল বৃদ্ধি প্রয়োজন। শাখা থেকে অসম্পূর্ণ ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযোজন না করে কিংবা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না দিয়েই দায়সারা গোছের ঋণ প্রস্তাব পাঠানোর কারণে প্রধান কার্যালয় এসব ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারে না। আর অনুমোদন করলেও এসব প্রস্তাবের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কোয়েরি মিট-আপ করতে অনেক কালক্ষেপণ হয়ে যায়। এর অবসান দরকার। ঋণ মঞ্জুর হলেই ঋণ গ্রহীতা টাকা পেয়ে যান না। তাকে যথাযথ ডকুমেন্টেশন সম্পাদন করেই ঋণের অর্থ ছাড় করাতে হয়। কিন্তু বন্ধকি ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিবার ঋণসীমা বাড়লেই বন্ধকি দলিল সম্পাদন এসএমই ঋণের সম্প্রসারণের অন্তরায়। অন্যদিকে কিছু ব্যতিক্রমী ঋণ ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে গিয়ে ছোট শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তারা হিমশিম খান। যেমন- টেকওভার, সিন্ডিকেশন ইত্যাদি ঋণের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নধর্মী ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হয়, যা শাখাপর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা অনভিজ্ঞতার কারণে প্রস্তুত করতে পারেন না। অন্যদিকে শাখার আইনজীবীরাও ব্যতিক্রমী এসব দলিল কিংবা অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত করতে অক্ষমতা বা অদক্ষতা প্রকাশ করেন এবং উল্টো ব্যাংকারেরই সহায়তা চান। প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশনও নমুনা ডকুমেন্ট সরবরাহ কিংবা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না দিতে পারার কারণে ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। এ বিলম্বের কারণ দূর করা প্রয়োজন। গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ চাওয়াটা একটা সংস্কৃতি হয়ে যাওয়ার কারণে এবং শাখা পর্যায়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্টে ভুল বা অদক্ষতার কারণে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ঋণসীমার চেয়ে কম ঋণ মঞ্জুর করার প্রবণতা লক্ষ

করা যায়। এতে যোগ্য উদ্যোক্তারা অনেক সময় প্রাপ্য ঋণসীমা পান না। প্রাপ্য ঋণসীমা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক ও ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের মন জয় করতে অনেক সময় প্রস্তাবিত ঋণগ্রহীতাকে অর্থ ঢালতে হয়। নিয়মের কড়াকড়ি, কাগজপত্রের বাধ্যবাধকতা, উচ্চসুদের পাশাপাশি এসব সুদবহির্ভূত অদৃশ্য খরচ এসএমই গ্রাহকদের কস্ট অব ফান্ড বাড়িয়ে দেয় এবং ঋণগ্রহণে অনাগ্রহী করে তোলে। সুদবহির্ভুত অদৃশ্য খরচ বাদ দিতে হবে।

রংপুরের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ খেলাপি বা রুগ্ন শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর প্রকৃত কারণ হিসেবে শুধু ব্যবসায়ীদের ব্যর্থতা নাকি অ্যাগ্রেসিভ ব্যাংকিংয়েরও ভূমিকা রয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং অ্যাগ্রেসিভ ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্যাংক ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সরাসরি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্ককে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান, অর্থ ঋণ আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে ব্যবসায়ীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানসহ এক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক নীতিমালা প্রবর্তন, ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে ও ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ স্কিমের আওতায় মনিটরিং সেলের তত্ত্বাবধানে শর্তসাপেক্ষে নতুন করে ঋণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। ব্যবসায়িক বিভিন্ন লাইসেন্সের জটিলতাসহ কর, ভ্যাট, ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, পণ্য পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে পণ্য উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় রংপুর বিভাগের ব্যবসায়ীরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাথে পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না। তাই রংপুর অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা ঋণনীতি অবলম্বন করা একান্ত দরকার।

শিল্পে বিনিয়োগ খাতে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে মেয়াদি বা প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংকোচন নীতি পরিহারকরণের আহ্বান জানাচ্ছি। এ সংকোচন নীতির ফলে ব্যাংকগুলোতে যে তারল্যের সৃষ্টি হয় তা অলস অর্থ হিসেবে ব্যাংকে পরে থাকে বলে আমরা মনে করি। তাই শিল্পে বিনিয়োগ খাতে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সংকোচন নীতি পরিহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বর্তমানে রংপুর অঞ্চলের ব্যাংকগুলো ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে অধিক আগ্রহী। কিন্তু আয়বর্ধক কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ট্রেডিং এ বিনিয়োগের পাশাপাশি উৎপাদনমূখী খাতেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি। তাই ট্রেডিং এর পাশাপাশি উৎপাদনমূখি খাতেও অধিক হারে ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বৈদেশিক বাণিজ্যে রংপুর বিভাগ দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করতে রংপুর বিভাগের স্থলবন্দরগুলোকে যুগোপযোগী ও আধুনিক স্থল বন্দরে রুপান্তরের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্যাংক ঋণের আবেদন থেকে শুরু করে দীর্ঘ ও জটিল ডকুমেন্টেশন প্রসিডিওর জটিলতার কারণে তা অতিক্রম করা ছোট ছোট উদ্যোক্তাগণের জন্য দুঃসাধ্য। তাই উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংকে One Stop Service এর ন্যায় Small Medium Enterprise (SME) Cell গড়ে তোলা হলেও SME খাতের উদ্যোক্তাগণ আশানুরূপ ও কাঙ্খিত হারে ঋণ সহায়তা ও ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছেন না । ফলে যে উদ্দেশ্যে সকল ব্যাংকে SME Cell গড়ে তোলা হয়েছে তার সুযোগ-সুবিধা থেকে SME উদ্যোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। তাই এ ব্যাপারে জোরালো মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বন্ধকি ছাড়া ব্যবসায়িক সুনাম ও গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৫ শতাংশ সরল সুদ হারে সকল সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প ঋণ ও চলতি ঋণ প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ

গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। অনেক সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক চলতি ঋণ প্রদান করলেও প্রকল্প ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে, যা শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে চলতি ঋণের পাশাপশি প্রকল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর অনীহা দূর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দেশের এ অঞ্চলে পৌঁছাতে ২০-২৫ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। ফলে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল এ অঞ্চলে এবং এ অঞ্চল হতে তৈরিকৃত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার জন্য যে সময় ব্যয় হয়, তাতে কোনো বিনিয়োগকারী এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হন না। দ্রুত পণ্য পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে শুধু বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম পৌঁছনো সম্ভব নয়। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের পরিবহন সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। বিশেষ করে ঈদের সময় জনগণের ঢাকা হতে রংপুর-দিনাজপুর পৌঁছাতে ১৫-২০ ঘণ্টার মতো সময় লাগে, যা বর্তমান আধুনিক যুগে কল্পনা করাও কষ্টকর। হাইওয়ে ব্যবহার করেও পণ্য পরিবহনে এত বেশি সময় লাগার ফলে এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হয় না। এ সমস্যা সমাধান প্রয়োজন।

রংপুর কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর না থাকায় বিমান ব্যবহার করে বিদেশে রফতানী পণ্য পাঠানোর কোনো সুযোগ না থাকায় বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে না। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর ও কার্গো সার্ভিস চালু করা প্রয়োজন। এ অঞ্চলের নারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা দেয়া হলেও নানান জটিলতার কারণে বাস্তবে এ থেকে তেমন কোনো সুবিধাই তারা বের করে নিতে পারছেন না। জমির স্বল্পতা ও অধিক মূল্য, ট্রেড লাইসেন্সসহ ব্যবসায় শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অধিক অর্থব্যয় এবং বিভিন্ন সংস্থার হয়রানি রংপুর অঞ্চলে উদ্যোক্তা তৈরিতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এর অবসান প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ, ট্যাক্স হলিডের মেয়াদ বৃদ্ধি, বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া, বিনিয়োগ নিবন্ধনে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি, উচ্চ কর হার ও ভ্যাট হার, অবকাঠামোগত ও স্থলবন্দরের সমস্যা ইত্যাদি। এ কারণে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিনিয়োগ করছেন না রংপুর অঞ্চলের উদ্যোক্তারা। ফলে ঘটছে না শিল্পায়ন। সৃষ্টি হচ্ছে না নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ। এর প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক অর্থনীতিতে। এ সকল সমস্যা দূর করতে হবে। উচ্চ সুদ দিয়ে কখনও কোনো দেশে শিল্পায়ন হয়নি, বাংলাদেশেও হবে না। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে রাষ্ট্রের সহযোগিতা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন সহায়ক শিল্পনীতি। শিল্পে বিনিয়োগ না করে রংপুর অঞ্চলের উদ্যোক্তারা ট্রেডিং ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন। তাই এখানে তেমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। তাই ট্রেডিং খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রংপুর অঞ্চলে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে উদ্যোক্তাদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হবে। তাহলে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে এ অঞ্চলের অনেক মানুষের কর্মস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া উৎপাদন ও বিপণন এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। আর এ সংকট নিরসনে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। এসব শিল্পের বিকাশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুল্কায়নের বৈষম্যের কারণে বিড়ি শিল্প হুমকির সম্মুখীন। ফলে উৎপাদন কমছে বিড়ির, কমছে বিড়ি কারখানার সংখ্যা। বেকার হচ্ছে লাখ লাখ শ্রমিক। কম দামি সিগারেট ও বিড়ির মূল্য একই হওয়ায় ভোক্তারা বিড়ি থেকে সিগারেট ধূমপানে উৎসাহিত হচ্ছে। এতে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমছে না বরং বিড়ি শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনেক পরিবার ও ব্যবসায়ী। এর অবসান প্রয়োজন।

নীলফামারী জেলার দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। নীলফামারী জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন কলেজ নেই। নীলফামারী জেলার আন্তঃউপজেলা ও ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহন কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। রাস্তায় জ্যাম থাকায় ১২-১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী হতে ঢাকা কোনো ডে-কোচ সার্ভিস নেই, কোনো আন্তঃনগর ট্রেন নেই, মোগলহাট স্থলবন্দর বন্ধ। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী রেলস্টেশন হতে ভারতের কুচবিহার রাজ্যের মেখলীগঞ্জ চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশনের সঙ্গে ৭৫০ মিটার রেলপথ পুনঃসংযোগ করা হলে ভারত, ভুটান ও নেপালের সাথে ব্যবসা- বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হবে। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এ রেলপথটি বন্ধ হয়ে যায়, যা পুনঃসংযোগ হলে ব্যবসা-বাণিজ্যেও মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। কুড়িগ্রাম অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী সন্দিও কুটির জুম্মারপাড় এলাকাটি এমন এক জায়গায় অবস্থিত সেখান হতে সহজেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যেতে পারে। হতে পারে সীমান্তহাটসহ একটি চেকপোষ্ট। এতে সৃষ্টি হবে কাজের। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে এ এলাকাটি। ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে আছে। এটি যাত্রী পরিবহন ও মালামাল পরিবহনের জন্য কার্গো বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সৈয়দপুর বিমান বন্দর হতেও কার্গো সার্ভিস চালু প্রয়োজন। এর ফলে ভারত, ভুটান ও নেপালে দ্রুত মালামাল সরবরাহ করা যাবে। ফলে বাণিজ্যিক আয়ও বেড়ে যাবে।

এটা দুঃখজনক যে, দেশ স্বাধীনের ৫১ বছরেও কোনো অর্থমন্ত্রী রংপুরে এসে, একদিনের জন্য রংপুর বিভাগে এসে—রংপুরের উন্নয়ন নিয়ে সুধীজনের সাথে মতবিনিময় করেননি, এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নবঞ্চনার কথা শোনেননি। রংপুরের উন্নয়নের জন্য এ অঞ্চলের সকল রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পরিকল্পনাবিদ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। সাধারণ জনগনকে উচ্চকণ্ঠ হতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ভিশন ২০৪১ এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' গঠন করতে হলে কোনো অঞ্চলকে পেছনে ফেলে রেখে তা সম্ভব নয়। ভিশন-২০৪১ এর দারিদ্র্য নিরসনের অভীষ্ট হলো—"২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সাধারণ দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (৩ শতাংশ বা এর নিচে) নিয়ে আসা। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের সব নাগরিকের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা হবে। কর্মসন্ধানী নাগরিকের কাজ থেকে আয়ের ব্যবস্থা এবং বয়স ও দৈহিক কারণে কর্মে অক্ষম নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রদান করা হবে। বেকারত্ব অতীতের বিষয় বলে গণ্য হবে। অন্যান্য উচ্চ আয়ের অর্থনীতির মতো দারিদ্র্য হয়ে পড়বে একটি আপেক্ষিক ধারণামাত্র। এ রকম পরিস্থিতিতে যারা দরিদ্র বিবেচিত হবে তাদেরও অন্তত খাদ্য চাহিদা

মেটানোর পর জীবনধারণের ন্যূনতম সামগ্রী কেনার মতো পর্যাপ্ত আয় থাকবে।” দীর্ঘদিন হতে বঞ্চিত ও উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার রংপুরের জনগন ভিশন- ২০৪১ এর এই অভীষ্ট পূরণের প্রত্যাশায় আজ। এ জন্য প্রয়োজন রংপুর অঞ্চলের জন্য বাজেটে ‘অনেক বেশি বিশেষ বরাদ্দ’, যাতে পিছিয়ে পড়া রংপুর অঞ্চল, অন্য অঞ্চলের উন্নয়নের সমপর্যায়ে যেতে পারে। তাহলেই অর্জিত হবে বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যহীন ‘সোনার বাংলা’। “কাউকে পিছনে ফেলে নয় (No one will be left behind) স্লোগানটি বাস্তবায়ন জরুরি। দেশে যখন ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে, তখন রংপুর বিভাগের জনগন অনেক পেছনে। তাই আমরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রংপুর বিভাগের উন্নয়নের জন্য “স্মার্ট রংপুর বিভাগ উন্নয়ন বোর্ড” গঠন, অর্থ বরাদ্দ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করি।

গ্রন্থপঞ্জি

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে রূপায়ন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০২০।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫) "Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness". বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২, শিল্পমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২২, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)-এর *'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র'* শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন।

Labour Force Survey, Bangladesh 2016-17, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, January 2018.

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৮৫-২৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: জাতিসংঘের সিডও সনদ ও বাংলাদেশ

হান্নানা বেগম*

সারসংক্ষেপ ৮ মার্চ আন্তর্জতিক নারী দিবস- নারী তথা বিশ্ব সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিবসটির সূত্রপাত হয় ১৮৫৭ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সূঁচ কারখানার নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমঘন্টা ১৬ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের দাবিতে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন-এর প্রস্তাবক্রমে ৮ মার্চকে ‘নারীদিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রথমবারের মতো ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে। এরপর থেকে জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি দেশে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশও নারী সমাজসহ সমাজের সচেতন অংশ প্রতিবছর এই দিবসটি গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে পালন করে আসছে।

সাধারণত এই দিনে আমরা বিশ্ব নারী সমাজের অগ্রগতি মূল্যায়ণ করে থাকি। এক্ষেত্রে প্রথমেই আমি তুলে ধরতে চাই কি বলেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব। দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আগে (৬মার্চ, ২০২৩) এক বক্তব্যে তিনি বলেন, নারী পুরুষের সমতা অর্জনে এখনো বহু পথ বাকি। বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে এই সমতা অর্জনে ৩০০ বছরও লাগতে পারে। গুতেরেস বলেন, মাতৃমৃত্যু, বাল্যবিবাহ, মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ নারীদের নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে নারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, সুশীল সমাজকে এ বিষয়ে ‘সম্মিলিত পদক্ষেপ’ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)

১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এ সনদ গৃহীত হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women।

* অধ্যক্ষ (অব.), ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ। ই-মেইলঃ hannanabegum@yahoo.com

বাংলায় বলা হয়, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ। সংক্ষেপে বলা হয় সিডও (CEDAW)।

প্রাসঙ্গিকভাবে মনে রাখার বিষয় ১৯৬০এর দশকে জাতিসংঘ প্রথম তার অতীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও পুনঃরূপায়ণ শুরু করে দশকওয়ারি ভাবে। জাতিসংঘের প্রথম দশকের (১৯৬০-১৯৭০) উন্নয়ন তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বহু দূরে। নারীদের মূলত দেখা হতো মা ও গৃহবধূ রূপে। পারিবারিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ৭০-এর দশকের শুরুতে একদল উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মতামত উপস্থাপন করেন যে, তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে, তাতে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নেই। আর নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া বিশ্বজগতের যাবতীয় বিস্ফোরক সমস্যা যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সমস্যার সমাধান, শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা কোনোটির সফলতা সম্ভব নয়। এ ধারণা উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধারা সৃষ্টি করে। এঁদের মতে- কোনো উন্নয়নের সুফল ঘরে বসা নারীর কাছে আপনাআপনি চুইয়ে পড়বে না। তাকে মূলস্রোতধারায় উন্নয়নকাজের অংশীদার হতে হবে, তাকে হতে হবে উন্নয়নের চালিকাশক্তি। তবেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এই পটভূমিকায় জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে নারী ইস্যুটি মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে এবং সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়।

সিডও সনদের ধারাসমূহ

সিডও সনদ ৩০টি ধারা সম্বলিত। এই ৩০টি ধারা ৩ ভাগে বিভক্ত।

ক). ধারা ১ থেকে ১৬ নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন সম্পর্কিত।

খ). ধারা ১৭ থেকে ২২ সিডও ও এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক।

গ). ধারা ২৩ থেকে ৩০ সিডও ও এর প্রশাসন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে এ সনদে স্বাক্ষর করে। কিন্তু সিডও সনদ বাংলাদেশ অনুমোদন করলেও তা পরিপূর্ণভাবে করেনি। বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের ধারা-২, ১৩(ক), ১৬.১(গ) ও (চ) ধারাগুলোতে আপত্তি জানিয়ে তা অনুমোদন করেনি। পরবর্তীতে সরকার ১৩(ক), ১৬.১(চ) অনুচ্ছেদ থেকে আপত্তি তুলে নেয়।

বাংলাদেশের আপত্তি দেওয়া দু'টি ধারা

ধারা-২: বৈষম্য বিলোপ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ। প্রতিটি দেশের জাতীয় সংবিধান, আইন-কানুন ও নীতিমালায় নারী ও পুরুষের সমতার নীতিমালা সংযুক্তকরণ ও তার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীকে সব ধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা করা। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

ধারা-১৬.১ (গ): বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের একই অধিকার ও দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের অষ্টম সাময়িক প্রতিবেদনের ওপর সিডও কমিটির সুপারিশ (২০১৬)

সুপারিশকৃত সমাপনী অভিমত—

সংরক্ষণ

কমিটি এই মর্মে অসন্তোষ ব্যক্ত করছে যে পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সরকার এখন পর্যন্ত সিডও সনদের ২ ও ১৬.১ (গ) ধারার ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করেনি। সরকারের এ অবস্থান সিডও'র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আইনগত কাঠামো

কমিটি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে দেশে এখনো বৈষম্যমূলক আইন ও বিধি রয়ে গেছে। যেমন বিভিন্ন আইনে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধের আওতায় বিবেচনা করা যাচ্ছে না, নারী নির্যাতন বিরোধী বিশেষ ট্রাইবুন্যালে নারীর প্রতি বৈষম্য সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না।

নারীর উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

কমিটি উল্লেখ করে যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর অধিকার বাস্তবায়নে ও সরকারের সকল বিভাগে জেন্ডার মূলধারাকরণের কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। যদিও কমিটি হতাশার সাথে লক্ষ্য করছে কার্যকরভাবে নারীর অধিকার ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রণালয়টির অস্পষ্ট কাজের এখতিয়ার, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় জনবল, কারিগরী ও আর্থিক সম্পদের অভাব রয়েছে।

প্রচলিত গৎবাঁধা ধারণা এবং ক্ষতিকর চর্চাসমূহ

পুরুষের পাশাপাশি নারীর পূর্ণ মানবাধিকার উপভোগ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের সমানাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক যাবতীয় গৎবাঁধা বৈষম্যমূলক ধারণাগুলোকে নির্মূল করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যথেষ্ট প্রচেষ্টা না থাকায় কমিটি তার হতাশা ব্যক্ত করে।

জেন্ডারভিত্তিক নারী নির্যাতন

কমিটি উদ্বিগ্ন যে, বাংলাদেশে নারী ও মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা যার মধ্যে ধর্ষণ, ফতোয়া ও যৌতুকের কারণে নির্যাতন, পরিবারে ও জনজীবনে যৌন হয়রানির মতো ঘটনা এখনও বন্ধ হয়নি। জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতনের মাত্রা বোঝার জন্য জরিপ/গবেষণা এবং জেন্ডার বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে না।

পাচার এবং পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ

কমিটি দেশের নারী ও মেয়েশিশু পাচারের অব্যাহত ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ নারী পাচারের একটি ট্রানজিট বা পথ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এবং এর কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কমিটি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ২০১২ সালের পর থেকে কতজন পাচারকারীর বিচার ও সাজা হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই।

রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণ

জাতীয় সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৫০টিতে উন্নীত করার উদ্যোগকে কমিটি স্বাগত জানায়। তবে কমিটি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে কেবলমাত্র অল্পকিছু নারী রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারছে; কিন্তু সাধরণভাবে সংসদে, বিচার বিভাগে, প্রশাসনে এবং ব্যক্তিখাতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এখনো কম।

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)

২০১৬ সালের অক্টোবরে প্রণীত বৈদেশিক সাহায্য আইন অনুযায়ী সরকার ইচ্ছা করলেই নারী সংগঠনসহ সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর ওপর বিশেষ করে তাদের অর্থায়নের ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে যা এনজিওদের বিনামূল্যে নিবন্ধন এবং কর্মসূচি পরিচালনায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কমিটি উদ্বেগের সাথে এটাও লক্ষ্য করছে যে সরকারের সমালোচনাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বেসরকারি সংস্থাসহ যেসব সংস্থা মানবাধিকার ও নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের কর্মকাণ্ডকে আরো সীমিত করে ফেলতে পারে।

জাতীয়তা

কমিটি সরকারকে নাগরিকত্ব আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করছে যাতে বাংলাদেশী মাতাপিতার ঔরশে জন্ম নেয়া সকল শিশু বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। কমিটি আরও সুপারিশ করছে যেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জন্ম নেয়া সকল শিশুর জন্মের পরপরই নিবন্ধন করা হয়।

শিক্ষা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কমিটি সরকারকে সাধুবাদ জানায়। তবে কমিটি কিছু বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কর্মসংস্থান

কমিটি সরকারের শ্রম আইন ও নীতি ২০১৩ প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। এতে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে। কিন্তু কমিটি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে এ আইনটি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ২০১৩ সালের পর থেকে রেজিস্ট্রেশন হার বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, বিশেষ করে নারীনির্ভর শিল্প কারখানায় ও কৃষিতে।

গৃহশ্রমিক নারী

কমিটি সুপারিশ করছে যে গৃহশ্রমিকদের কাজের পরিবেশ যাচাইয়ে ফ্যাক্টরিতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করতে হবে। গৃহশ্রমিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তাদের বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

স্বাস্থ্য

অল্প বয়সে বিয়ে ও মা হওয়ার কারণে দেশে মাতৃমৃত্যুর উচ্চহার এবং গর্ভপাতকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

গ্রামীণ নারীদের অপ্রতুল ঋণ, সরকারি ব্যাংকের লোন সুবিধা না থাকা এবং নারী কৃষকদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে।

গ্রামীণ নারী

কমিটি সুপারিশ করছে যাতে সরকার গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পরিষেবা, ভূমির মালিকানা ও উত্তরাধিার এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেবে।

সুবিধাবঞ্চিত নারী

কমিটি সরকারের প্রতি সুপারিশ করছে যে, বিশেষ দুর্বল জনগোষ্ঠির মেয়েশিশুসহ নারী ও মেয়েশিশুদের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য, জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন রোধে সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থাসহ সর্বাত্মক আইন প্রণয়ন এবং আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিয়ে ও পারিবারিক সম্পর্ক

কমিটি সুপারিশ করেছে যে সরকার বর্তমানে প্রচলিত আইনগুলোর পর্যালোচনা করবে এবং একটি সার্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করবে যা সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এতে বিয়ে এবং তালাকের সময় সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করবে।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

সিডও সনদের সবগুলো বিষয়ের ওপর তথ্যের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে ব্যাপারে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন

কমিটি পরামর্শ দিচ্ছে যাতে সিডও সনদের ধারাগুলোর বাস্তবায়নে সরকার বেইজিং ঘোষণা বা প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে।

টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০

কমিটি সরকারকে এই মর্মে আহবান জানাচ্ছে যেন সরকার টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সিডও সনদের ধারা অনুযায়ী সর্বাত্মক জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করে।

প্রচার

সিডও সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে যেন বর্তমান সমাপনী অভিমতসমূহ দেশের রাষ্ট্রভাষায় সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে সরকার, মন্ত্রণালয় এবং বিচার বিভাগের কাছে তুলে ধরে।

শেষের কথায় বাংলাদেশ সরকার সিডও'র অষ্টম সাময়িক প্রতিবেদন জমা দেয়ায় কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র

জাতিসংঘ সিডও কমিটির সমাপনী অভিমত-২০১৬, মার্চ ২০১৮, প্রকাশক সিটিজেনস্ ইনিশিয়েটিভস্ অন সিডও, বাংলাদেশ

হান্নানা বেগম, *সিডও ও বাংলাদেশ* (সেপ্টেম্বর ২০০৮), বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

হান্নানা বেগম, *নারীর মানুষ হওয়ার সংগ্রাম: জাতিসংঘের উদ্যোগ ও বাংলাদেশের চালচিত্র* (মে ২০১১)

হান্নানা বেগম, *মানব সম্পদ বাংলাদেশের নারী* (মার্চ ২০০২), বাংলা একাডেমী

সিডও এবং বাংলাদেশ (২০০১), স্টেপস্ টুয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট।

অনলাইন পত্রিকা

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

প্রকাশনা নীতিমালা

১. অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে।

 ক. বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ জার্নালে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হবে।

 খ. বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত প্রবন্ধ-নিবন্ধও গ্রহণযোগ্য।

২. প্রাথমিক 'যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া' (*ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং*) সম্পাদকের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে—তবে প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা পরিষদের অন্য সদস্যদের সহায়তা তিনি নেবেন। নির্ধারিত 'আঙ্গিক' (*স্টাইল*) ও 'বিন্যাস' (*ফরম্যাট*) অনুযায়ী সংশোধনের জন্য এই পর্যায়ে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহের একটি 'সংক্ষেপিত তালিকা' (*শর্ট লিস্টেড*) প্রবন্ধকারকে পাঠানো হবে।

৩. অভ্যন্তরীণ পর্যালোচক (*রিভিউয়ার*) সাধারণত সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনীত হবেন।

৪. বহিঃস্থ পর্যালোচক (*এক্সটার্নাল রিভিউয়ার*) সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রবন্ধের বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত হবেন। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সকল সদস্য পর্যালোচক (*রিভিউয়ার*) হতে পারবেন।

৫. দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের বছরে দুইবার সম্পাদনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৬. ক) সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো 'সুপারিশকৃত' (*রেফারাল*) প্রক্রিয়ায় জার্নালের জন্য বিবেচিত হবে।

খ) সম্পাদনা পরিষদের অনুমোদনে সমিতির আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধসমূহও জার্নালে প্রকাশ করা যেতে পারে।

৭. অর্থনীতি সমিতির সদস্যবহির্ভূত যেকোনো আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত 'গ্রাহক মূল্য' (*সাবস্ক্রিপশন ফি*) প্রদান করে জার্নালের নিয়মিত গ্রাহক হতে পারবেন। সমিতির সদস্যবৃন্দ ৫০ শতাংশ হ্রাসকৃত মূল্যে জার্নাল পাবেন। এ ছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নসাপেক্ষে ৫০ শতাংশ ছাড়ে জার্নাল সংগ্রহ করতে পারবেন।

৮. জার্নালের 'পাদটীকা' (*ফুটনোটিং*) এবং 'লেখার শৈলী' (*রাইটিং স্ট্যাইল*) জার্নালের শেষ পাতায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

পাদটীকা (*ফুটনোট*) এবং লেখার শৈলী (*রাইটিং স্ট্যাইল*) নীতিমালা

১. বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করা হবে।

২. প্রতিটি প্রবন্ধ ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ *অ্যাবস্ট্রাক্ট* রাখা এবং মূল শব্দ কি-ওয়ার্ডস চিহ্নিত করাই সাধারণ রীতি। গবেষণাপ্রবন্ধ, সমকাল পর্যালোচনা ও বিদেশি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ও প্রবন্ধ নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়:
   ক. প্রবন্ধ ৬,০০০-৭,০০০
   খ. সমকাল পর্যালোচনা ২০০০-৩০০০
   গ. গ্রন্থ পর্যালোচনা ৩০০০-৪০০০
   ঘ. বিদেশি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ৩০০০-৪০০০

৩. প্রতিপাদ্য (থিম) ও সহ-প্রতিপাদ্য (সাব থিম)-এর আলোকে প্রবন্ধ সাধারণত নিম্নলিখিত শ্রেণিবিন্যাসে সন্নিবেশিত/ সংগঠিত করা উচিত: ক) ভূমিকা: পটভূমি, সমস্যা ও কার্যকারণের নির্যাস উল্লেখ; খ) উদ্দেশ্য ও যুক্তিসিদ্ধ অনুমান; গ) পদ্ধতিগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ; ঘ) ফলাফল ও তার প্রভাব; চ) সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে); এবং ছ) সুপারিশ ও উপসংহার।

৪. ইংরেজি বা বাংলায় লেখা প্রবন্ধ, সমকাল পর্যালোচনার পাণ্ডুলিপির তিন (০৩) কপি প্রতিলিপি 'সম্পাদক, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ'— এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

৫. প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠে প্রতি লাইনের মাঝে দ্বিগুণ স্পেস রেখে কম্পোজ করা মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদক বরাবর জমা দিতে হবে। সিডি অথবা মেইলে অবশ্যই সফট কপি জমা দিতে হবে। শব্দ ও বাক্যের ফন্ট *SutonnyMJ* হবে এবং ফন্টের আকার বাংলায় ১২ ও ইংরেজি ১১ পয়েন্টে হতে হবে।

৬. লেখক পাণ্ডুলিপিতে তাঁর নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন। সম্পূর্ণ নাম, মেইলিং ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ একটি পৃথক পৃষ্ঠা সংযুক্ত এবং প্রবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করে সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৭. প্রবন্ধ/ নিবন্ধ/ অনুবাদ অন্য কোথাও প্রকাশের জন্য গৃহীত হলে বা প্রকাশ হলে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে। অন্যথায়, যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার দায় এককভাবে লেখক বহন করবেন।

৮. প্রবন্ধের শিরোনাম সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়েন্টে উপশিরোনাম ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্পাদকীয় পরিষদ 'গবেষণা প্রবন্ধ, গবেষণা নিবন্ধ, বিশেষ পর্যালোচনা'র শিরোনাম পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

৯. প্রবন্ধে সারণি, গ্রাফ, চিত্র ও গাণিতিক সাইন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে শিরোনাম, উৎস ও সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

১০. যদি সম্পাদকীয় পরিষদ প্রাথমিকভাবে গৃহীত প্রবন্ধ জার্নালে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত করা বা অগ্রহণযোগ্য/ অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত অপসারণ করা বা প্রবন্ধটি পুনর্মাজন/ সংশোধন করা সমীচীন মনে করেন—সেক্ষেত্রে বিষয়টি লেখককে জানাবেন এবং লেখকের সম্মতিসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১১. বিশেষ কোনো নোট থাকলে তার সংখ্যা ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা এবং তা প্রবন্ধের শেষে সময়কালসহ (সাল-বছর) উপস্থাপন করতে হবে।

১২. গ্রন্থ/ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কোনো উদ্ধৃত তথ্য/ তত্ত্ব/ বাক্য/ শব্দাবলির স্বীকৃতি প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জিতে (*রেফারেন্স*) তালিকায় সময়কালসহ ক্রমাণুসারে সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে লেখকের নামের শেষ অংশটি সবার আগে দিয়ে শুরু করতে হবে—যেমন মো. এনামুল করিম (করিম, মো. এনামুল); এরপর ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃতির সূচনাকাল, গ্রন্থ/ রেফারেন্স শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা ও লাইন নম্বর এবং সবার শেষে প্রকাশনার বছর উল্লেখ করুন।

১৩. তথ্যপঞ্জির গ্রন্থ/ প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ পর্যালোচনার শিরোনাম তির্যক (আইট্যালিক) করুন। তবে এক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত রেফারেন্সের তালিকার সাথে যাতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন। যেমন: বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org